মুসলিম রেনেসাঁসের কবি
ফররুখ আহমদ

শাহাবুদ্দীন আহমদ

মুসলিম রেনেসাঁসের কবি
ফররুখ আহ্‌মদ

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. কে. এম. নাজির আহ্‌মদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-842-009-6

প্রথম প্রকাশ
হিজরী ১৪২৩
শ্রাবণ ১৪০৯
সেপ্টেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

নির্ধারিত মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Muslim Renaissance-er Kabi Farrukh Ahmad
(Farrukh Ahmad, The Poet of Muslim Renaissance)
Written by Shahabuddin Ahmad and Published by A.K.M. Nazir Ahmad, Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition September 2002 Price Taka : 60.00 only.

www.pathagar.com

আমার কনিষ্ঠ পুত্র
সালাহ্উদ্দীন আহমদকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অনেক কবি আছেন যাঁদের কবিতার বিষয় প্রেম, প্রকৃতি এবং ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও আনন্দ। কিন্তু আর এক জাতের কবি আছেন যাঁদের কাব্যের বিষয় ধর্ম, মানুষ, সমাজ,সমাজের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা; জাতীয় জীবনের জয়-পরাজয়ের, উত্থান ও পতনের জন্যে আনন্দ-বেদনা, সুখ ও দুঃখ। এই দ্বিতীয় দলের কবি ফররুখ আহ্‌মদ। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চেয়ে জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ যাঁদের কাছে বড় হয়ে ওঠে এবং যাঁরা জাতির সমৃদ্ধি, উন্নতিকে বড় করে দেখেন, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যাঁরা সৈনিক যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করেন– ফররুখ আহ্‌মদ সেই গোষ্ঠীর কবি। জাতি নির্মাণের সাধনায় যিনি জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করেছেন, জাতীয় পুনর্জীবন দানের জন্য তাঁর ত্যাগ ও সাধনার মূল্যায়নের বড় বেশী প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই মূল্যায়নের অন্যতম পথিকৃত।

এ গ্রন্থের লেখক জনাব শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশের ও ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে লিখে আসছেন। গবেষণাধর্মী সাহিত্য-প্রবন্ধ রচনায়, মননশীল বিশ্লেষণধর্মী ও সমালোচনাধর্মী লেখায় যাঁর দক্ষতা শ্রদ্ধা-উদ্রেককারী। তিনি এই মূল্যায়নপ্রয়াসী গ্রন্থ লিখে ফররুখের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহ্‌মদের উপর ইতিপূর্বে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করে সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে মুসলিম জাগরণে কবি ফররুখ আহ্‌মদ যে ভূমিকা রেখেছেন সে সম্পর্কে তিনি একটি বিশদ মৌলিক চিন্তা উপহার দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ ফররুখ-প্রেমিক ও গবেষকদের ফররুখ-চর্চা, গবেষণা, উপলব্ধি ও ফররুখ-পরিচয়ে সাহায্যকারী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ কে এম নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

১. শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম
২. সাহিত্য-চিন্তা
৩. নজরুল-সাহিত্য-বিচার
৪. ইসলাম ও নজরুল ইসলাম
৫. নজরুল-সাহিত্য দর্শন
৬. দ্রষ্টার চোখে স্রষ্টা
৭. কবি ফররুখ : তাঁর মানস ও মনীষা
৮. উপমাশোভিত ফররুখ
৯. লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাক নুড়ি
১০. বহু রূপে নজরুল
১১. নজরুলের গদ্যে উপমা
১২. চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা
১৩. ওমর খৈয়ামের অনুবাদক নজরুল ইসলাম
১৪. বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা

সম্পাদনাকৃত গ্রন্থ :

১. ফররুখ আহ্‌মদ : ব্যক্তি ও কবি
২. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ : আবদুল কাদির
৩. নজরুলের পত্রাবলী

অনূদিত গ্রন্থ :

১. তিন বোন : আন্তন চেখভ
২. শঙ্খ চিল : ঐ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ	১৭
২.	ফররুখ ও ইকবাল	৪২
৩.	ফররুখ ও মধুসূদন	৪৮
৪.	ফররুখ আহ্‌মদ ও নজরুল ইসলাম	৫৩
৫.	ফররুখ-কাব্যে গণতন্ত্রের স্বরূপ	৬৬
৬.	ফররুখ-কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি	৭৭
৭.	আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ফররুখ	৮৪
৮.	ফররুখের জীবনাদর্শ	৯১
৯.	আত্মস্বরূপে ফররুখ	১০০
১০.	ফররুখ-কাব্যে তের শ' পঞ্চাশ	১০৫
১১.	ফররুখ-কাব্যে মানুষ ও শয়তান	১১৩
১২.	ফররুখ আহ্‌মদ : তাঁর জীবন ও কবিতা	১১৭
১৩.	ফররুখ ও তিন কবির ঝড় ও বৈশাখ	১২৯
১৪.	ফররুখের কবিতায় ঝড় ও বৈশাখ	১৩৮
১৫.	বৈশাখ ও ফররুখ	১৪৪
১৬.	ফররুখের শিল্প-মানস ও সাত সাগরের মাঝি	১৫৩
১৭.	রঙীন চিত্রকল্প ও ফররুখ	১৫৮
১৮.	গতির কবি ফররুখ	১৬৩
১৯.	ফররুখের আধুনিকতা	১৬৯
২০.	সিরাজাম মুনীরার ফররুখ	১৭৪
২১.	রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?	১৮৪
২২.	কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক	১৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমার লেখা 'কবি ফররুখ: তাঁর মানস ও মনীষা' 'উপমা শোভিত ফররুখ' যতটা পরিকল্পিত লেখা বর্তমান গ্রন্থ ততটা পরিকল্পিত নয়। আবার একেবারে অপরিকল্পিত যে সেটাও সত্য নয়। এর অধিকাংশ প্রবন্ধ ১৯৯১/৯৩/৯৪ থেকে ৯৯ পর্যন্ত লেখা ছিল। কথা ছিল বাংলা সাহিত্য পরিষদ এটি ছাপবে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বাংলা সাহিত্য পরিষদ এটি ছাপতে সময় নিচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এ.কে.এম নাজির আহমদ সাহেব 'মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ' এই নামে আমাকে একটি পাণ্ডুলিপি দেওয়ার অনুরোধ করেন। আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে যাই। বাংলা সাহিত্য পরিষদে পেশ করা পাণ্ডুলিপিটি অন্য নামে থাকলেও মূলতঃ তার বিষয়টি ছিল মুসলিম রেনেসাঁসে ফররুখের অবদান-ধর্মী। সুতরাং এতে 'মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ' নামধেয় একটি প্রবন্ধ জুড়ে দিলেই জনাব নাজির আহ্মদ-অনুরুদ্ধ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হবে মনে করি। বর্তমান গ্রন্থ সেই পরিকল্পনারই ফসল। এতে 'মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ'-এর সঙ্গে নতুন করে আরও ছ'টি প্রবন্ধ সংযুক্ত হল : ১. ফররুখ আহ্মদ ও নজরুল ইসলাম; ২. ফররুখ ও ইক্বাল ৩. ফররুখ ও মধুসূদন ৪. রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? ৫. সিরাজাম মুনীরার ফররুখ ৬. কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক। মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখের বিষয়-ভাবনার মিল আছে এই প্রবন্ধসমূহের সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, ইক্বাল ও নজরুল যেমন রেনেসাঁসের কবি তেমনি মধুসূদনও রেনেসাঁসের কবি। চিন্তাগত ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও ঐতিহ্যিক ধারায় ইক্বাল ও ফররুখের সম্পৃক্ততা প্রশ্নাতীত। সে ক্ষেত্রে মধুসূদনের মানসের সঙ্গে এই তিন কবির পার্থক্য অনেক। মধুসূদন হিন্দুধর্মের অনুরাগী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ব্যাপারে নজরুলের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও নজরুলের ইসলাম ও ইসলাম-সংস্কৃতি-প্রীতি সন্দেহাতীত। সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায়নে ও তাঁর সৌন্দর্যপৃক্ত ভাবরসের পরিচায়নে বাংলাদেশের বা বাংলা ভাষার সাহিত্যে তিনি অনন্য। কিন্তু তাঁর হিন্দু-পুরাণপ্রীতি উপেক্ষা করার মত নয়। এ-দিক থেকে তিনি মধুসূদনের বক্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। অর্থাৎ তিনিও মধুসূদনের মত বলতে পারতেন When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. মধুসূদনের মত সাহিত্য

www.pathagar.com

ভাবনায় উদারতার পর্বত শীর্ষে উঠলেও নজরুল ইসলাম তাঁর কোন বক্তব্যে হিন্দুবাদের প্রতি কোন ঘৃণার কথা উল্লেখ করেননি। নজরুলের ইসলাম-প্রেমও ছিল অনন্য। বলা বাহুল্য, মধুসূদনের যাঁরা ancestors ছিলেন নজরুলের ancestors একা তাঁরাই ছিলেন না। সুতরাং পুরাণের ব্যবহার মধুসূদনের কাছে যা নজরুল ইসলামের কাছে তা সম্পূর্ণ পৃথক। ফররুখ আহ্‌মদ হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি ও পুরাণ থেকে তাঁর কাব্যকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পেরেছেন। সচেতন ইচ্ছার দ্বারা তিনি এই কাজটি করেছেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁর সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হয়েছে বললে গোটা হিন্দু বাংলা সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলতে হবে। এমনকি বিশ্বের অন্যতম প্রধান দুই কবি দান্তে ও মিল্টন এ থেকে বাদ যাবেন না। গ্রন্থে-আবদ্ধ প্রবন্ধসমূহে এ বিষয়ে আমি প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। আমার ধারণা 'মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ আহ্‌মদ' নামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখলেও অন্যান্য প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে ঐ নামের মর্মার্থের সুর বেজে উঠেছে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে নজরুল ও ফররুখের রেনেসাঁসকে মাপলে তার ছিদ্র আবিষ্কার কঠিন হবে না। তবে এ কথা কে অস্বীকার করবে যে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের বা মধুসূদন দত্তের রেনেসাঁস চিন্তা আর বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের রেনেসাঁস চিন্তা এক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু রামমোহন অনুসারী সে-জন্যে তাঁর রেনেসাঁস চিন্তার মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। পাশ্চাত্য ভাবনায় রবীন্দ্র-মানস দীক্ষিত হলেও উপনিষদ, বেদান্ত ও গীতা এমনকি বৌদ্ধ দর্শন থেকে রবীন্দ্র-মানস বিযুক্ত ছিল না। তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম নয় হিন্দু বলতে গৌরব বোধ করতেন; এবং এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মধুসূদন মানসের বোধ করি পার্থক্য ছিল। এ ব্যাপারে মধুসূদনের মত ঔদার্যে রবীন্দ্রনাথ সীমাহীন ছিলেন এ-কথা বলতে সাহিত্য পণ্ডিতরা দ্বিধা করবেন।

ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে ফররুখ কোন আপোস করেননি। ত্রিশ দশকের শেষ অর্ধাংশ এবং চল্লিশ দশকের প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে মুসলিম জাগরণের জোয়ার এসেছিল ফররুখ আহ্‌মদ প্রধানতঃ সেই স্বপ্নেরই ফসল। সেখানে প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সেখানে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে আত্মরক্ষার সংস্কৃতি গড়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়, ফররুখ তাকেই সম্বল করে নিজের কাব্য-সৌন্দর্যকে নির্মাণ করেন। মধুসূদনকে কাব্যকাহিনী গ'ড়ে তুলতে প্রয়োজন হ'য়েছিল

www.pathagar.com

'রামায়ণ' 'মহাভারত'-এর আর ফররুখের প্রয়োজন হয় মুসলিমদের রচিত পুঁথি-কাব্যের ও বিশ্ব মুসলিম সাহিত্যের। ফররুখ আহ্‌মদ মানুষিক ও মানবিক ধারার ঐতিহ্য হিসাবে এটাকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে 'আরব্য রজনী', 'আলিফ লায়লা', 'হাতেম তাই'-এর মত কাহিনী ও কাব্য Grand mythology হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সেটাই তাঁর চোখ ও মনে ছিল full of poetry।

এ গ্রন্থের লেখা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, কিছু কিছু লেখা একই বিষয়ভিত্তিক বলে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হয়েছে। তবে লেখাগুলোর তারিখ দেখলে বোঝা যাবে আমার পুনরুক্তির মধ্যে নতুন চিন্তার সংযুক্তি ঘটেছে। পুনরুক্তি সত্ত্বেও ফররুখ নিয়ে আমার চিন্তার ক্রম-পরিণতিও এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যাবে। এটা বিশুদ্ধ গবেষণাধর্মী বা থিসিসধর্মী বই হতে পারত যদি একই সময়ে অন্য বিষয়ের আশ্রয় না দিয়ে বইটি লিখতে পারতাম। নিজের কাছেই অনেকগুলো প্রবন্ধ এখন অসম্পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। কখনও সময় পেলে এ-গুলো নতুন করে লিখব এবং এর সম্পূর্ণ রূপদান করব– ইচ্ছা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর মহাকাব্য লেখা হয়নি সময় ও পরিবেশের কারণে। তা টুকরো টুকরো হ'য়ে প্রকাশ হয়েছে। এ-দেশে সাহিত্য পত্রিকা না থাকাতে আমাদের চিন্তা আজ দৈনিক পত্রিকায় টুকরো করে প্রকাশ করতে হচ্ছে। তবে ফররুখ-গবেষকরা আমার ব্যবহৃত বিষয়কে বিশদ ও প্রলম্বিত করে লিখতে পারবেন।

'ফররুখ-কাব্যে মানুষ ও শয়তান' প্রবন্ধটি তাৎক্ষণিক চিন্তার ফসল। এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব ভেবেছিলাম। সময় পেলে ইচ্ছাপূরণের আশা জিইয়ে রেখেছি। 'পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ও ফররুখ' প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সেই একই বক্তব্য। এটা আরও বিস্তৃত করে লেখার সুযোগ ছিল সেটাও অস্থির সময় ব্যবহৃত হতে দিল না। একই কথা বলা চলে 'ফররুখ ও ইক্‌বাল' এবং 'ফররুখ ও মধুসূদন' বিষয়ক প্রবন্ধ দুটি সম্বন্ধে। ব্যস্ততার সময় কাটিয়ে উঠতে পারলে এর উপরে লেখা সম্ভব হবে। লেখকের জন্যে নিজের চিন্তাকে শুদ্ধতা দানের যে প্রক্রিয়া তার মাথায় কাজ করে, সেই পরম তৃপ্তিদায়ক শুদ্ধতার কোন শেষ নেই। বোদলেয়ার ফ্লুর দ্য মালের প্রুফ দেখেছিলেন পাঁচ বছর ধরে। আমার জীবনে সে অবসর কোথায়? ফলতঃ বোদলেয়ারের মত জীবনের গোধূলিলগ্নে আর বলতে পারছি না– 'পাছে রেখা স্রস্ত হয় ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা।' চঞ্চলতা শিল্পের শত্রু। জীবনের দায়ে এই শত্রুর সাথে প্রতি মুহূর্তে কুস্তি লড়তে হচ্ছে, শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। এই জন্যে পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

www.pathagar.com

পাঠককে এখন এ-কথা বলতেও পারছি না, লজ্জাবশতঃ, যে আমার অক্ষমতাকে 'ক্ষমাসুন্দর' দৃষ্টিতে দেখবেন। লেখা বাজারে মাল সাপ্লাই করার মত জিনিস না। আর মুদ্রিত লেখার পরে এ-কথা না বলে উপায় নেই– 'কৃত পাপ স্মরি– ওহে খৈয়াম বক্ষবিদারী কি ফল বল! / অনুশোচনার শত চিৎকারে রোধিয়াছে কবে করম ফল!' তবে সৃজনশীল গবেষক তরুণেরা আমার অক্ষমতা দেখে শিক্ষাগ্রহণ করলে তা বাংলা সাহিত্যের জন্যে একটি বড় রকমের উপকার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এ কে এম নাজির আহ্মদ সাহেবকে মুবারকবাদ জানাই। তিনি সহযোগিতার হাত না বাড়ালে এ-গ্রন্থ প্রকাশ যে সহজ হ'ত না সে-কথা বলতে আমার কুণ্ঠা নেই।

আমি যা লিখতে চেয়েছিলাম তা বোধ হয় লিখতে পারিনি। ভবিষ্যতে আমার চেয়ে অধ্যবসায়ী নিষ্ঠাবান গবেষক এ বিষয়ে আরও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ লিখবেন এই আশা করে উপসংহারের যতি টানছি।

এ-গ্রন্থ কম্পোজে আমার পুত্র সালাহ্উদ্দীন আহমদ শ্রম দান করতে কুণ্ঠিত হয়নি– আর প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতা করেছেন আল মুজাদ্দেদের প্রধান প্রুফ রীডার আবদুস সালাম এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকার প্রকাশনা ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম হুমায়ুন,এঁদের সবাইকে আমার মুবারকবাদ।

২৮ জুলাই, ২০০২

শাহাবুদ্দীন আহ্মদ
১৯৫/১/এ শান্তিবাগ,
ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

পাঞ্জেরী

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?

এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে ?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে ?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে ;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি ।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?

দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা প'ড়েছি এসে ?

এ কী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব
অস্ফুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে ;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?

বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে ?
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে ;
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে ।
আহা পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তকদিরে
নিরাশার ছবি এঁকে।

পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চ'লেছি কোথায় ? কোন সীমাহীন দূরে ?
মুসাফির দল ব'সে আছে কূল ঘেরি।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে ;
একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি।

www.pathagar.com

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী ;
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিঃস্বাদ শর্বরী।

সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।

ওকি বাতাসের হাহাকার,–
ওকি রোণাজারি ক্ষুধিতের !
ওকি দরিয়ার গর্জন,– ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী!
পাঞ্জেরী!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি ;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী ॥

www.pathagar.com

মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ আহমদ

কবিতা রচনায় আবেগের প্রয়োজন হয়। সেই আবেগের স্রষ্টা কে? আমার কাছে তা প্রেম বা ভালোবাসা। কোন কিছুকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে আবেগের সৃষ্টি হয় না। এবং কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব হয় যদি আবেগ অনুপ্রেরণা শক্তি হিসেবে কাজ না করে। অতএব আঙ্কিক নিয়মে প্রথমে প্রেম। প্রেমের সফলতা ও বিফলতা-জনিত কারণে সৃষ্ট আবেগ। এবং সেই আবেগ প্রেরণায় আত্ম-উপলব্ধির প্রকাশ।

কিন্তু প্রেমের ভিন্ন রূপ আছে। একক ব্যক্তিকে, প্রকৃতিকে ভালোবেসে, সৌন্দর্যকে ভালোবেসে এক ধরনের প্রেমের উপলব্ধি; আর স্বদেশ, স্বজাতি, ধর্ম, সত্য ও মানুষকে ভালোবেসে প্রেমের ভিন্ন উপলব্ধি। জীবন-সমস্যার সমাধানে নিজস্ব সত্য আবিষ্কার ও সে সত্য মানুষের হৃদয়ে পৌছে দিয়ে জগৎ-চরিত্র বদলে দেওয়ার স্ব-চিন্তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি প্রেমও আবেগ সৃষ্টির অন্য উৎস। সেজন্যে কোন কবির কাব্য-বিচারে তাঁর কাব্যসৃষ্টির কারণ ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার আবশ্যকতা। ব্যক্তিগত প্রেম থেকে উদ্ভূত মিলনের আনন্দ ও বিরহের বেদনার জন্যে জগৎ, জীবন ও ইতিহাস জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে কবি ধর্ম, জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়ের প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তার জাতীয় উত্থান-পতনে, আনন্দ ও বেদনায় আক্রান্ত হন তাঁর কাব্য ও সাহিত্য-আলোচনায় ধর্ম, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিচয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদও সেই জাতীয় কবি যিনি শুধুমাত্র প্রকৃতিকে, কোন একজন নারীকে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ সৌন্দর্যকে ভালোবেসে কাব্য রচনা করেননি। তাঁর প্রেমানুভূতিতে ছিল তাঁর দেশ, তাঁর জাতি, তাঁর ধর্ম। এ জাতের কবির আলোচনায় তাই দেশ ও জাতির ইতিহাস, কালের ইতিহাসের পরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ফররুখ আহমদকে মুসলিম রেনেসাঁসের কবি বলে অনেকে চিহ্নিত করেন। কোন সন্দেহ নেই অধঃপতিত, উপেক্ষিত এবং অবহেলিত মুসলিমদের জাগাবার জন্যে তিনি মসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখানে রেনেসাঁসকে শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ ইউরোপের যে নবজাগরণকে রেনেসাঁস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তার সঙ্গে ফররুখের জাগরণ চিন্তার রূপ পৃথক। সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'পরিভাষা কোষ'-এ রেনেসাঁসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন–

www.pathagar.com

> এই আন্দোলন কেবল সাহিত্য বা কলাশিল্প বা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, ইহা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে চিন্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত করে।

সুপ্রকাশ রায় এর পরে রেনেসাঁসকে তিনভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন–

> প্রথমতঃ ইহা কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অবলুপ্ত জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার পুনঃপ্রবর্তন করে। দ্বিতীয়তঃ রিনাসন্স-এর অর্থ 'পুনর্জন্ম' বা 'পুনরুজ্জীবন' হইলেও ইহা কেবল জড়তাপ্রাপ্ত ও ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন জীবনকেই ফিরাইয়া আনে না, ইহা কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তিই নহে, ইহা পুরাতন ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর নব নব আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং পুরাতন ঐতিহ্যের সহিত নূতন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লয়। তৃতীয়তঃ ইহা সমগ্র সমাজের মধ্যে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে এক অপূর্ব সৃজনী শক্তির স্ফুরণ দেখা দেয়। সেই সৃজনী শক্তি একের পর এক সৃষ্টি করিয়া চলে নব নব ভাবধারা; নব নব দর্শন, ধর্ম সাহিত্য শিল্পকলা, রাজনৈতিক মত।"

তিনি একটি রাজনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে (মার্কসীয়) রেনেসাঁসের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন–

> "'রেনেসাঁস' হইল মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ সামন্তপ্রথার (Feudalism) বন্ধন হইতে সমসাময়িক আন্দোলন,– প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন।"

তাঁর মতে, এই রেনেসাঁস আন্দোলনের মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা তথা মানবসভ্যতার প্রভূত উন্নতি হয়। তার আগে ইউরোপে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তা 'গীর্জার বিকৃত ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তরালে অর্গলবদ্ধ ছিল'। রেনেসাঁস সেই বদ্ধ দ্বারের অর্গল ভেঙে 'মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তাকে মুক্তি দান করে'।

এই রেনেসাঁসের বক্তব্য আলোচনার সময় আমার হাতে যেসব বই এসেছে

www.pathagar.com

যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়-এর 'বাংলার রেনেসাঁস', বিনয় ঘোষের 'বাংলার নবজাগৃতি', অমর দত্তের 'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানা', স্বপন বসুর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', অমলেশ ত্রিপাঠীর 'ইতালীর রেনেসাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি', ডক্টর শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস', সুশোভন সরকারের 'বাংলার রেনেসাঁস', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌র 'বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন'। এগুলো দেখতে গিয়ে মনে হ'য়েছে সবাই একটি দিককে প্রায় উপেক্ষা করেছেন। এঁরা হয়ত তলিয়ে দেখেন নি যে ইসলাম নিজেই একটা রেনেসাঁস আন্দোলন। আজকের দিনে যে 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র'-এর মতবাদ দেখি, যে মতবাদের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের নতুন সমাজ গঠিত হচ্ছে বলে মনে করি সেটা ইউরোপের মনীষীরা রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলশ্রুতি বলে মনে করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই রেনেসাঁসের মূল-লক্ষ্য ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার মুক্তি এবং মানবতা। যে কোন প্রাচীন ধর্ম বা মতাদর্শের চিন্তায় বন্দী হলে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ মুক্তি লাভ করে না। আর মানুষের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ স্বাধীনতা না ঘটলে মানবতাও পূর্ণ মুক্তি লাভ করে না। শক্তিমানদের শাসন রজ্জুপাশে এই যে মানুষের স্বাধীন চিত্তের বন্দীত্ব এটা থেকে মুক্তির নাম 'রেনেসাঁস' বলা হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম অধ্যয়নকারীরা জানেন মানুষকে সর্বপ্রকার জুলুম থেকে মুক্ত করাই ছিল ইসলামের কাজ। এই জন্য ইসলাম ব্যাখ্যায় ইবত্মাহীম খাঁর কাছে লেখা জবাবী চিঠিতে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন : 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।' তেমনি ১৯৪০-এর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন–

> আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বোঝা যায় যে, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।

মানুষের স্বাধীন চিত্ততার স্রষ্টা বলে তিনি ইসলামকে শনাক্ত করেছেন। ফররুখকে মুসলিম রেনেসাঁসের কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে গেলে প্রথমে তাই ইসলাম যে বিশ্বে প্রথম রেনেসাঁসের উদগাতা সে বিষয়টি জানা দরকার। আমরা হিন্দু লেখকদের লেখায় এ উপমহাদেশের মানুষদের জাগরণের ইতিহাস লিখতে দেখি, সেখানে মুসলিম জাগরণের ইতিহাসকে তেমন গুরুত্ব দিতে দেখি না । মনে রাখা দরকার যে হিন্দুদের কুসংস্কার অন্ধ বর্বর সামাজিক রীতি থেকে মুক্ত করতে হিন্দু জাগরণের প্রয়োজন পড়েছিল, মুসলিম ধর্ম সমাজে যে সংস্কার

www.pathagar.com

জাগরণ প্রায় তের চৌদ্দ শ' বছর আগে ঘটে গেছে হিন্দু মনীষীরা সেটা শুরু করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পুনরুজ্জীবিত ইসলামের আবির্ভাবের বারো শ' বছর পরে। যে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের নাম রেনেসাঁস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারা নারীর মুক্তি, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তির জন্য চেষ্টা করেছিলেন; শ্রেণী বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলন করেছিলেন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ইসলাম এই কাজগুলো বহু আগে করে গেছে। এ প্রসঙ্গে আমি রসূল (সা)-এর 'বিদায় হজ্জ'-এর ভাষণের কথা উল্লেখ করব। 'বিদায় হজ্জে' তিনি বলেছেন–

> হে মুসলিম! আঁধার যুগের সব ধ্যান ধারণাকে ভুলিয়া যাও, নব আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা-সংস্কার, অনাচার ও পাপ-প্রথা বাতিল হইয়া গেল। মনে রাখিও, সব মুসলমান ভাই ভাই! কেহ কাহারও চেয়ে ছোট নও, কাহারও চেয়ে বড় নও। আল্লাহর চোখে সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলিও না। নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেইরূপ অধিকার আছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও না, মনে রাখিও, আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।
>
> সাবধান ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই বাড়াবাড়ির ফলে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হইয়াছে। ...
>
> দাস-দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিও না। তোমরা যাহা খাইবে, তাহাদিগকে তাহাই খাওয়াইবে। যাহা পরিবে, তাহাই পরাইবে। ভুলিও না তাহারাও তোমাদের মত মানুষ।
>
> সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে।

এর থেকে বোঝা যায়, বিশ্ব মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রগতিশীলরা যেসব আন্দোলন করেছে তার প্রতিটি উপাদান ইসলামই গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক বিশ্বের মানুষ হয়ে ফররুখের ইসলামপ্রীতির এটাই কারণ। বিশের দশকে 'বাজল কি রে ভোরের সানাই' গানে নজরুল যে বলেছিলেন–

> আজকে আবার কাবার পথে
> ভীড় জমেছে প্রভাত হতে
> আসল কি ফের হাজার স্রোতে

www.pathagar.com

হেরার বাণী জগৎ জুড়ে।

ফররুখ 'সাত সাগরের মাঝি'তে সেই বাণীর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে সেই পথযাত্রায় তিনি মুসলিমদের পুনরায় আহ্বান করলেন এই বলে–

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজতোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ...

চতুর্দিকে হতাশার ছবি। কিন্তু মানুষকে মুক্তি দিতে পারে রাসুল (সাঃ)-এর পুনঃপ্রচারিত ইসলাম– হেরা গুহার সাধনায় তিনি যা পুনরায় অর্জন করেন এবং অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও অবহেলিত মানুষ ও মানবতাকে মুক্ত করতে সেই অর্জিত অস্ত্র ব্যবহার করেন। এই মহাবাণীর প্রচারক রাসুল (সাঃ) সম্বন্ধে তাই ফররুখ শ্রদ্ধা-আবেগের এক অপূর্ব কাব্যস্তবক রচনা করে লিখলেন–

তুমি না আসিলে মধুভান্ডার ধরায় কখনো হ'ত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পত্রপুট,
বিচিত্র আশা মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।
(সিরাজাম মুনীরা : মুহম্মদ মুস্তফা)

ফররুখ নিমেষে বুঝেছিলেন অন্ধকার পৃথিবীর রুদ্ধ-দুয়ার খুলে জগদ্দল পাথরের মত জগৎ জুড়ে চেপে বসা মূর্খতাকে কে প্রথম দূর করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র বাণীর আলো কে দুনিয়ায় প্রথম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলোর এই জোয়ারই তো দুনিয়ার নিদ্রাক্লান্ত মানুষকে প্রথম জাগিয়ে দেয়। অতএব বিশ্বজাগরণে ইসলামই প্রথম রেনেসাঁস।

ইসলাম ও ইউরোপের রেনেসাঁসের মধ্যে আলোচনা করলে বোঝা যাবে রেনেসাঁস বলে যে শব্দটিকে একটি মতাদর্শের আন্দোলন বলে আখ্যাত করা হচ্ছে মুহাম্মদীয় ইসলামই বিশ্বে সে কাজটি প্রথম সম্পাদন করে। জ্ঞান ও বুদ্ধির জগতের আড়ষ্ট আত্মাকে উন্মুক্ত করাতেই আবু রুশদ, আল গায্‌যালি, নাসিরউদ্দিন তুসী, জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে সিনা, ইবনে খলদুন, ওমর-খৈয়ামের মত মনীষীদেরও আরব ও ইরানে জন্ম হয়েছিল। রেনেসাঁসের ইতিহাসে বলা হচ্ছে এথেন্সের কাছ থেকে জ্ঞানের আলো নিয়ে ইতালী

www.pathagar.com

আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গ্রীক পণ্ডিতদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ইতালির পণ্ডিতেরা প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করে গ্রীক ও রোমান চিন্তাধারার পুনরুদ্ধার করে। এরই ফল পেত্রার্ক, বোকাশিও, মিকেলেঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, র‍্যাফেল প্রমুখ কবি শিল্পী এবং মেকিয়াভেলির মত রাজনীতিকের জন্ম হয়। এটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। কিন্তু ৬০৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে সাড়ে বারো শ' খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছ'শ' বছর গোটা ইউরোপ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবেছিল। কিন্তু ৭ম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের জগতে মুসলিমরা যে সমৃদ্ধির সৌধ নির্মাণে উৎসাহী হ'য়ে ওঠে তার সভ্যতা সম্বন্ধে জগদ্বাসী নিঃসন্দেহ।

মনীষীদের মতে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অর্জন করে ইসলামী আরব জগৎ। সিরীয়, ইরাকী, ইরানী, মিসরী, মাগরেবী ও হিস্পানী মুসলমানরাই এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। সেদিনের আরবী ভাষা ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা। প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার এই আরবী ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই সময়ের মুসলিম মনীষীরা বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহ করার তপস্যায় রত হন। গ্রীক, ভারতীয়, ইরানীয়, ইরাকীয়, মিসরীয় জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মধু আহরণ করে এই সময়ের আরবীয়রা এক জ্ঞানের মধুচক্র গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে মুসলিম খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে ক্রুসেডের যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের একটি সুফল হ'ল খ্রীষ্টান জগতে বা পাশ্চাত্যে নতুন করে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ। 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এম, আকবর আলী সাহেব বলেছেন, বিজ্ঞানের অনেক মূলসূত্রের আবিষ্কারের গৌরব মুসলিম বৈজ্ঞানিকদেরই প্রাপ্য 'কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের কার্যাবলীর বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞতাবশতঃ, অনেক সময় বা বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রাপ্য আসন তাঁদিগকে তাঁদের দেওয়া হয় নি।' জনাব এম, আকবর আলী লিখেছেন–

> টলেমি ও ইউক্লিডের অনুসরণই মুসলিম অঙ্কশাস্ত্রবিদদের প্রথম বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত। প্রথম দিককার বৈজ্ঞানিকগণ অতিমাত্রায় এঁদের অন্ধভক্ত ছিলেন বলা চলে। হয়ত এ স্বাভাবিক। সমস্ত তথ্য বিশেষভাবে অবগত না হয়ে, সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত না করে পূর্বেকার মনীষীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অহমিকার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই না। ধীর স্থিরভাবে সমস্ত কিছু জেনে নিলে পর পূর্বেকার জ্ঞান বিজ্ঞানের গলদ বের করে তার সংশোধন করা সম্ভবপর। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই ধীর স্থির পর্যালোচনার মনোভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

> দশম শতাব্দী থেকেই টলেমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয়। Solar system এর বর্তমান মতবাদের প্রথম সূত্রপাত দেখা দেয় একাদশ শতাব্দীতে। আল বেরুনী, আলজার কালি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের কাজ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ Geocentric মত ছেড়ে দিয়ে Helio-centric মতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। (বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : ৩য় খণ্ড)

বলাই বাহুল্য, আকবর আলী সাহেবের বিশ্বাস 'মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ' Helio-centric মতবাদের সূত্রপাত করেন। অনুরূপ-ভাবে নিউটনের Law of Gravitation-এর প্রথম পরিকল্পনাকারী মিসরের দ্বাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আল হাইছাম। একইভাবে Euclidean Geometry-র ত্রুটি শনাক্ত করেন নতুন Non-Euclidean Geometry-র আবিষ্কর্তা জিরোলামো সাকেরী। আকবর আলী সাহেব লিখছেন–

> Non-Euclidean Geometry এর মত আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। Analytic Geomerty এবং Binomial Theorem-এর মধ্যে অন্যতম। কবি-বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়ামের কার্যাবলীর মধ্যে Analytic Geomerty-র সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সেনা-গণিতবিদ Des Cartes-এর অমরত্ব লাভ করেছেন; কিন্তু Analytic Geomerty-এর ইতিহাস থেকে ওমর খৈয়ামের নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। Binomial Theorem নিউটনের আবিষ্কার বলে পরিচিত– তাঁর কবরের উপর নাকি Binomial Theorem-এর স্পষ্টরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

জনাব আকবর আলী এই বিকৃত ইতিহাসকে বিদ্বেষের ষড়যন্ত্র বলে ধারণা করেছেন। এবং এঁদের দ্বারাই 'মধ্যযুগ' হয়েছে 'অন্ধকার যুগ'।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে অবশ্য এই 'অন্ধকার যুগে'র সূত্রপাত হয়। এর আগে–

> "একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ত্রয়োদশ মধ্যভাগ পর্যন্ত (মুসলিম বিজ্ঞান জগতের উন্নতি) ধাপের পর ধাপ এগিয়ে গেছে। কোন দিকে কোন গ্লানি, এমন কি কোন দিকে কালিমার একটু রেখাও দেখা দেয় নাই। এ যেন ভরা ভাদরের ভরা নদী।"

মুসলিম জ্ঞান জগতের তখন এই অবস্থা ছিল। সুস্পষ্ট ভাষায় এম আকবর আলী বলেছেন–

www.pathagar.com

"এই উন্নতির সময় কিন্তু তারা সারা বিশ্বে একক উজ্জ্বল ও ভাস্বর। পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন আলোকরশ্মির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। এই সময়কার পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের সঙ্গে মুসলিম জাতির কার্যকলাপের তুলনা করলেই এ-কথা ভালভাবে উপলব্ধি হবে। মুসলিম জাতি যখন টলেমির বিরুদ্ধে নীরব বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর আলমাজেষ্টের অবৈজ্ঞানিকত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন, ইউরোপ তখন আলমাজেষ্ট শুধু পড়া শুরু করেছে বহু পূর্বের আরবী অনুবাদের লাটিন অনুবাদ থেকে। শুধু পাশ্চাত্যের নয় প্রাচ্যেরও সেই অবস্থা। ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে এক ভাস্করাচার্য ছাড়া অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায় না।"

এর থেকেই অনুধাবন করা যায় ইউরোপের অনেক আগেই মুসলিম জগৎ রেনেসাঁসের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তার জগতে মুসলিমরা তাদের এই আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি। গোষ্ঠীগত আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব এবং চিন্তা ও ধর্মীয় জগতের বিতর্ক তাদের অধঃপতনের দিকে টান দিতে শুরু করে। ৭ম শতাব্দী থেকে জ্ঞানানুসন্ধিৎসার এবং দর্শন-বিজ্ঞান-চর্চার যে জোয়ার সৃষ্ট হয়েছিল এবং তার আঙুলে পক্ষাঘাতের ব্যাধি সংক্রমিত হল, তার উন্নত শির দেখে হিমালয় মাথা নত করতে দ্বিধা শুরু করল। যারা মুসলিম জ্ঞানীদের শিষ্যত্ব বরণ করেছিল তারা মেষের চর্মের বদলে সিংহের চর্মে আচ্ছাদিত হতে মনোযোগ দিল। আকবর আলী সাহেব এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। '১২শ' শতাব্দী' অধ্যায়ে তিনি লিখছেন–

"ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ মুসলিম গুরুদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেরাও আস্তে আস্তে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে মন দিচ্ছে। তারাও আস্তে আস্তে মৌলিক গবেষণার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের রথ এগিয়ে যাচ্ছে। এতদিন যে সারথী তাকে চালিয়ে যাচ্ছিল এবং যে অশ্ব তাকে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের দু'জনেরই এসেছে ক্লান্তি, তারা সরাইখানায় আশ্রয় নিতে চাইছে। এবার সারথি বদল হবে, এবারেই নতুন ঘোড়া জোড়া হবে আগের ঘোড়ার জায়গায়। কিছু পরেই পূর্বের সারথি ও ঘোড়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দেওয়া হবে। ১২শ' শতাব্দী এই বদলানোর সরাইখানা।"

এবার আমাদের অন্য একটা দিকের পর্যালোচনায় যেতে হবে। রাসুল (সা:)-এর ওফাতের পর ইসলামের বিরুদ্ধকারীরা ইসলামী গণতন্ত্র ও সাম্যবাদী

www.pathagar.com

চরিত্রকে উৎখাত করতে উদ্যমী হয়ে ওঠে। কুরাইশদের মধ্যে যারা রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধতা করছিল এবং একদা সময়ের অভিশাপ যাদেরকে বিজয়ী মুসলিমদের কাছে মাথানত করতে বাধ্য করেছিল তাদের বিষ-বিদ্বিষ্ট চিত্তের বন্ধুত্ব পেয়েছিল মুসলিমবিদ্বেষী ইহুদীরা। এদেরই সমবেত চক্রান্তে শহীদ হতে হয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ)-এর, এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর। এসবেরই পরিণাম উষ্ট্রযুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার যুদ্ধ। এতে গোটা মুসলিম দুনিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হ'ল। সৃষ্টি হ'ল শিয়া ও সুন্নীর। এরই মধ্যে শেষ আঘাত হানল হালাকু। বাগদাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমিতে পরিণত করা বাগদাদ এক রকম শশ্মানভূমিতে পরিণত হল। এই বেদনার পটভূমিতে জন্ম হ'ল নৈরাশ্যবাদী ওমর ও হাফিজের। ক্লান্ত সৈনিকেরা আশ্রয় নিল বিজ্ঞানী আকবর আলী কথিত সরাইখানায়। নজরুল ইসলাম একটি অমর পংক্তিতে সেই হতাশার রূপ চিত্রিত করেছেন। 'দুর্দিনের এই দারুণ দিনে স্মরণ নিলাম পানশালার!' স্পেনে গিয়ে মুসলিমরা যে সভ্যতার আলোর প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল বাস্তবতার প্রতি উদাসীন তাদের উত্তরপুরুষেরা সেই বৈজয়ন্তীকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে রাখতে পারল না। ভারতশাসক মুসলিমদেরও হল একই অবস্থা। পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ে নৈতিক বিপর্যয় ঘটল ভারতীয় মুসলিমদের। ফররুখ-কাব্যের পটভূমি জানার জন্যে এই দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট জানার একান্ত প্রয়োজন। আসলে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে মুসলিম জাতির জাহাজটি নেতৃত্বহীন বা নাবিকহীন অবস্থায় ঘুরপাক খেতে শুরু করল।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত এক শ' বছর ধরে এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম চালিয়েছিল ভারতীয় মুসলিমরা। এই যুদ্ধে জিততে হ'লে যে সামরিক শক্তি,অর্থনৈতিক শক্তি, প্রজ্ঞাশক্তি, শিক্ষাশক্তি, সর্বশেষে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন মুসলিমদের তা ছিল না। অতীতে অর্থাৎ ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতক পর্যন্ত মুসলিমরা তাদের যে সামরিক শক্তি বলে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক অংশ জয় করেছিল; সেখানে যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হ'ত সে অস্ত্রের রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে সম্পূর্ণ বদলে যায়। ভারতের পানিপথের যুদ্ধে বাবরের বিজয়ী হওয়ার পিছনে ছিল গোলন্দাজবাহিনী। ইতিহাস বলছে, 'এই যুদ্ধে বাবর কামান ও অন্যান্য উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন।' (ভারতবর্ষের ইতিহাস : অধ্যাপক কে আলী)। এই বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ ক্রমাগত যে উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সে শক্তিতে পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয়রা প্রভূত উন্নতি সাধন করে। তারা নৌ-শক্তিতে প্রাচ্যকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

www.pathagar.com

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ী রচিত 'সিরাজদ্দৌলা'য় এই বিষয়টির উপর আলোচনা হয়েছে। বালক বয়স থেকে সিরাজদ্দৌলা ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তাঁর মেধা বলে বুঝেছিলেন যে ইংরেজরা একদা বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক শত্রুশক্তি হয়ে দাঁড়াবে। অতএব তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দূরদর্শী সিরাজের নানা নবাব আলীবর্দী তার উত্তরে যে কথা বলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তেজস্বী সিরাজের বিশ্বাস ছিল, 'সামান্য একটু তাড়া দিলেই বাণিজ্যের খাতাপত্র এবং মালগুদাম ফেলিয়া ইংরাজ বণিক ভেড়ার পালের মত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার পথ পাইবে না।' কিন্তু সিরাজের ধারণার বিরুদ্ধে আলীবর্দীর এই বক্তব্য ছিল–

> 'মহারাষ্ট্র সেনা স্থলপথে যে যুদ্ধানল জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহাই নির্বাপণ করিতে পারি না, এ সময়ে ইংরাজের রণতরী যদি সমুদ্রে অগ্নিবর্ষণ করে, তাহা হইলে সে বাড়াবানল কেমন করিয়া নির্বাণ করিব?" (সিরাজুদ্দৌলা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

আলীবর্দীর এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা আনন্দমঠের মহাপুরষরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের এইসব বক্তব্যকে মিলিয়ে নিতে পারি। মুসলিমবিজয়ী সেনাপতি সত্যানন্দ যুদ্ধ শেষে চিকিৎসক মহাপুরুষের সঙ্গে পরবর্তী কাজের কথা বললে চিকিৎসক মহাপুরুষ (বঙ্কিমচন্দ্র) তার ইংরাজ তাড়ানো যুদ্ধের স্বীকৃতি না দিয়ে বললেন– 'হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না'। এ কথা শুনে মর্মাহত সত্যানন্দ বলল 'হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?' চিকিৎসক মহাপুরুষ উত্তরে বললেন 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।' তারপর চিকিৎসক বঙ্কিমচন্দ্র প্রজ্ঞাধর্মী এই বক্তব্য রাখেন–

> "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পুজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম– ম্লেচ্ছরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে– তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রথম ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া

www.pathagar.com

গিয়াছে– কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই– শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপন্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরাজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে– নিষ্কন্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান– ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

তারপর মহাপুরুষ এই শেষ কথা বললেন– 'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।'

আলীবর্দী এতটা গভীরে দৃষ্টি দেননি। কিন্তু সজ্ঞা দিয়ে এটুকু বুঝেছিলেন প্রযুক্তি বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অধিকতর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সমৃদ্ধ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ বিজয়ী হওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে।

কলকাতায় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিরাজ জয়ী হয়েছিলেন। নিজ আত্মীয়, কর্মচারী ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে পলাশীর যুদ্ধে সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। উল্লেখ্য যুদ্ধাস্ত্রের দুর্বলতার কারণে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় হয়নি। তাঁর পরাজয়ের মূল কারণ ছিল স্বার্থান্বেষী দেশশত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতা । পরবর্তীকালে মীর কাসিম, হায়দার আলী এবং টিপু সুলতানের পরাজয়ের মূলে ছিল যুদ্ধাস্ত্রের দুর্বলতার সঙ্গে স্বদেশীয় রাজা ও নবাবদের বিশ্বাসঘাতকতা। মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিমরা জীবনবিমুখ ও জীবনবাস্তবতা থেকে দূরে সরে যায় এবং ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানবিমুখ হয়ে পড়ে। বিজ্ঞান সমৃদ্ধির যুগে প্রযুক্তি বিজ্ঞানে মুসলিমরা পিছিয়ে ছিলেন না। বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিবেদিত মুসলিমরা মারাঘার মানমন্দিরকে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করেছিল। এর ভার পড়েছিল প্রযুক্তি বিজ্ঞানী মোয়ায়েদউদ্দীন আল উরদীর উপর। মানচিত্র অঙ্কনবিদ্যাতেও মুসলিমরা

www.pathagar.com

কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল্ খারিযমী, আল্ বালখী, ইস্তাখরী ইবনে হাওকাল, আল ইদ্রিসী প্রমুখ মানচিত্র অঙ্কন বিদ্যা (Catography) কে সমুন্নত করেন। এক সময় আরবরা নৌ-শক্তিতে সমৃদ্ধি লাভ করে। হুমায়ুন খান অনূদিত সৈয়দ সুলায়মান নদ্‌ভীর 'আরব নৌবহর' পুস্তকটি পড়ে জানা যায় যে নৌ-শক্তি-চর্চায় আরবরা পাশ্চাত্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। একস্থানে তিনি লিখছেন–

> "সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুস্থান বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ইউরোপীয়রা ছাড়া আর কেউ সমুদ্র পথে আক্রমণ করেনি– এ ধারণাটি সত্য নয়। আরবরা জল ও স্থল উভয় পথেই হিন্দুস্থানে অভিযান করেছিল। ... ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু অভিযান কালে মুহম্মদ ইবনে কাসিম তাঁর সেনাদলের একাংশ নিয়ে যদিও শিরাজের মধ্য দিয়ে মাকরান হয়ে সিন্ধুতে এসেছিলেন, তাঁর সেনাদলের অপর অংশ খাদ্যশস্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল সমুদ্রপথে। তিনি থাট্টা বন্দর (দাইবাল) অধিকার করে সামনে অগ্রসর হন। পরে সমুদ্র-পথেও তাঁকে সামরিক সাহায্য করা হয়। ১০৭ হিজরীতে জুনাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল মুররী সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত হলে তিনি রাজা জয়সিয়ার সঙ্গে নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মনডল ও বাহরোচ অধিকার করেন।" (হিন্দুস্তানে নৌ অভিযানঃ উমাইয়া আমলঃ আরব নৌবহরঃ সৈয়দ সুলায়মান নদভীঃ অনুঃ হুমায়ুন খানঃ পৃঃ ৯)

নৌ-শক্তিতে আরবীয়দের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেছেন ইবনে খলদুন। তিনি লিখেছেন–

> আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠলে বিভিন্ন পেশার লোক তাদের অধীনে চাকরী করতে আসে। তারা খালাসী সুখানী ও নাবিকদের নিযুক্ত করে, এরা তাদের নৌ অভিযানের জ্ঞান ও কার্যাবলী বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তখন আরবদের মধ্য থেকেই নৌ-অভিযানের জ্ঞান ও কার্যাবলী বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তখন আরবদের মধ্য থেকেই নৌ-চালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি তৈরী হয় এবং তখন তাদের নৌ-জিহাদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সওদাগরী ও যুদ্ধ এই উভয় উদ্দেশ্যেই তারা জাহাজ নির্মাণ করতে থাকে এবং যুদ্ধ জাহাজগুলোকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলে। ভূমধ্যসাগরের অপর প্রান্তে, আফ্রিকার উপকূল ভাগে যুদ্ধ

www.pathagar.com

> করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। যেসব স্থান যুদ্ধের জন্যে নির্বাচিত হয় সেগুলো সিরিয়া, আফ্রিকা, মরক্কো ও স্পেনের উপকূলে অবস্থিত ছিল। খলিফা আবদুল মালিক আফ্রিকার শাসনকর্তা হাসান ইবন নুমানকে তিউনিসে নৌ-যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলার আদেশ প্রদান করেন। (ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধজাহাজ: ভূমধ্যসাগরে ফাতেমীগণ: আরব নৌবহর: পৃ: ২৬)

ঐ সময়ে নৌ-যুদ্ধে পরাক্রমশালী হ'লে আরবরা একের পর এক দেশ দখল করতে থাকে। এই নৌ-শক্তির কারণে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এবং ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত মুসলিমদের অধিকারে আসে। সৈয়দ সুলায়মান নদভী লিখছেন–

> গৌরবময় যুগে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় খ্রীস্টান নৌ-বহরের আধিপত্য সামান্যই ছিল। ফলে সবখানে মুসলমানদের নৌ-বিজয় সূচিত হয় এবং তারা প্রায় সবগুলো দ্বীপেরই প্রভুত্ব অর্জন করে; যথা, মেজর্কা, মাইনকা, আইভিজা, মার্ভিনিয়া, সিসিলী, কাওসারা, মাল্টা, ক্রীট, সাইপ্রাস এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভূখন্ড। (ঐ: পৃ:২৭)

বাস্তবত মুসলমানরা তখন ছিল 'সাগরের বাদশা'। কিন্তু সাগরের সেই বাদশাহী মুসলিমরা ধরে রাখতে পারেনি। বাগদাদের হালাকুর পদতলে দলিত হওয়া এবং স্পেনের পতন, আব্বাসীয় খলিফাদের যুগের অবসান মুসলামানদের আধিপত্যকে দ্রুত অধোগতিমুখী করে তোলে। এম আকবর আলী মুসলিম জগতের অবনতির আর একটি কারণ দেখাতে গিয়ে লিখেছেন–

> "ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের মতে এর কারণ হোল ধর্মের গোঁড়ামীর প্রতি অনুরক্তি; ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রাধান্য না দিয়ে কাঠামোকে প্রাধান্য দেওয়া।"

বিজ্ঞান-চর্চার উৎসাহ অনীহার ব্যাপার নিয়ে যে বির্তক হয় তাতে বিজ্ঞানবিরূপ ধর্মপ্রেমিকরা অবদান রেখেছে না ধর্মশত্রুরা অবদান রেখেছে এ নিয়ে বিতর্কের আজও অবসান হয়নি। চার্চের ও গীর্জার প্রভাব ও আধিপত্য কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল বলে ইউরোপে রেনেসাঁসের সৃষ্টি হয়। আর রেনেসাঁস শুধু নব ইউরোপের চোখ খুলে দেয় না– তার জ্যোতিকে করে তোলে প্রখর। আকবর আলী, যিনি একজন গভীর মুসলিমপ্রেমিক, তিনিও লিখেছেন–

www.pathagar.com

> "১২শ' শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মের দিক দিয়ে এমনি বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা বেশ এগিয়েই চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতিতে এসে গেছে এক বিরাট পরিবর্তন। শিক্ষার বিষয় নিয়ে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাই দুইভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে। এক দিকে (১) ধর্মীয় দ্বীনী (Religiostic) ইলম– শুদ্ধবুদ্ধ পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় বিষয় আর অন্য দিকে ধর্মনিরপেক্ষ (২) আকলী ইলম– ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়।"

আকবর আলী সাহেব দেখিয়েছেন আল গায্‌যালীর প্রভাবে 'ধর্মীয় দ্বীনী ইলম'– দ্বিতীয় ধারার ইলমের উপরে স্থান লাভ করে। জনাব আকবরের মতে মুসলিম জগতের বৃহত্তম অংশ তাঁর বাণীকে কোরআনের পরেই স্থান দেওয়া শুরু করে।

আমি এর বিস্তৃত ইতিহাসে যাব না তবে মানব-মুক্তি, মানব স্বাধীনতা মুক্তি, মানব চিন্তা-নিপীড়ন-মুক্তি যদি রেনেসাঁস নামে অভিহিত হয় তবে ইসলাম সেই রেনেসাঁসের প্রথম উদ্ভাবক এ-কথা স্বীকার করা আমি যৌক্তিক বলে মনে করব। নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ তাই ইসলামকে মানবতার মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান বা একমাত্র প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নজরুল যখন বলেন–

> "আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তারা যেন সকলের ক'রে দেখেন।"

তখন তাঁকে শুধু মুসলমানের কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে দ্বিধান্বিত বলে মনে হয়। যদিও মুসলিম জাগরণে তাঁর উজ্জ্বল অবদানকে অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁর কাব্য-আদর্শে একটা মিশ্রণ সহজ দৃষ্টিগোচর। এই মিশ্রণটা ফররুখের চিন্তায় কখনো প্রবেশ করেনি। 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' গ্রন্থিত কবিতা রচনার সময়কাল থেকে তিনি একটি অবিমিশ্র চিন্তাদর্শের সঙ্গে অটুটভাবে সংযুক্ত হয়ে যান। হিন্দু সাহিত্য-চিন্তা, হিন্দু-পুরাণ, হিন্দু-ইতিহাস তাঁর সচেতন সাহিত্য বা কাব্যকর্ম থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত হয়। নজরুল যে বলেছিলেন, 'বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে।' বা 'বাঙলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব- দেবীর নাম দেখলে মুসলামানদের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে

www.pathagar.com

দেখে ভুরু কোঁচকানো তাদের অন্যায়।' এর সঙ্গে ফররুখ ভিন্নমত পোষণ করে হিন্দু মানসিকতাকীর্ণ সাহিত্য ও কাব্য থেকে নিজেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও সত্তার কাব্য রচনা করেছেন। পথিকৃৎ অবশ্য নজরুলই ছিলেন। মুসলিম সাংস্কৃতিক রূপ তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন। তিনি বাঙালী মুসলিম সমাজের ভাষা, তাঁর ধর্মীয় পরিভাষাকে বাঙলা কাব্যে স্থান দেন, শুধু আরবী, ফারসী শব্দ নয়– তার ইতিহাস, তার শাস্ত্র, তার সমাজ ঐতিহ্যের শব্দ পুঁথি সাহিত্য ও পুঁথিগত ও লোক সাহিত্যগত শব্দ তাঁরই মাধ্যমে বাংলা কাব্যে নতুন করে প্রবেশ করে। কিন্তু ইবরাহীম খাঁর অনুরোধে শুধুমাত্র মুসলমানের কবি হওয়ার আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দেননি। কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মুসলমান বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতির যে ভিন্ন রূপ আছে সেটা দেখিয়ে দেন। ফররুখ এই ভিন্ন রূপটিকে তাঁর কাব্য ও সাহিত্য-চিন্তার প্রধান রূপ হিসেবে গড়ে তোলেন। মুসলিম রেনেসাঁ সোসাইটি যেটা করতে চেয়েছিল সেটাই বাস্তব রূপ পায় ফররুখ কাব্যে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় লিখেছিলেন–

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

এটা মুসলমানদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লেখেননি, লিখেছিলেন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপেক্ষা ও ঘৃণাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু এটা ভিন্নধর্মী মুসলিম সমাজের চেয়ে হিন্দু নিম্নশ্রেণীর প্রতি ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দৃষ্টিকোণের যেহেতু পার্থক্য ছিল না সে জন্যে 'অজ্ঞানের অন্ধকারে' আবৃত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিদ্রোহ খুব স্বাভাবিক ছিল। এই বিদ্রোহের প্রধান কবি হিসেবে ফররুখের উদ্ভব ঘটে। সে জন্যে ফররুখের কাব্যের প্রধান ও মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে– পুঁথি সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, আরবী-ফারসী সাহিত্য, আরব্য রজনী, কোরআন, হাদীস ইত্যাদি। এই পার্থক্যের সহজ চিত্রটি আমরা এইভাবে দেখাতে পারি।

মুধুসুদন যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন– তাতে স্থান পায় 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কাশীরাম-দাস', 'কৃত্তিবাস', 'জয়দেব,' 'কালিদাস', 'মেঘদূত', 'শ্রী-পঞ্চমী', 'সায়ংকালের তারা', 'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির',

www.pathagar.com

'সীতাদেবী', 'মহভারত', 'স্বরস্বতী', 'শ্মশান', 'সীতা বনবাসে', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'কুরুক্ষেত্র', 'সুভদ্রা', 'উর্বশী', 'দুঃশাসন', 'ঈশ্বরচন্দ্র', 'রামায়ণ', 'শকুন্তলা', 'বাল্মিকী' নামীয় কবিতা। এর সঙ্গে ফররুখের 'মুহূর্তের কবিতা'র শীর্ষনামের দিকে দৃষ্টি দিলেই পছন্দের বৈপরীত্য লক্ষ্য করব। ফররুখের চতুর্দশ পদাবলীর কবিতাসমূহের শিরোনাম যথাক্রমে এমনি– 'ফেরদৌসী', 'রুমী', 'জামী', 'সাদী', 'গরীবুল্লাহ', 'শাহ গরীবুল্লাহ' 'অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে', 'পুথির আসর', 'পুথি পড়াঃ মুহারম মাস', 'শহীদে কারবালা', 'হাতেম তায়ী', 'কোহে নেদা', 'শবেকদর উপলক্ষে', 'শবেবরাত প্রসঙ্গে', 'কুতুব তারা', 'সন্ধ্যা তারা','মুসতারি সিতারা'। লক্ষ্য করার বিষয় মধুসূদনের চেতনা জুড়ে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, হিন্দু ইতিহাস ও সাহিত্যের চক্র রেখা; ফররুখের মানসচেতনা আবর্তিত মুসলিম ধর্ম-সমাজ ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। মধুসূদন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান হয়েছিলেন। তিনি এমন কি বন্ধু রাজ নারায়ণকে এক চিঠিতে বলেছিলেন, I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, কিন্তু তিনি হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কবিতার অনিন্দ্যআধার বলে মনে করেছিলেন। সে জন্যে তিনি ঐ বক্তব্যের পরে বলেন, I love the grand mythology of our ancestors: It is full of poetry. তাঁর ধারণায় The fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.মুসলিম নজরুল তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে ও বৈষ্ণব সঙ্গীতে এই Most inventive head-এর এই সৃষ্টি-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পুঁথি সাহিত্য নিয়ে ফররুখ এই beautiful things 'সাত সাগরের মাঝি' 'হাতেম তায়ী'তে manufacture করেন। তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'নৌফেল ও হাতেম' ও 'কাফেলা'ও নির্মিত হয় পুঁথি, ফারসী সাহিত্য ও মুসলিম ইতিহাস থেকে। মুধুসূদনের সঙ্গে ফররুখের পার্থক্য হল : মধুসূদন ছিলেন সাহিত্যে ও কাব্যে আত্মসমর্পিত। সে জন্যে খ্রীস্টান হয়েও হিন্দু সাহিত্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন। কিন্তু ফররুখ শুধু তাঁর ধর্মের প্রতি অনুরক্ত নন, সেই ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর শিল্প সাহিত্য ও কাব্যের সঙ্গে অবিমিশ্র ভালোবাসা সম্পৃক্ত। কাব্যকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁর ধর্মবন্ধন ছিন্ন করার প্রয়োজন হয়নি– বলতে হয় নি– I hate Islamism.

এতে কি ফররুখ রেনেসাঁসের মন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন? হিন্দু সমাজে যে পুনর্জাগরণ আসে তার সমস্তটাই ছিল হিন্দুসমাজকেন্দ্রিক। এখানে বলা

www.pathagar.com

আবশ্যক ভারতে যে রেনেসাঁসের বিরুদ্ধাচরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দ্বারা যে আন্দোলন হয় তাকে নব হিন্দুবাদ বা Neo Hinduism নামে অভিহিত করা হয়। সেটা কিন্তু রেনেসাঁস নয়। অন্তত: পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মর্মার্থের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। তবে আভিধানিক অর্থে যে জাগরণ সে জাগরণকে তথাকথিত রেনেসাঁস বলা যেতে পারে। ধর্মকে যারা উৎখাত করেনি কিন্তু গির্জা ও চার্চের আধিপত্য থেকে যাঁরা সংস্কারকৃত ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই reformist। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই কাজটি করেছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে। কিন্তু আমি বলেছি যে ইসলাম নিজেই রেনেসাঁস। বাংলাদেশে রামমোহনকে রেনেসাঁসের উদ্গাতা বলার কারণ– (১) পৌত্তলিকতার বিরোধিতা, (২) সতীদাহ প্রথাকে বর্বরতারূপে প্রতিপন্ন করে ঐ প্রথাকে উৎখাত করার জন্য তাঁর সংগ্রামে অবতরণ, (৩) ইংরেজী শিক্ষাকে তাঁর অগ্রাধিকার দান। মোটকথা, সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা ছিল রামমোহনের আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ছিল বিধবা-বিবাহের উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়িতকরণ। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রকৃত চরিত্র বোধ হয় ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহী যুবকদের মধ্যে রূপ লাভ করে– যারা বলেছিলেন– 'যা কিছু প্রাচীন তাই ধ্বংস কর', নতুনের প্রতিষ্ঠা কর। এই রকম প্রাচীন সংস্কার-জর্জরিত এবং সংস্কারমৃত সমাজকে ধ্বংস করে ইসলামের নবজাগরণ হয় রাসূল (সাঃ)-এর দ্বারা। শ্রেণী ও বর্ণভেদে সকল মানুষের অধিকার দানই ছিল ইসলামের মূল লক্ষ্য। রামমোহন, ভল্টেয়ার, রুশো, মার্কস–তার অতিরিক্ত কিছু দিতে পেরেছেন কি? এ জন্যেই ফররুখ আহমদও ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বলা আবশ্যক রেনেসাঁসের দ্বিতীয় অর্থ : 'এ প্রাচীনকে ধ্বংস করা নয়, সে ঐতিহ্যকে সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে না, পুরনো ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর নতুন আদর্শ সৃষ্টি করে; পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করে।' ইসলামকে নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহ্‌মদ এই দ্বিতীয় অর্থের রেনেসাঁস হিসাবে অগ্রাধিকার দেন। তাঁরা ইসলামকে প্রচীন হিসাবে দেখেননি। তাঁরা ইসলামকে দেখেছিলেন প্রাচীনতা বা মূর্খতা থেকে মুক্ত আলোক-উৎস হিসাবে।

বলা বাহুল্য ফররুখের রেনেসাঁস চিন্তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তাঁর বক্তব্যকে এবং কাব্য নির্মাণে তাঁর ক্যানভাসটিকে জানতে হবে। তিনি ধর্ম-বিরোধী তো ছিলেনই না উপরন্তু তিনি তাঁর ধর্ম ইসলামকে মানব-কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাদর্শ

www.pathagar.com

ভেবেছিলেন। তাঁর চিন্তার ভিত্তিমূলে যেমন ছিল বিশ্ব মুসলিমদের ইতিহাস, তেমনি ছিল উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাস। বিশ্ব মুসলিমের ইতিহাস যেমন গর্ব ও বেদনার ইতিহাস, তেমনি উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাস উত্থান ও পতনের, আনন্দ ও বেদনার ইতিহাস। এই ইতিহাসের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় যেমন উজ্জ্বল সূর্য-দিনের উদাহরণ আছে, তেমনি নিরুজ্জ্বল রাত্রির অমাবস্যার উদাহরণ কম নেই। 'সাত সাগরের মাঝি'তে রূপকাকারে এরই কাব্যকাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আর তারই নিরাবরণ রূপকে উন্মোচিত করেছিলেন 'সিরাজাম মুনীরায়' – যেখানে কবিতার obscurity বা অন্ধকারকে প্রশ্রয় দেননি। 'নৌফেল ও হাতেম' এবং 'হাতেম তায়ী'তে যে মানবতাবোধের গভীরতাকে তিনি উপস্থাপিত করেন তা ছিল মূলতঃ ইসলামী মানবতাবাদের কাব্যরূপায়ণ। তিনি ভেবেছিলেন এই পৃথিবীর সকল অশান্তির দূরীকরণ, সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামী দর্শন, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্ভব।

একটা প্রশ্ন হতে পারে রেনেসাঁসই যদি ইসলাম তাহলে নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, হালী ইকবালকে আবার মুসলিম রেনেসাঁসের কবি হিসাবে চিহ্নিত করার কি কারণ। ইসলামী বিধান চিরকালের অক্ষয় জীবনবিধান– মুসলিম মনীষীদের এটাই বিশ্বাস। কিন্তু এই বিধানের সংরক্ষণ ও উজ্জীবনের প্রয়োজন আছে। কারণ শত্রু জাতিরা ইসলামের সেই চাঁদমুখকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় সদানিরত। সাধারণ-অসাধারণ-আত্মভোলা মুসলিমরা নিজেদের স্বার্থে, অন্ধতা ও অজ্ঞতার কারণে শত্রুর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি দেখতে পায় না। এর জন্যে জন্ম নিতে হয় হযরত ওমর (রা) কে, হযরত আলী (রা)-কে, একজন গাজ্জালী (র)-কে, একজন আবদুল কাদের জীলানী (র)-কে, খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (র)-কে; হালী, ইকবাল ও নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহমদকে। এর জন্যে শাহাদাৎ বরণের ইতিহাসে যেমন নাম লেখাতে হয় হযরত ওসমান (রা)-কে, হযরত ওমর (রা)-কে, হযরত আলী (রা)-কে, তেমনি হযরত হাসান ও হযরত হোসেন (রা)-কে। শহীদ হ'তে হয় সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও তিতুমীরকে। আর এদেরকে স্মরণ করতে এগিয়ে আসতে হয় হালী, ইকবাল, নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদকে। মসির এই যুদ্ধে ফররুখের এই সৈন্যাপত্যের ভূমিকা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

উল্লেখ্য, কোন কোন জাতির জীবনে পরাজয়ের গ্লানির হতাশা তাঁর শক্তি-শোষণের রূপ ধরে দেখা দেয়। কারবালার যুদ্ধের পরাজয় (যেটা ছিল ভয়াবহ অসম যুদ্ধ), হালাকুর হাতে বাগদাদের পতন, স্পেনের পতন, পলাশীর যুদ্ধে

www.pathagar.com

যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ এবং পরিশেষে ১৮৫৭-এ সিপাহীদের বিপ্লব– ইংরেজরা যাকে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেছে– ছিল মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার বা আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজের কাছ থেকে মুসলিমরা তেমন সহযোগিতা পায়নি। বলাই বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীতে যে হিন্দু জাগরণ ঘটে সেটা বৃটিশের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম ছিল না; ছিল হিন্দু সমাজের সংস্কারধর্মী আন্দোলন। হিন্দুরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে বৃটিশদের হাতে যদি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় না হ'ত তাহলে আরও দীর্ঘদিন তাদের মুসলিম শাসনের অধীনে থাকতে হ'ত। অতএব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিজয় একদিক থেকে ভারতীয় হিন্দুদের অর্ধেক স্বাধীনতা প্রাপ্তি। আনন্দমঠে এই কথাটাই পরোক্ষে বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ইংরেজদের মিত্র বলে মন্তব্য করেছিলেন। গোটা হিন্দু সম্প্রদায় সেজন্যে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নত ও সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য অদম্য চেষ্টায় নিরত হয়। এ-সময় তারা তাদের ভাবনায় কখনও মুসলিম সমাজের কথা চিন্তা করেনি। বরং স্বগোত্র, স্বগোষ্ঠী ও স্বসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে তারা ব্যাকুলতায় আত্মসমর্পণ করে। তাদের মধ্যে আত্মোন্নয়নের যে জাগরণ হয় তারই ফল– রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। নব-সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ মুসলিমরা এটা লক্ষ্য করছিল এবং পরিত্যক্ত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত সমাজের সদস্য হিসাবে এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তারা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। আত্মরক্ষার জন্যে তাদের ধারণা হয় যে তারা বঞ্চিত তাই নবজাগরণের মাধ্যমে স্বসমাজের নিশ্চেষ্টতার ও মূর্খতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ধর্মবিরূপ মুসলিম শিক্ষিত তরুণদের রেনেসাঁসের সঙ্গে এর মিল ছিল না। রেনেসাঁসের জন্যে এরা- ভিন্ন আন্দোলন গোষ্ঠী করে। এ উপলক্ষে ১৯৪৪ সালে রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলন হয় কলকাতায়। এই রেনেসাঁ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির ভাষণে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেছিলেন (মাসিক মোহাম্মদীর শ্রাবণ-ভাদ্র-সংখ্যায় প্রকাশিত)–

> "জাতির চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটনের নাম রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনা রেনেসাঁর নেই। অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী তাই নিঃসন্দেহে রেনেসাঁর ভিত্তিভূমি। অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যতকে বরণ করে। তাই রেনেসাঁ চিন্তারাজ্যে বিপ্লব।"

www.pathagar.com

এরপর আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেছেন–

> "তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো জাতি সত্যিকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ সাহিত্য তমদ্দুন, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে।"

কিন্তু মুসলিম মনীষী আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুজিবুর রহমান খাঁ প্রমুখ মুসলিম সমাজের মধ্যে যে জাগরণের বাঁশী বাজাতে চান সংঘবদ্ধভাবে সেটা হিন্দু জাতির রেনেসাঁর সমগোত্রীয় যাতে না হয় সে বিষয়ে সজাগ ও সচেতন ছিলেন। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনকারী আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তাদর্শের সঙ্গেও এদের মিল ছিল না। মুতাযিলাদের সঙ্গে যে পার্থক্য ছিল গাযযালী ধারার চিন্তাবিদদের এখানেও সেই পার্থক্যের রূপ প্রকট হ'য়ে উঠল। নিরপেক্ষবাদী কংগ্রেস ও কমিউনিস্টপন্থী মুসলিমদের সঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ বা মুজিবর রহমান খাঁদের মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয়বাদী রেনেসাঁস তৌহিদভিত্তিক রেনেসাঁস গড়ে তুলতে চাইলেন। এই বিষয়টিও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষণে দ্রষ্টব্য। তিনি বলেছেন–

> "অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী সত্যকার আজাদীর কথা– রেনেসাঁর কথা নয়। সে ব্যর্থতার পরে আমরা গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ। পরের দেখানো পথে আজাদী মেলে না। আমরা ভুল পথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এই সব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে সত্যিকার পথের সন্ধান। জাতির চিত্তলোক ফুঁড়ে উত্থিত হ'য়েছে পাকিস্তানের বাণী। এক মুহূর্তে জাতি আপন স্বস্থতা ফিরে পেয়েছে পরাণুকরণের পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে। সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। নিজস্ব পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছুদিন বিজাতীয় উর্দু ভাষার মোহে কাটিয়েছি তার পর শুরু হ'ল অনুকরণের পালা।"

এখানে বলা উচিত যে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ধারণায় ইসলামী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণাটা সুস্পষ্ট ছিল না। তিনি বললেন–

> "পুথি ও লোক সাহিত্যে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাবর্তনে সে স্বস্থতা ও স্বকীয়তা আসবে না– কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা–

www.pathagar.com

রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই।"

তিনি পুঁথি সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের কথা বলেছিলেন কিন্তু বিশ্ব-মুসলিম সাহিত্যের কথা বলেননি। তিনি 'বিজাতীয় উর্দু ভাষা'র কথা বলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণাকে অস্পষ্টতার দ্বারা আবৃত করেছেন। বলা বাহুল্য উর্দু ভাষার নিজস্ব কোন শব্দ নেই বললেই চলে। তার অধিকাংশ শব্দ আরবী ও ফারসী। এ অবস্থায় বিজাতীয় উর্দু ভাষা বললে আরবী ও ফারসীও বিজাতীয় ভাষা হ'য়ে যায়। আর সেখানে তৎসম সংস্কৃত শব্দ হ'য়ে পড়ে জাতীয় শব্দ। সাধারণ রাজনৈতিক চিন্তাধারার কারণে তিনি কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনে হয় আবেগের পরিচয় দিয়েছেন।

মুসলিম জাতি এবং বাঙালী মুসলিম জাতি ভিন্ন। তৌহিদবাদী মুসলিম জাতি অভিন্ন। ধর্মীয় দিক থেকে বা ঈমানী চেতনার দিক থেকে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মুসলামানের কোন পার্থক্য নেই। ধর্মের মূল স্তম্ভের ধারক হিসাবে সেখানে আরব, পারস্য, মিসর, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, মরক্কো, তিউনিসিয়ার মুসলমানদের কোন পার্থক্য নেই। বলাই বাহুল্য, দেশীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা– মুসলিমদের মধ্যে এই ভিন্নতার প্রাচীর গড়ে দিয়েছে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতি করেও আরবীকে বলেছিলেন মুসলমানের জাতীয় ভাষা। 'ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা' প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ তাই বলেছেন–

> "ভৌগোলিক সীমা বা ভাষার মধ্যে য়ুরোপীয় জাতি (নেশন)। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানের জাতি কোন দেশের বা ভাষার বেষ্টনীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, বিশ্বের মুসলমান এক জাতি (কওম)। বাহিরের লোকের নিকট মুসলমান ইরানী, মিসরী, বাঙালী, হিন্দুস্তানী, কিন্তু মুসলমান মুসলমানের নিকট একমাত্র মুসলমান ব্যতীত তাহার কোন জাতীয় সংজ্ঞা নেই। ধর্মের নিম্নেই জাতীয়তার প্রধান সাধক ভাষা। এইজন্য ইসলাম দেশীয় ভাষার অতিরিক্ত রূপে তাহার জাতীয় ভাষা করিয়াছে আল্লাহ্ ও রসুলের বাণী আরবীকে।"

যা হোক, আবুল কালাম শামুসদ্দীন মুসলিম বাঙালীদের যে পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তা আছে এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্ব মুসলিম জাতীয় সত্তার সম্পৃক্ততা রয়ে গেছে সেটা তার এই বাক্যে উন্মোচন করেছেন–

> "আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষানীতির গণতান্ত্রিক এবং অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বিশিষ্টতার কথা।" (প্রাগুক্ত ভাষণের অংশ)

এই স্বাতন্ত্র-বাদী রেনেসাঁসের চেতনা ফররুখ-মানস জুড়ে অবস্থান করছিল। ফররুখ আহ্‌মদ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এটা প্রতিক্রিয়াজাত এবং সত্যচেতনতা জাত। একই দেশে বাস করে যদি একটি সম্প্রদায় অন্য একটি সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন সমাজের লোক বলে পৃথক দৃষ্টিতে দেখে তখন সেই বর্জিত সম্প্রদায়ের লোক নিজের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে, আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠাতার জন্য প্রতিবাদী হতে বাধ্য হবে। এই পৃথক অস্তিত্বে বলীয়ান হয়ে উঠতে গিয়ে রেনেসাঁসের ভিন্ন রূপকে পুষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেছিলেন ফররুখ আহ্‌মদ। নজরুল ইসলাম হিন্দু মুসলমানের মিলনের যে সমন্বিত সমাজ গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার অভাব ছিল। 'শম্ভুর বম্বু' এবং 'ছকু মিয়ার ছুরি' যে এক হবে না এ সন্দেহ তাঁরও ছিল। সে জন্যে তিনি 'প্যাক্ট' কবিতার শেষে সেই বাস্তবতার দৃষ্টান্ত দিতে লিখেছেন–

মসজিদ পানে ছুটিলেন মিয়া মন্দির পানে হিন্দু
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা করুণ চন্দ্রবিন্দু !

১৯২৯-এর এলবার্ট হলে নজরুলকে দেওয়া সম্বর্ধনা অভিনন্দনের জবাবে নজরুল বলেছিলেন–

"কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও-দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তা হ'লে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে ওদের বেগ পেতে হবে না। কেন না, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।"

এতেই বোঝা যায় নজরুল একটি অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলেন। ফররুখ ইকবালের মত ভেবেছিলেন এটা বাস্তবতঃ অসম্ভব। অতএব সময়ের ও বাস্তবতার দাবী মনে করে ফররুখ পাকিস্তান আন্দোলনকে স্বাগতঃ জানান উপমহাদেশের সকল মুসলিমদের মত। জাগ্রত সেই অস্তিত্ব রক্ষার মুসলিম স্বপ্ন

www.pathagar.com

ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়ে উঠেছিল ফররুখ-কাব্যে। সে জন্যে ফররুখকে মুসলিম রেনেসাঁসের কবি হিসেবে চিহ্নিত করাটা অযৌক্তিক হবে না।

কবি হিসাবে এটা ফররুখের দুর্বলতা মনে করা উচিত হবে না। তাহলে টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, দান্তে, মিল্টন, এলিয়ট, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতায় আক্রান্ত। উল্লিখিত কবি সাহিত্যিক যে চিন্তাদর্শের সত্যে পৌঁছেছিলেন সেই একই সত্যে পৌঁছেছিলেন ইকবাল ফররুখ। নিজের চিন্তাধৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার কারণে কেউ নিন্দার লক্ষ্য হতে পারেন না। তাহলে যেসব মহান লেখকদের নাম উচ্চারিত হল তাদের সবাই ক্ষুদ্রত্বের শিকলে বন্দী। নিশ্চয় এ কথায় কেউ ভিন্নমত পোষণ করবেন না।

লেখার প্রথমেই আমি বলেছিলাম যে কাব্যসৃষ্টি বা সাহিত্য উৎস প্রেম। এই প্রেম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে, দেশ বা জাতীয়কেন্দ্রিক হতে পারে। ফররুখের প্রেম বিশেষ করে জাতিকেন্দ্রিক । 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় ফররুখ যখন বলেন, 'কত না আধাঁর পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।' তখন তার ভিতর থেকে শুধু একজন মানুষের নয় একটি জাতির হৃদয়ের কান্না বিচ্ছুরিত হতে থাকে! 'তবে তুমি জাগো / কখন সকালে ঝরেছে হাস্নাহেনা! / এখনও তোমার ঘুম ভাঙলো না/ তবু তুমি জাগলে না!' কবির এই আকুল অনুরোধ সমগ্র বাঙালী মুসলিম জাতির প্রতি এক ব্যথাহত জননীর দরদী ডাকের মত মনে হয়। একইভাবে আমরা যখন 'পাঞ্জেরী' কবিতায় ফররুখকে বলতে শুনি–

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে ?
সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে ?
তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে :
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

কিংবা–

শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে
মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা শশী;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী!

www.pathagar.com

তখন সে কান্নার মধ্য দিয়ে কারবালার কান্না, বাগদাদ পতনের, স্পেন পতনের, পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের, সিপাহী বিপ্লবের বিফলতার কান্না ঝরে পড়তে দেখি।

মনে হয় সমস্ত মুসলিম উম্মার হতাশা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর এই হাহাকারে। সে জন্যে তিনি হয়ে উঠেছেন মুসলিম উম্মাহর আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, হতাশা ও বেদনার অসামান্য রূপকার! এ ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যতাকে কে অস্বীকার করবে?

ফররুখ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এই আন্দোলন একক ফররুখের নয়– উপমহাদেশের বঞ্চিত মুসলিমদের আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের স্বাধীনতা আন্দোলন। এটা ছিল একই সঙ্গে বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি এবং হিন্দু কর্তৃক মুসলিমদের ভিন্ন জাতি হিসাবে দেখে তাদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং শ্রদ্ধাহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কংগ্রেসের সদস্য হ'য়েও যে জন্যে বহু মুসলমান হতাশাগ্রস্ত হ'য়ে হিন্দুদের ঘৃণা, অবহেলা, বিদ্বেষ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তাতে গণতন্ত্রমনা আবুল কাসেম ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখেরও সে আন্দোলনে শরীক না হ'য়ে উপায় ছিল না। অর্থনৈতিক জীবনে উপমহাদেশের মুসলিমদের মুক্তি কখনই ঘটত না যদি না তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে বিদ্রোহ না করতেন। ফররুখ আহমদ এই আন্দোলনকে তীব্র ও জোরালো করতে 'সিন্দাবাদে'র মত সাহসী নেতার আবির্ভাব কামনা করেছিলেন। সাহসে, শক্তিতে, নির্ভীকতায় যে হ'তে পারে 'সিন্দাবাদ' এর মত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মত অসীম সাহসী বীর। "সাত সাগরের মাঝি"র পংক্তিতে পংক্তিতে এই জাগরণ মন্ত্রের মৃতসঞ্জীবনী নিহিত আছে। এরই বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অন্যান্য কাব্যে।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সময়ের দাবীর তাগিদে ফররুখ যে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন পাকিস্তান পাওয়ার পর তার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানবতার প্রতিষ্ঠা, জালিমের বিরুদ্ধে জুলুমের উৎখাত। সে জন্যে তিনি পাকিস্তানের স্বার্থবন্দী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এরই ফসল তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম', 'হাতেম তায়ী', 'কাফেলা' ও 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য'; হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী ছদ্মনামে লেখা 'নয়া জিন্দেগী' ও ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ। সেখানে সুস্পষ্ট হ'য়ে গেছে তাঁর মূল লক্ষ্য পাকিস্তান নয়– মানবতা তথা ইসলাম। ইসলাম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আধারের প্রয়োজন হিসাবে তিনি পাকিস্তান চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত 'সিন্দাবাদ' ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের তিনি চাননি– যাদের বিভ্রান্তি, স্বার্থপরতা, অপকর্ম ও অযোগ্যতার কারণে সেই স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে মিসমার হয়ে গেছে।

রচনা সময়
২৮-০৪-২০০২

www.pathagar.com

ফররুখ ও ইক্‌বাল

কাব্য-চর্চার একটা বিশেষ স্তরে এসে ফররুখ ইক্‌বালের ভক্ত হয়ে পড়েন। সরাসরি উর্দু ও ফারসীর মাধ্যমে ফররুখ ইকবাল পড়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। ধরে নেয়া যায় ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে ফররুখ ইক্‌বালকে পড়েছিলেন। 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' সংকলনের ভূমিকায় সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, 'অনুবাদের জন্য ফররুখ আহ্‌মদের অবলম্বন ছিলো নিকলসনকৃত 'আসরারে খুদী'র ইংরেজী তর্জমা।' বলাই বাহুল্য অনুবাদে মূল কাব্যভাষার, কাব্যছন্দের, কাব্য-উপমার অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও কাব্যচিন্তা, কাব্যভাবনার ও কাব্যবিষয়ের মর্মার্থটা থেকে যায়। এ-জন্যে আমরা দেখেছি দু'একজন ব্যতিক্রম উর্দু-ফার্সী লেখক, কবি– যেমন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, নজরুল ইসলাম, মনিরউদ্দীন ইউসুফ ও সৈয়দ আবদুল মান্নান ছাড়া সবাই খৈয়াম, রুমী ও হাফিজকে জেনেছেন ইংরেজীর মাধ্যমে। ইক্‌বালকেও অনেকের সেভাবেই জানা। বাংলায় যাঁরা ইকবালকে অনুবাদ করেছেন তাঁরাও ইংরেজী অনুবাদ পড়েই করেছেন। তবে ফররুখ যে ইকবালকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন ও উপলব্ধি করেছেন সেটা তাঁর ইক্‌বাল অনুবাদ থেকে বোঝা যায়। ফররুখ আহমদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি' ইক্‌বালকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে ফররুখ লিখেছেন–

> বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার,
> দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইক্‌বালের
> অমর স্মৃতির উদ্দেশে–
>
> তোমার নয়নে দীপ্তি সিকান্দার শাহার মতন।
> নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা
> (জিন্দেগীর নীল পাত্রে উচ্ছ্বসিত ঘন রক্ত নেশা
> অনির্বাণ শিরাজীর) পাড়ি দেয় মরু, মাঠ, বন,
> অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী! তবু অনুক্ষণ
> ধ্যান কর কোন্ পথ, কোন্ রাত্রি অজানা তোমার;
> এক নেশা না মিটিতে সাড়া আসে দ্বিতীয় নেশার;
> এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র স্বনন ।
> যেথা ক্ষীয়মাণ মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে
> জীবনের ক্ষীণসত্তা মূর্ছাতুর, অসাড়, নিশ্চল;

www.pathagar.com

মুহূর্তের পদধ্বনি জাগে না সে সুষুপ্ত পাথরে,
জ্বলে না রাত্রির তীর, নাহি জাগে স্বপ্ন সমুজ্জ্বল
প্রাণবন্ত মানবতা; সে নির্জীত তমিস্রা সাগরে
দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছ হে স্বর্ণ-ঈগল ॥
১৫.১১.৪৪

তাঁর এই উৎসর্গ-পত্রে তিনি ইক্‌বালকে শুধু ইসলামের রূপকার বলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেননি, তাঁকে 'স্বর্ণ-ঈগল' এবং 'তামিস্রা সাগরে' 'দুর্জয় ঝড়' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এতে ইসলামের পুনর্জাগরণে ইক্‌বালের অসাধারণ ভূমিকাকেই স্মরণ করা হয়েছে।

ইক্‌বালকে ফররুখ কিভাবে দেখেছেন সেটা তাঁর গদ্যভাষ্য থেকে জানা যায়। কাব্য-চর্চায় নিবেদিত ফররুখ খুব বেশী গদ্য লেখেননি– রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথের মত। তবে যে সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি তার মধ্যে 'ইক্‌বাল প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি অন্যতম। ফররুখ রচনাবলী (১ম খণ্ডের) সম্পাদকও লিখেছেন, 'ফররুখ আহ্‌মদ অজস্র কবিতা রচনা করলেও, গদ্য– বিশেষত চিন্তামূলক প্রবন্ধ খুব বেশী লেখেননি।.. দার্শনিক কবি আল্লামা ইক্‌বাল ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন; চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও অভিমতের পরিচয় আছে দু'একটি গদ্য রচনায়।' এই প্রবন্ধটিতে ইক্‌বাল পর্যালোচনায় ফররুখ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল–

> 'আসরার-ই-খুদী'র প্রকাশকাল স্মরণীয়; কারণ বর্ষচক্রের গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে প্রতিভার আবির্ভাব সংযুক্ত না হলেও ইক্‌বালের আত্মপ্রকাশ সময়ের দিক দিয়েও বিস্ময়কর। সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একজন শক্তিশালী নকীবের। কারণ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণিচক্রে নিষ্ফল সংগ্রাম করে দুনিয়ার মুসলমান অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। পলাশী প্রান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ভারতীয় মুসলিমের স্বাধীনতার পথে যে বাধা এনেছিল, ওহাবী আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহেও সেই জগদ্দল শিলা স্থানচ্যুত হয়নি। কয়েকজন কৌশলী নেতা বৃটিশের মনোরঞ্জন করে জাতির অস্তিত্ব কোন মতে বাঁচিয়ে রেখেছিলো; কিন্তু তাতে গোলামীর দৈন্যই ফুটে উঠেছিল মারাত্মকভাবে। আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, মিসর ও তুরস্ক তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রেতনৃত্যে মুখরিত।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মুসলিম প্রধান দেশগুলিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়নি। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি যে প্রাণবন্যার সঞ্চার করেছিলেন, উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর দেহাবসানের পর ইক্‌বাল এলেন তাঁরই উত্তরাধিকারী হয়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনে সমান অভিজ্ঞ আল্লামা ইক্‌বাল প্রচার করলেন মূল ইসলামের প্রাণবাণী।... ইক্‌বাল বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে এবং এই পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত আছে।... আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মতবাদ ইক্‌বাল গ্রহণ করেছিলেন মূল কোরান থেকে।... আত্মবিকাশের জন্য সংগ্রাম ইক্‌বাল সমর্থন করেছেন সব সময়, কারণ তাঁর আদর্শ পুরুষ কখনো প্রগতিবিরোধী বা প্রতিক্রিয়াশীল নন। নিখিল মানব সমাজের জন্য যে পুরুষ ও প্রকৃত মুসলিমের অভ্যুদয়, ইক্‌বালের মানস চক্ষে আমরা দেখেছি সেই পুরুষরূপ। সেই পুরুষের আদর্শেই ইক্‌বাল গড়তে চেয়েছেন বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে। ধর্ম বলতে ইক্‌বাল বুঝেছেন মূল ইসলামকে।

'আল্লার গুণরাজিতে সমৃদ্ধ হও' এই হাদিসের উপর ইক্‌বালের সম্পূর্ণ সত্তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করেছে বলা যেতে পারে। কারণ উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইক্‌বাল বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্ষুদ্রতম সত্তার পক্ষেও কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতা লাভ করা আদৌ অসম্ভব নয়। পরিপূর্ণতার পথে ইক্‌বাল সর্বদা প্রবহমান জীবনের কল্পনা করেছেন।... রাসূলুল্লাহকে প্রকৃত পথপ্রদর্শক এবং সাহাবায়ে কেরাম ও ফকীহদিগকে রাসূলুল্লাহ্‌র বাণী ও জীবনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইক্‌বাল গ্রহণ করেছেন। পীর হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সাধক ও মহাকবি জালালউদ্দীন রুমীকে।...

আত্মসংরক্ষণ অথবা আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য মূল ইসলামের প্রয়োজনীয়তা তিনি ঘোষণা করেছেন। আজীবন তাঁর কাব্যের বিশাল অংশ ইসলাম ও আত্মা সম্পর্কে মুখরিত; যে আত্মা ইসলামের বিধান মেনে ইশ্‌ক বা প্রেমে সংরক্ষিত হয়– সেই প্রেমিক মুসলমানের মধ্যে ইক্‌বাল দেখেছেন ইনসান্‌-ই-কামেল বা পূর্ণ মানবের প্রতিশ্রুতি। ...

www.pathagar.com

> নির্বাণ অথবা আত্মবিলোপের থিওরিকে ইক্‌বাল বরাবর উপেক্ষা করেছেন এবং সমানভাবে ঘৃণা করেছেন ভণ্ডামীকে।...
>
> কীটসীয় এস্কেপিজম তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, প্লেটোর দর্শন এবং ভারতীয় বৈরাগ্যের সুরকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন।

এই লেখার মধ্য দিয়ে ফররুখের ইক্‌বাল পাঠের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইক্‌বালের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এটা নয়। আর বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে সে ব্যাখ্যার চেষ্টাও তিনি করেননি– যেটা আমরা গোলাম মোস্তফা, মনিরুদ্দীন ইফসুফ, সৈয়দ আবদুল মান্নান ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের লেখায় পাই।

আসলে ফররুখ ছিলেন আনখকেশাগ্র কবি। তাঁর কাব্যে কবিত্বই প্রাধান্য পেয়েছে যদিও সেখানে আছে মানুষের প্রতি, মুসলিম সমাজের প্রতি, মুসলিম উম্মার প্রতি, ইসলামের প্রতি, গভীর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের পরিচয়। বিশ্বের মুসলিমদের রাজ্য হারানো, শিক্ষা, জ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে বেদনা ইক্‌বালকে ব্যথিত ও মর্মাহত করেছিল সেই বেদনার আঘাত ফররুখকেও সমভাবে বিদীর্ণ করায় ইক্‌বালের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা ও একাত্মতা ঘটেছিল। তিনিও ইক্‌বালের মত মুসলিম সমাজে জাগরণ এনে তার অধঃপতন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সে-জন্যে নিজের মৌলিক রচনার সঙ্গে ইক্‌বাল অনুবাদকে জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কাব্যের মাধ্যমে এটা পাঠক মনে সঞ্চারিত করা সহজ এবং উপযোগী। গদ্যের যুক্তি ও বৈদগ্ধ্য তত সহজে পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে না যতটা পারে কবিতার আবেগ ও ছন্দ তরঙ্গ। এ-জন্যেই ফররুখ ইক্‌বালকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রচার সমীচীন বলে মনে করেছিলেন। তিনি ইক্‌বালের কোন একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করেন নি। কিন্তু কোন কোন সম্পূর্ণ কবিতা ও কাব্যাংশ অনুবাদ করেছেন। 'আসরার-ই-খুদী'র অংশবিশেষ যেমন তেমনি 'শিকওয়া' ও 'জবাব-ই-শিকওয়া'র অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু যে কবিতা সমূহেরই তিনি অনুবাদ করুন সেগুলো যেন মৌলিক কবিতা হয়ে উঠেছে। ফররুখের অনুবাদ থেকে ইক্‌বালের চিন্তার মাহাত্ম্য ও গভীরতা, তাঁর ধর্মপ্রিয়তা এবং মানবিক আদর্শপ্রিয়তাকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। ইক্‌বালের বিশুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও উভয় কবির কাব্য প্রকাশভঙ্গি এক রকম নয়। ইক্‌বাল যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তা বা বিরুদ্ধ চিন্তার দ্বারা ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেন ফররুখের কবিতায় সেটা দেখা যায় না। আরোহী যুক্তির মাধ্যমে কাব্যে ইক্‌বাল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'শিকওয়া' ও 'জবাব-ই শিকওয়া' এবং 'আসরার-ই খুদী' ও 'রামুজে বেখুদী' বিরুদ্ধ চিন্তার ফল। মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট ও প্যারাডাইস রিগেইন্ডের মত কতকটা। ফররুখ এই ভঙ্গিটাকে তাঁর কাব্য আঙ্গিকে আহরণ করেননি। অভিযোগ করে তাঁর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি ফররুখ। চিন্তা পরম্পরায় ক্রমঅগ্রসরমানতার কোন স্বাক্ষর নেই তাঁর কবিতায়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর কাছে সকল জিজ্ঞাসার উর্ধ্বে। ইক্‌বালের মতই তিনি সমাজ সচেতন এবং রাজনৈতিক সচেতন। কিন্তু বিরোধী চিন্তার সিঁড়ি অতিক্রম করে সত্যের মিনারে ওঠার যে দৃষ্টান্ত ইক্‌বালে আছে ফররুখে তা নেই। এখানে ইক্‌বালের ইসলাম-সত্যে পৌছনোর বিষয়টিকে মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার উদ্বৃতি দেওয়া যায়–

> 'আসরার-ই খুদী'র সমালোচনা করিতে গিয়া মিঃ ফরেস্টার লিখিয়াছেন 'ইক্‌বাল চিরদিন একই মতে দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারেন নাই।' এই অভিযোগের সমর্থনে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, ইক্‌বাল এক সময় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং ভাবাবেগের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া এককালে তিনি 'তসবীরে দরদ', 'তারানায় হিন্দী', 'নয়া শেওয়ানা' এবং 'হিন্দুস্তানী বাঁচ্চুকী কাওমী গীত'-এর ন্যায় ঘোর জাতীয়তাবাদী এবং স্বাদেশিকতার উদ্দাম উন্মাদনা ও ভাবালুতাপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরই তাঁহার চিন্তাধারা ও মতাদর্শে বিপ্লব সূচিত হয় এবং তিনি সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার আকর্ষণ পরিহার করিয়া 'বিলাদে ইসলামিয়া', 'তারানায়ে মিল্লী', 'খিতাব-ব জওয়াননে ইসলাম', 'শিকওয়া' ও 'জওয়াবে শিকওয়া' এবং এই ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় ভাবধারা পুষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহার পর পুঁজি ও শ্রমের (Capitalism and labour) পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অতঃপর ফ্যাসিবাদে প্রভাবান্বিত হইয়া Fascism-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। মোট কথা, অভিযোগকারীদের কথা অনুযায়ী ইক্‌বাল এইভাবে বারংবার পরিবর্তিত হইয়া নতুন নতুন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই দিক দিয়া ইক্‌বালের মতবাদে কিছুটা বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়; যথা ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই স্তুতি করা,

www.pathagar.com

দরবেশী ও বাস্তব ক্ষমতা লাভ এবং এতদুভয়েরই বিজয় গাঁথা রচনা ও বৈশিষ্ট্য প্রচার করা।

কিন্তু মুহাম্মদ আবদুর রহীমের মতে এই বিরুদ্ধ চিন্তার শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইক্‌বাল ইউরোপের সংস্পর্শে এসে তার অন্তর্গত অপসংস্কৃতির রূপ দেখে বীতশ্রদ্ধ হন এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ইসলামের সত্য রূপে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রথম জীবনে ফররুখের চিন্তাধারায় পশ্চিমা সভ্যতার কিছুটা আঁচ লাগলেও তিনি খুব দ্রুতগতিতে তাঁর চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন । এবং তাঁর অবশিষ্ট জীবন সেই পুণ্যাদর্শের সঙ্গ থেকে কখনো মুক্ত হয় নি । এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক আলোচনা আমরা করতে পারব। শুধু এ-মুহূর্তে এটুকুই বলা যায় যে, পরিণত ইক্‌বালের মানস-চিন্তার উত্তরসূরী হতে পেরেছিলেন ফররুখ। দ্বন্দ্বময় ইক্‌বাল নন নির্দ্বন্দ্ব ইক্‌বালই ফররুখের অভীষ্ট আদর্শ ।

রচনা সময়
৯-৫-০২

www.pathagar.com

ফররুখ ও মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ফররুখকে নিয়ে কোন প্রবন্ধ বা গবেষণাধর্মী রচনা আমার চোখে পড়েনি। শোনা কথা, ফররুখ আহ্‌মদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার অনুরাগী ছিলেন। মধুসূদনের কবিমন, কাব্যপ্রীতি ফররুখ আহ্‌মদকে মধুসূদনের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। অন্য আর একটি বিষয়ও হয়ত ফররুখ আহ্‌মদকে মধুসূদনমুখী করে তুলেছিল। সেটা মধুসূদনের ভাষার ও ছন্দের ক্লাসিক রীতি। পয়ারের শিকল ভেঙে নতুন যে ভাষা-ছন্দ সৃষ্টি করলেন মধুসূদন এবং বাংলা কাব্যের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর অসামান্যতা, অসাধারণত্ব ও মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মহাকাব্য ও চতুর্দশপদী কবিতা সৃষ্টিতে তো বটেই নাটক রচনাতেও মধুসূদন এক নতুন যুগ-স্রষ্টা। ফররুখ এই মৌলিক নবছন্দের আবিষ্কারক এবং ভাষার ধ্রুপদী রূপস্রষ্টার প্রতি, বাংলা কাব্য ভাষার মুক্তিদাতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই: ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতি-চিন্তা, ঐতিহ্য ও শিল্প-চিন্তার ক্ষেত্রে ফররুখ মধুসূদন গোত্রের কবি নন।

সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি চিন্তায় প্রথম যে পার্থক্য চোখে পড়ে তা হ'ল খ্রীস্টান হ'য়েও মধুসূদন নিজের হিন্দু-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিন্ন ভাবতে পারেন নি। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখা এক চিঠিতে মধুসূদন লিখছেন–

> I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors, it is full of poetry.
>
> (প্রিয় বন্ধু, একজন অপরূপ ক্রীশ্চান যুবক হিসাবে হিন্দুবাদের প্রতি আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই ; কিন্তু আমি আমার পূর্বপুরুষদের অপূর্ব পুরাণকে ভালোবাসি। এটি কাব্যসৌন্দর্যে ভরপুর।)

বাঙালী মুসলমান ফররুখ এই কথাটি বলতে পারতেন না যে তাঁর পূর্বপুরুষদের (বাঙালী হিন্দুদের পূর্ব-পুরুষ ও বাঙালী মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষ ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ এক নয়। ঐতিহাসিক গবেষকরা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।) মহান পুরাণ কাব্য-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মধুসূদনের পক্ষে এ-

www.pathagar.com

কথা বলা সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে তিনি ধর্ম ও কাব্যকে এক করে দেখেন নি। মধুসূদনের কাছে খ্রীস্টান মধুসূদনের সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ফররুখের ক্ষেত্রে সেটি তা নয়। তৌহিদবাদী ফররুখ পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদের সঙ্গে– যদি তা আংশিকভাবে সত্য হয়েও থাকে– ধর্মীয় কারণে একাত্মবোধ করেননি।

দ্বিতীয়তঃ মধুসূদন যেমন কাব্য ও ধর্মকে পৃথক করে দেখতেন; সেভাবে ফররুখ কাব্যচিন্তাকে সমাজ ও ধর্মচিন্তা থেকে পৃথক করে দেখতে পারেননি। তিনি ইসলামচর্চা ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সমাজে কল্যাণ আনতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য কাব্যের ঔৎকর্ষ বা কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি ছিল না, ছিল মানুষের কল্যাণ। যদিও কবিতার শিল্প-সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর সাধনা সামান্য ছিল না।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট বন্ধু রাজনারায়ণকে মধুসূদন লিখেছিলেন–

When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias.

(কবিতা পড়ার সময় অতি ধর্মপ্রীতিকে পাশে সরিয়ে রেখো।)

ফররুখের বেলায় এটা অসম্ভব। তাঁর কাব্যচিন্তায় ধর্ম ও কবিতা অভিন্ন আত্মার মত।

মধুসূদন যে শুধু কাব্য ও কাব্যশিল্প নিয়ে চিন্তা করেছেন এটাও অবশ্য সার্বিকভাবে সত্য নয়। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা?' বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' পড়লে বোঝা যায় সমাজ-সমস্যা থেকে তাঁর সৃষ্টি দূরে অবস্থান নেয় নি। সেখানে বাঙালী সমাজের সংস্কারকরণের ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মহাকাব্যে মধুসূদন ব্যক্তি চরিত্র রূপায়ণের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও মানব চিন্তামুক্তির আদর্শকে রূপায়িত করেছেন। বাল্মীকীর রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত তাঁর কাব্যসৃষ্টির উৎস হ'লেও তিনি দেবত্বের পায়ে মাথানত না করার শিক্ষা দিয়েছেন– দেবত্ব নয়, মনুষ্যত্বের প্রতি মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এ বিষয়টি মানবতাবাদী ফররুখকে উদ্বোধিত করতে প্রেরণা জোগাতে পারে; কিন্তু খ্রীস্টান মধুসূদন যে সাংস্কৃতিক চেতনায় খ্রীস্টান ছিলেন না এ-কথা তাঁর কাব্যসমূহের পংক্তিতে পংক্তিতে দৃষ্ট।

একটা খুব সহজ পার্থক্য আমরা মধুসূদন ও ফররুখে দেখি। মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে, যেখানে ১০২টি চতুর্দশপদী আছে, দেখি এইসব শীর্ষনামের

www.pathagar.com

কবিতা : সীতাদেবী, সরস্বতী, সুভদ্রাহরণ, নদীতীরে, প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, শ্রীপঞ্চমী ইত্যাদি। অন্যদিকে ফররুখের 'মুহূর্তের কবিতা'র ১০০ চতুর্দশপদীতে আছেঃ ফেরদৌসী, রুমী, জামী, সাদী, হাফিজ, দীউয়ানা মদিনা, লালবাগ কেল্লা, শাহ গরীবুল্লাহ পুঁথিপড়া, মুহার্রাম মাস, শহীদে কারবালা, তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, শাহনামা, আলিফ লায়লা, চাহার দরবেশ, হাতেম তা'য়ী, শবে কদর উপলক্ষে, শবে বরাত প্রসঙ্গে ইত্যাদি কবিতা। বোঝা যায় অত্যন্ত সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে পৌত্তলিকগন্ধী সংস্কৃতি থেকে নিজেকে ভিন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন ফররুখ।

এ প্রসঙ্গে দান্তে ও মিল্টনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা ডিভাইন কমেডি ও প্যারাডাইস লস্টে খ্রীস্ট মহিমাকে প্রচার করেছেন। কিন্তু সে জন্যে তাঁদের কাব্য বিশ্বসাহিত্য থেকে বাদ পড়েনি। আমরা টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে খ্রীস্টধর্মের মহিমাকীর্তন করতে দেখেছি। অবশ্য খ্রীস্টান মধুসূদনকে খ্রীস্টধর্মের মহিমা কীর্তন করে কোন কবিতা লিখতে দেখিনি। তাঁর চতুর্দশপদীর মধ্যে দান্তে, হুগো ও টেনিসনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যীশু খ্রীস্টের উপর কোন কবিতা লিখতে দেখা যায় না। নজরুল ইসলামে আমরা হিন্দু শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার দেখলেও সাথে সাথে মুসলিম শাস্ত্র, মুসলিম ইতিহাস ও ইসলামী চিন্তাদর্শ, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচুর ব্যবহার দেখতে পাই। ইসলামের মহিমাকীর্তনে একমাত্র ফররুখ আহ্মদ ছাড়া তিনি ছিলেন তুলনাহীন। মধুসূদনের সমগ্র কাব্যে তাই হয়ত অনেকে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারকে আশা করতে পারতেন কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই সর্বভুক পাঠক খ্রীস্ট মহিমা প্রচারে কোন উদাহরণ রেখেছেন বলে জানা যায় না। হিন্দু পূর্বপুরুষদের গ্রান্ড মাইথলিজই ছিল তাঁর কাব্যনির্মাণের প্রায় একচ্ছত্র উপাদান। উল্লেখ্য, একদা তিনি কারবালার উপর মহাকাব্য রচনার চিন্তা করেছিলেন। বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে তিনি লিখছেন–

> We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what; if a great poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificant topic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf.

www.pathagar.com

(আমরা এই মাত্র মুহররমের কোলাহল ছাড়িয়ে উঠলাম। দেখ মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় কবি জন্মালে হোসেন ও তাঁর ভাই-এর মৃত্যুর উপর অতিসুন্দর একটি মহাকাব্য লিখতে পারতেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে গোটা জাতির অনুভূতিকে তিনি রূপ দিতে পারতেন।)

মীর মোশাররফ হোসেন গদ্য 'বিষাদ-সিন্ধু'তে মধুসূদনের এই ইচ্ছাকে রূপায়িত করেছিলেন। হয়ত কায়কোবাদ চেষ্টা করলে এই স্বপ্নের আংশিক পূরণ করতে পারতেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী করেছিলেন; কিন্তু দীপ্ত প্রতিভার অভাব তাঁর সে চেষ্টাকে সাফল্য দেয়নি। সত্যিকার যাঁরা বড় কবি সেই নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহ্‌মদ এই পথে পা বাড়াননি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী 'মরু-ভাস্কর' লিখতে গিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। শেষ করার সুযোগ পাননি। নজরুল ইসলামের কবিতায়, গীতি কবিতায় মহররম ও হাসান হোসেন এসেছেন প্রসঙ্গ-সূত্রে! তিনি ঐ বিষয়ের উপর অনেকগুলো করুণ সুরের মহাসঙ্গীতও লিখেছেন; কিন্তু কোন মহাকাব্য লেখেননি। অসুস্থ হ'য়ে জীবন্মৃত না হ'লে তিনি কি করতেন তা বলা কঠিন। ফররুখ আহ্‌মদ 'হাতেম তা'য়ী' লিখেছিলেন কিন্তু 'কারবালা'র উপর মহাকাব্য লেখার সুযোগ পাননি। তিনিও নজরুলের মত দু'একটি কবিতায় মহররমকে তাঁর কাব্য-বিষয় করেছেন; কিন্তু কোন পূর্ণ মহাকাব্য লেখেননি। হয়ত 'বিষাদ-সিন্ধু' সেই স্বপ্নের অনেকখানি পূরণ করেছিল বলে মোশাররফ হোসেনের উত্তরপুরুষদের কেউ এই তপস্যার পথে পা দেননি।

কিন্তু বলছিলাম ক্রুশবিদ্ধ যীশুর উপর কোন কাব্য রচনার উৎসাহ পাননি মধুসূদন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। এখানে মধুসূদন চিরদিন সংস্কৃতি জগতে খ্রীস্টান হয়েও মহাহিন্দু থেকে গেছেন। ফররুখের কোন প্রয়োজন হয়নি ধর্মান্তরিত হওয়ার। বরং আপন ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন চির-বিশ্বস্ত। মধুসূদনের সঙ্গে ফররুখের এটা বিরাট পার্থক্য। মধুসূদনের কাব্যচিন্তা ও কবিত্ব শক্তির উপর শ্রদ্ধাশীল হয়েও তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ না করার মধ্যে ফররুখের ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা একশ ভাগ নিশ্‌ছিদ্র হয়ে উঠেছে।

আর একটি কথা, মাত্রাবৃত্তে ফররুখ আহ্‌মদ বহু কবিতা লিখলেও, (তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র অধিকাংশ কবিতা মাত্রাবৃত্তে রচিত) তাঁর চতুর্দশপদী, 'নৌফেল ও হাতেম' এবং 'হাতেম তা'য়ী' অক্ষরবৃত্তে রচিত। এক্ষেত্রে তিনি মধুসূদন নয় রবীন্দ্রনাথের অনুসারী। কারণ মধুসূদনের অক্ষরবৃত্ত

www.pathagar.com

চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের অক্ষরবৃত্ত, চৌদ্দ ও আঠারো অক্ষরের পংক্তি। এই আঠারো অক্ষরের পংক্তির রবীন্দ্র অক্ষরবৃত্তই ফররুখ আহ্‌মদের চতুর্দশপদী, কাব্যনাট্য ও মহাকাব্য রচনার সহযোগিতা দানকারী কাব্যভাষা। তবু মধুসূদনের দৃঢ়তাধর্মী কাব্যমানস যে ফররুখের কাব্যমানসের প্রস্তুতিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রচনা সময়
১১-৫-০২

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদ ও নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদকে নিয়ে তুলনামূলক সাহিত্যালোচনা সম্ভব কি না সেটা জিজ্ঞাসার বিষয়। উভয় কবির কুললক্ষণ ভিন্ন। তবু ফররুখকে পড়তে গিয়ে নজরুল স্মরণে আসেন। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও যে আছে তা অস্বীকার করার মত নয়। নজরুল-কাব্যের উত্তরাধিকার যারা বহন করেছেন তাঁদের প্রধানতমদের অন্যতম ফররুখ আহ্‌মদ। যে কালের কবি ফররুখ আহ্‌মদ, নজরুল ইসলামের চেয়ে বয়সে উনিশ বছরের ছোট হ'লেও (নজরুল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯-এ আর ফররুখ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে) সমাজ স্বরূপ ও রাজনৈতিক চেতনা প্রায় সমকালীন। ১৯৪২-এর ১০ই জুলাই নজরুল অসুস্থ ও পরে নির্বাক হয়ে যান। সেটা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মৃত্যু বছর হিসেবে ধ'রে নেয়া যায়। ফররুখ আহ্‌মদের সাহিত্য বা কাব্য-জীবনের তখন শুরুর সময়। নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছিল পরাধীন বৃটিশ ভারতে, ফররুখ আহ্‌মদেরও তাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন দ্বিতীয় বারের মত তীব্রতা লাভ করতে শুরু করেছে। এমনি সময়ে নজরুলের জন্ম ও বৃদ্ধি লাভ। আর বৃটিশের ভারত ছাড়ার সময় সমাগত কালে ফররুখ আহ্‌মদের জন্ম ও বৃদ্ধি। নজরুলের আবির্ভাব কালে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের পটভূমি আর ফররুখ আহ্‌মদের আবির্ভাব কালে ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামার গর্জন, পাকিস্তান আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষের পটভূমি। বাঙালী মুসলমানের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, রাজ্যহারানোর বেদনা উভয় কবির সমাজ-সংস্কৃতির হতশ্রী অবস্থার দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছিল। এই ঐতিহ্যের পূর্বসূরী হিসাবে নজরুলের ধর্ম-শিল্প-সংস্কৃতি জগতে কোন সূর্যতুল্য অনুকরণযোগ্য প্রতিভা ছিল না। ফররুখ আহ্‌মদের জন্যে অন্ততঃ নজরুল ইসলাম ছিলেন। এ-ব্যাপারে ফররুখ আহ্‌মদ লিখিত নজরুল সাহিত্যের পটভূমিতে ফররুখ আহ্‌মদের এই মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য–

> "ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের সৃষ্টি করেছিল, ১৯০৫ সালের আগে তার ভেতর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি ।
>
> এই সুদীর্ঘ সময় একটানা ক্লান্তি ও হতাশার। অন্ধকার যবনিকা দীর্ণ করে কোন সূর্যের সাক্ষাতই এ-সময় পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

তবু জাতি পুরোপুরিভাবে মরেনি। রাজনীতি আর অর্থনীতি ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হ'য়েও শুধুমাত্র মৌলিক তমদ্দুনের জোরেই এ জাতি কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর না হ'লেও মুমূর্ষ প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্লিষ্ট প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয় । তার নিজস্ব তাহজীব তমদ্দুনের ক্ষীণ রেখা কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার নিজস্ব অস্তিত্ব।

ইতিহাসের এই পটভূমি পিছনে রেখে বিচার করলে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই অচলায়তনে প্রথম সাড়া জাগালো। আর আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে খিলাফত আন্দোলনই সর্বপ্রথম নিয়ে এল দু'কূল প্লাবী বন্যা।

খিলাফত আন্দোলন কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেল সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়।

স্বতন্ত্র তমদ্দুনের যে বৈপ্লবিক দাবীতে পাকিস্তান আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে একদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছিল তার গোড়াপত্তন হয় এ সময় থেকেই ।

বহু শতাব্দী পরে বাঙালী মুসলমান আরবী ফারসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গড়ে তুলেছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ষড়যন্ত্র যে ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিল, কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। এমনকি জনসাধারণের মধ্যেও সাড়া পৌছতে দেরী হল না। (ফররুখ রচনাবলী : ১ম খণ্ড, সম্পাদনা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ)

"নজরুল প্রসঙ্গ" নামে আর একটি ক্ষুদ্র লেখাতেও ফররুখ আহ্‌মদ নজরুলের আবির্ভাবের এই প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন–

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ...

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের কামানের আওয়াজ থেমে গেল কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মানুষ প্রতিক্ষণে আর এক অপমৃত্যুর আশংকায় বিহ্বল হয়ে রইল। মুছে গেল তার শান্তি, মুছে গেল তার স্বপ্ন, নিভে গেল তার সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মহত্তর মানবীয়

www.pathagar.com

পরিকল্পনা। পৃথিবীর বুকে তখন Dead land মরা জমির অনুর্বর অশোয়াস্তি । কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের কথা এই যে, চরম মৃত্যু সংকটের মধ্যে জেগে উঠলো ঘুমন্ত মুসলিম দেশগুলি; তুরস্ক, মিসর, ইরানে সাড়া উঠল নব জাগরণের; হিন্দুস্তানের মুসলমানের মনেও সেই জাগরণের জোয়ার বলিষ্ঠ সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেল। ঠিক এমন সময় মুসলিম বাংলার প্রথম কবি নজরুলের কণ্ঠে শোনা গেল জীবনের পরম স্বীকৃতির বাণী– তিনি ঘোষণা করলেন : চির উন্নত মম শির।

পলাশীর আম্রকাননে মুসলমানের যে সৌভাগ্য-সূর্য পরাজয়ের যবনিকায় ঢাকা পড়েছিল, ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় মুসলমানের বহ্নি-যৌবনে যে তুহিন পাথর নেমেছিল সেই স্থবিরত্বে অধীর গতিবেগ সঞ্চার করলেন কবি নজরুল ইসলাম। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মহাকবি ইকবাল অবশ্য অনেক আগেই সন্ধান দিয়েছিলেন আবেহায়াতের।... স্বীকার করতেই হবে যে পলাশী যুদ্ধের পর নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলমানের জাগরণের প্রথম কবি। নজরুল ইসলামের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসময় প্রাণপ্রবাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বেগবান জলপ্রপাতের মত অকাল বার্ধক্যের যুগসঞ্চিত জরদ্গব শিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যাদুকরের মত– সমস্ত দেশ তাঁকে অভিবাদন জানাল।

(ফররুখ রচনাবলী : ঐ)

ফররুখের এই নজরুল সমীক্ষা থেকে বোঝা যায় নজরুল ইসলাম তাঁর মধ্যে কতটা আবেগের ঝড় তোলেন। নজরুল ইসলামের কাব্য মুসলিম সমাজ এবং ব্যক্তি ফররুখের জীবনে কতটা প্রেরণাদায়ী শক্তি সেটা নজরুল ইসলামের উপর লেখা ফররুখের প্রথম জীবনের একটি কবিতা থেকে উপলব্ধি করা যায়। এতে তিনি নজরুলকে "আমাদের কবি" বলে অভিহিত করেন। তিনি লেখেন–

সন্ধ্যার সূর্যকে যা খুশী বলুক লোকে
দিয়েছে সে আলো সারাদিন।
তুমি বিদ্রোহ চূড়া করেছ যে গুঁড়া গুঁড়া
আঁধারের মাঠ সীমাহীন।
মিথ্যা অসাম্যের যত সব কালো ঘের
দিয়েছে সে জ্বালায়ে আগুনে।
প্রভাতের বহু পাখী উঠিয়াছে সাথে ডাকি

www.pathagar.com

শুধু তার আবাহন শুনে।
সে কথা ভুলেছে যারা আজও ভুলে যাক তারা
বলিতে চাহি না তাহাদের।
শুধু ভালবাসে যারা আজ শুনে নিক তারা
প্রয়োজন আছে সূর্যের।
সন্ধ্যার সূর্য সে জানি আমি এ প্রদোষে
তবু তাতে নাই কিছু ক্ষতি।
সূর্যের রশ্মিকে দেখি মোরা দিকে দিকে
তার গতি থেকে পাই গতি।
অগ্নি-বীণার কাজ শেষ হয় নাই আজ
বিষের বাঁশীও মোরা চাই।
যে গান গেয়েছে কবি সে তো জানি যুগ-রবি
কোন দিন তার শেষ নাই।
ভাঙনের গান শেষে আগুনে উঠিবে হেসে
দোলন চাঁপা ও ঝিঙে ফুল।
কালো মেঘে সাড়া পেয়ে চাতক উঠিবে গেয়ে
চিরদিন গাবে বুলবুল।

পরবর্তীকালে তিনটি সনেট বা চতুর্দশপদী লিখে ফররুখ নজরুলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ২য়টির উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল–

যে জীবন, যৌবনের বন্যাধারা মানে না বন্ধন
পাহাড়ী নদীর মত জিন্দেগীর সে ধারা উচ্ছল
সহস্র বন্ধন ভেঙে দীর্ণ করি এল শিলাতল:
অনুভব করিলাম জীবনের বিপুল স্পন্দন।
সঞ্চিত রাত্রির বহ্নি কিম্বা তিক্ত প্রাণের ক্রন্দন
তীব্র সংঘর্ষের মুখে গেল পিষে প্রান্তর নিশ্চল
(দারিদ্রে) উন্নত শির, সংঘাতে যে হিমাদ্রি অটল
দরিয়া দারাজ তার মনে ছিল স্বপ্ন সংগোপন।
স্থবির স্থানুর বুকে জনপদে সে স্বপ্ন সঞ্চার
সংকীর্ণ আবদ্ধ গণ্ডী ভেঙে দিল মুক্ত উদারতা;
অসুন্দর পৃথিবীতে জানালো সে সুন্দরের কথা
(শিল্পী ফরহাদের মত দিল খুলে শিরীর দুয়ার)
সর্বহারা এ পৃথিবীকে দিয়ে গেল অজস্র সম্ভার।

www.pathagar.com

এ-সব সত্ত্বেও নজরুলের সৃষ্টির প্রতি তাঁর সমালোচক দৃষ্টিরও পরিচয় তাঁর গদ্য রচনায় পাওয়া যায়। তিনি সে জন্যে লিখেছিলেন–

> "নজরুলের শক্তি যেমন বিস্ময়কর তাঁর কাব্যিক স্খলনও তেমনি বিস্ময়কর। অদম্য ভাবাবেগের জন্য তাঁর অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতাই নিখুঁতভাবে জমাট বাঁধতে পারেনি, শব্দ চয়নের দিক দিয়েও তাঁর দুর্বলতা আছে যথেষ্ট। অগভীর জীবন বোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিশক্তির অভাব তাঁর সবচেয়ে বড় ত্রুটি। শুধু এই একটি কারণেই তিনি সর্বকালের কবি হতে পারেননি। নজরুল নিজেও তা বুঝতেন এবং সে কথা স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। কারণ, তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবন বোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়।" (নজরুল প্রসঙ্গ : ফররুখ রচনাবলী : পূর্বোক্ত)

'ফররুখ রচনাবলী'র সম্পাদক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ তাদের রচনা-পরিচয়ে লিখেছেন : 'নজরুল প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি ফররুখ আহ্‌মদের পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া। লেখাটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

যেহেতু এই লেখাটি ফররুখের জীবিতকালে কোথাও প্রকাশিত হয়নি সে জন্যে মনে হয় ফররুখ তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। বলাই বাহুল্য নজরুলের সমগ্র কাব্য ফররুখের এই লেখার সময় প্রকাশিত ছিল না। নজরুলের মুখ্য রচনা তাঁর সঙ্গীত বা গান। যেগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। ফররুখের জীবিত কালে এর অধিকাংশই ছিল অপ্রকাশিত। ১৯৬৪-এর ২৫শে মে 'নজরুল রচনাবলী'র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭-এ 'নজরুল রচনাবলী'র ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪-এর মে'তে 'নজরুল রচনাবলী'র ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ফররুখ আহ্‌মদের মৃত্যু হয় ১৯৭৪-এর অক্টোবরে। উদ্ধৃত লেখাটি মনে হয় চল্লিশের দশকের লেখা। সুতরাং সম্পূর্ণ নজরুল ইসলামকে দেখা বা জানা ফররুখের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য যেহেতু দু'জন কবির জীবনাদর্শ ও মতাদর্শ ভিন্ন প্রকৃতির সে জন্যে পূর্ব-সূরীর প্রতি উত্তর-সূরীর যৎকিঞ্চিৎ অভিযোগ অকল্পনীয় নয়।

প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহ্‌মদের চিন্তাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ-ব্যাপারে ইবরাহীম খাঁর পত্র এবং সে পত্রের জবাবে নজরুল ইসলামের প্রতিক্রিয়া এই দুই কবির চারিত্রিক স্বরূপের ভিন্নতা সুস্পষ্ট করবে।

www.pathagar.com

নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছিল 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'শাত-ইল-আরব' কবিতার মাধ্যমে। এর পরে ক্রমান্বয়ে তাঁর যে সব কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে 'খেয়াপারের তরণী', 'মহররম', 'কোরবানী', 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা', 'ফতেহা-ই-দোয়াজ দহম' তাতে মুসলিম সমাজ সত্যই আনন্দিত ও উল্লসিত হয়। 'আরবী ফারসী' শব্দ মিশ্রিত মুসলমানী বাংলায় লেখা এই কবিতায় মুসলিম সমাজ তার সাংস্কৃতিক জীবনের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পেয়েছিল যে তারা ভেবেছিল নজরুল মুসলিম বাংলার নতুন জালালউদ্দীন রুমী হবেন। কিন্তু নজরুল তাঁর কবিতার এই বৃত্তে খুব বেশি দিন আবদ্ধ ছিলেন না। দেখা গেল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সন্ত্রাসী মুক্তিযোদ্ধাদের ও সমাজতন্ত্রবাদীদের স্বপ্ন ও আশা তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হচ্ছে এবং আরবী ফারসী শব্দের সঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে হিন্দু পুরাণের অজস্র শব্দ। এতে ব্যথিত মুসলিম সমাজ নজরুল বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে। তারা নজরুলকে ঐ পথ থেকে প্রত্যাবৃত হতে বলেন। নজরুলকে লেখা ইবরাহীম খাঁর চিঠিতে এই আকুতি ধরা পড়ে। ইবরাহীম খাঁ লিখেছিলেন–

ভাই নজরুল ইসলাম,

> তোমায় কখনও দেখিনি। অনেকবার দেখা করবার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগ ঘটে উঠে নাই। দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি, আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি, 'প্রভু এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ একে রক্ষা করো– সমাজকে দিয়ে ওর কদর করে নিও।' তোমায় এত আপন ভাবি, এত কদর করি বলেই আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ, তোমার প্রীতি আকাংখী, তোমার ভক্ত ভাই-এর এ আবদার তুমি রক্ষা করবে তাও জানি।
>
> আজ তোমায় কয়টি কথা বলব, গুরু রূপে নয়, ভাই রূপে, ভক্ত রূপে।...
>
> আমি আগেই বলেছি বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ কাঙ্গাল; শুধু ধনে নয় মনেও। তাই বাঙ্গলার অ-মুসলমানরা তোমার যে কদর করেছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ-কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু মহলে

www.pathagar.com

রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি? শুধু আস্ফালনে ফল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র; তাই সেই ভাবে তাকে কখনও স্নেহের হাত বুলিয়ে, কখনও জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে। আর তাদের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি; তাই এবার সমাজকে ছেড়ে তোমার দিকে ফিরছি। সমাজ মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী-সুধা; কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন সু-সন্তান আপন তপোবনে গঙ্গা আনয়ন করে এ অগণ্য সাগর-গোষ্ঠীকে পুনর্জীবন দান করবে, কাঙাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কে জানি না; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে সুধাভান্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপস্বারণে মনোনিবেশ করবে কি?

ভাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছ? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব! কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না দিলেও বড় আসে যায় না, কিন্তু মানিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে; তোমার প্রতিভাকে ত তোমার সার্থক করতে হবে।
কোন পথে সে সার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে? উত্তম, কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে– শুধু তোমার 'যখন চাহে এ মন যা' 'উন্মাদ ঝঞ্ঝা'র মত চললে তোমার জীবনের সার্থকতার নৈকট্য কোথায়?

বাঙ্গলার মুসলিমরা তোমার সম্যক কদর করে নাই, কিন্তু তাই বলে কি তুমি তাদের ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম সাহিত্যে। বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণী পুনঃপ্রতিধ্বনিত হবে, ইসরাফিলের সিঙ্গার মত সেই প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙ্গলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন মাত্র, সিংহাসন নয়; আজ বাঙ্গলার মুসলমান সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়।...

www.pathagar.com

এখন বিচার করতে হয়, তুমি বাঙ্গালী, তুমি কবি, তুমি মুসলমান, বাঙ্গলার কোন কল্যাণ সাধনে তোমার অগ্রসর হওয়ার দরকার।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে বেশী আত্মভোলা তোমারই ভাই এই মুসলিমগণ। আর বাঙ্গলা সাহিত্যে সবচেয়ে কলঙ্কী, সবচেয়ে নিন্দিত, কু-লিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি "এই সব মূক ম্লান মুখে" ভাষা দেবেন, "এই সব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে" আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্য স্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দেবেন, অ-মুসলিমের বুক হতে ইসলাম অশ্রদ্ধা দূর করতঃ হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনিই হবেন বর্তমানে শ্রেষ্ঠতম দেশ-হিতৈষী, তিনিই হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের অগ্রদূত। তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার, তুমি সেই মহা গৌরবের আসন দখল করতে পার।... বাঙ্গলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙ্গলার মুসলিমকে, বাঙ্গলার সাহিত্যকে ধন্য কর।"

ইবরাহীম খাঁ-এর এই চিঠির বক্তব্যের মধ্যে বুঝি ধরা পড়েছে সমাজ সচেতন বাঙালী মুসলিমদের নজরুলের প্রতি করুণ আবেদন । কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে নজরুল যে এই আবেদনকে গ্রাহ্য করেননি সেটা বোঝা যায় ১৯২৯-এ কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুলকে দেয়া সম্বর্ধনার অভিনন্দনের জবাবে দেয়া নজরুলের অভিভাষণে। সেখানে নজরুল বলেছিলেন–

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না বলে, তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।

ফররুখ আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের চিন্তাদর্শের পার্থক্যের স্বরূপটা এখানে ধরা পড়বে। পূর্বে উল্লেখিত ফররুখের লেখা 'নজরুল প্রসংগ' প্রবন্ধে ফররুখ যে বলেছেন–

www.pathagar.com

> নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, কারণ তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়।

সেটা ইবরাহীম খাঁর বক্তব্যেরই যেন প্রতিধ্বনি। এবং ফররুখের চল্লিশ দশকের কাব্যচিন্তায় উত্তরণ যেন ইবরাহীম খাঁর প্রত্যাশিত মুসলিম কবির। কারণ ফররুখ অবিভাজ্য ও অবিমিশ্র মুসলিম সমাজের প্রত্যাশিত কবি হতে চেয়েছিলেন। সে জন্যে তাঁর কবিতায় হিন্দু পূরান ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে মুসলিম রচিত পুঁথিকাব্য, মুসলিম ইতিহাস ও কুরআন হাদিস। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ যে বলেছিলেন, 'হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে।' তারই রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে ফররুখের কবিতায়। নজরুলের কবিতায় ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের ধর্ম-শাস্ত্র প্রশ্রয় পেলেও সেটাই তাঁর কবিতার একমাত্র উপাদান ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে ফররুখ ছিলেন সচেতন মুসলিম ঐতিহ্য সংস্কৃতির অনুসারী কবি। এতে তাঁর মানবতাবাদী চিন্তা বিস্রস্ত হয়েছে মনে করা উচিত হবে না। কেননা ইসলাম ও মানবতাবাদকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি।

উল্লেখ্য নজরুল মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে কম লেখেন নি। তাঁর 'অগ্নি-বীণা'র 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মহররম', 'রণভেরী', 'আনোয়ার', 'কামালপাশা', 'বিষের বাঁশী'র 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম'; 'জিঞ্জীর'-এর 'সুবেহ্‌ উম্মেদ', 'খালেদ', 'উমর ফারুক' 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'নওরোজ', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়', 'অগ্নাণের সওগাত' সবই ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক কবিতা। ত্রিশের দশকে নজরুল শুধু প্রায় তিন শতের মত ইসলামী গানই লেখেন নি তিনি লিখেছিলেন, 'মরুভাস্কর'-এর মত কাব্যগ্রন্থ। অনুবাদ করেছিলেন 'কাব্যে আমপারা'। তাঁর 'হাফিজ' ও খৈয়াম' অনুবাদেও সাংস্কৃতিক মুসলিম মানস কাজ করেছিল। নজরুলের 'নতুন চাঁদ'-এর 'নতুন চাঁদ', 'মোবারকবাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'আজাদ', 'ঈদের চাঁদ' এবং 'শেষ সওগাত'-এর 'মোহররম', 'আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও', 'এ কি আল্লার কৃপা নয়', 'মহাত্মা মোহসিন', 'এক আল্লাহ্‌ জিন্দাবাদ', 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' প্রভৃতি কবিতাও ইসলাম ও মুসলিম ধর্ম সংস্কৃতি সমাজ সংক্রান্ত। মাত্র ২২/২৩ বছরের সাহিত্য জীবনে তাঁর এই কাজকে খুব সামান্য বলা চলে না।

www.pathagar.com

ফররুখ ও নজরুল ইসলামের চিন্তাদর্শের পার্থক্য খোদ মুসলিম সমাজের একটি বহুদিনের বিতর্কের স্বরূপ। ইসলামে মুতাযিলার আবির্ভাব থেকেই মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয় তা থেকেই ইসলামী দর্শনেই একটি বিভক্তি দানা বেঁধে ওঠে। মুসলিম মনীষীদের একাংশ গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই বিভেদের ফলশ্রুতি ইবনুল আরাবী, ইবনে সিনা, আবু রুশদ, ইবনে খলদুন একদিকে অন্যদিকে ইমাম গাযযালী, মুজাদ্দিদ-ই আলফেসানি প্রমুখ। মুসলিমদের মধ্যে যে উদার মুসলিম মনীষীরা আবির্ভূত হন মরমী কবি হাফিজ ও বিজ্ঞানী মরমী কবি খৈয়াম এদের মধ্যে অন্যতম। নজরুল ইসলাম এই দুই কবির চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অন্যদিকে এই দর্শনের বিরুদ্ধতাকারী ইকবাল ছিলেন হাফিজী চিন্তার পরিপন্থী। আর ফররুখ ছিলেন এই ইকবালীয় চিন্তায় অনুগত। ফলে একই মুসলিম সমাজের কবি হলেও এবং উভয় কবিই মুসলিম সমাজের শুভাকাঙ্খী হলেও দু'জনের মধ্যে পন্থাগত পার্থক্য থেকে গেছে। নজরুল ইসলাম যখন বলেন, 'তওফিক দাও খোদা ইসলামের মুসলিম জাঁহা পুনঃ হোক আবাদ' বা 'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারি/ হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি!' তখন উভয় কবির স্বপ্ন ও আশাবাদে পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যে নজরুল ইসলাম বলেন, 'বাঙ্গলা-সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।'– তাঁর সঙ্গে ফররুখের বোধ করি চিন্তার মিল ছিল না। তিনি নজরুলের এই চিন্তাকে অবাস্তব মনে করেছিলেন বলে বিশ্বাস হয়। কারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তৌহিদবাদে ও পৌত্তলিকতাবাদে মিলন হতে পারে না। দুটি চিন্তাই পরস্পরবিরোধী। এদের এক জোয়ালে জুতে দিলে তা অযৌক্তিক হবে এটাই ছিল ফররুখের ধারণা। নজরুল কি এই অসম্ভবকে সম্ভব হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন?

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভিতরে গঠিত স্বরাজ পার্টি সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক সম্মেলনে যে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করেছিল কমরেড মুজফফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা"য় লিখছেন সেটা 'হিন্দুদের খুব বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করতে পারেননি।' তিনি লিখেছেন–

"কংগ্রেসের ভিতরে যাঁরা স্বরাজ পার্টির সভ্য ছিলেন তাঁরা হিন্দু

www.pathagar.com

মুসলমান প্যাক্টকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্মী সংঘসহ বেশীর ভাগ হিন্দু প্যাক্টকে নাকচ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।"

বলা বাহুল্য এই প্যাক্ট শেষ পর্যন্ত নাকচ হয়ে যায় কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মে। এই 'প্যাক্ট' যে বাস্তবায়িত হতে পারবে না সেটা অনুমান করে "প্যাক্ট" নামে নজরুল একটি ব্যাঙ্গাত্মক হাসির কবিতা লেখেন। এতেই নজরুলের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল–

বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আসনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥
আটসাঁট করে গাঁট-ছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
"বজ্র আঁটুনি ফসকা সে গেরো"? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে
একজন যেতে চাহিবে সমুখে অন্যে টানিবে পিছনে,
ফসকা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে!

মিলনের প্রচেষ্টা যখন তুঙ্গে তখন কি অবস্থা হল ? নজরুল লিখছেন –

"সারা-রারা-রারা" সহসা অদূরে উঠিল হোরির হররা!
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছোররা!
* * *
বদনা গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল "হা-হন্ত!"
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত!
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু;
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা,– করুণ চন্দ্রবিন্দু!

বিরুদ্ধ আদর্শবাদের চিত্র এঁকে নজরুল এই অবাস্তবতাকে 'চন্দ্রবিন্দু'র জিজ্ঞাসা চিহ্নে রূপায়িত করেছেন। এ-জন্যেই এলবার্ট হলের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন–

"কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের! আমি বলি, ও দু'টোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না।"

www.pathagar.com

নজরুলের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দুই প্রতিবেশী সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বিভক্ত চিন্তার পলিমাটিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম হয়। দায়ী কারা ছিল সে কথা কমরেড মুজফফর আহমদ বাস্তব চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন। 'প্যান্ট' মুসলিমরা নাকচ করেনি– করেছিল হিন্দুরা। সুতরাং দ্বিজাতিতত্ত্বের স্রষ্টা যে একা মুসলিম মনীষীরা নয়, হিন্দু মনীষী-মানসের সংকীর্ণতা তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এই দ্বিজাতির দর্শনে বিশ্বাসী ইকবাল-শিষ্য ফররুখ আহমদ দায়ী হতে পারেন না। তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবতার রূপায়ক। কারণ যে মিলন চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং স্বয়ং নজরুল ইসলাম সে ধরনের প্রচেষ্টা রাজনৈতিক গতিধারার শিকার ফররুখ আহমদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনিবার্য পরিণতির নিয়তিকে মেনে নিয়ে নজরুল শান্তিপ্রেমিক হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এ-কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল নজরুল ইসলামের। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন–

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি শান্ত উদার !

এই শান্তির পথে বিভিন্ন জাতির আদর্শ বৈরিতা প্রধান সমস্যা। আজও বিশ্বে মুসলিম-খ্রীস্টান, মুসলিম-ইহুদী, খ্রীস্টান-ইহুদী এবং হিন্দু-মুসলমানের চিন্তা ও ধর্মাদর্শের অনৈক্যের বিভেদ এক সর্বনাশা সমস্যা হয়ে বিরাজ করছে। পৌনে একশ' বছর আগে এর একটা সমাধান কামনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম। "সাম্যবাদী" কবিতায় সেই মতাদর্শের মর্মবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু চিন্তা ও স্বপ্নে এটা যত সহজ বাস্তবে তা নয়। আর সে জন্যেই আজও বসনিয়া, চেচনিয়ায়, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনে, আলজিরিয়া ও কাশ্মীরে এই সমস্যা সম্ভাব্য ভূমিকম্পের আশঙ্কা নিয়ে জেগে আছে। অতি সাম্প্রতিক গুজরাটে যে ঘটনা ঘটেছে তার সমাধান কি-ভাবে ঘটবে সেটা বোধ হয় নজরুলের করুণ চন্দ্রবিন্দুর চির জিজ্ঞাসা!

ভুল কি ফররুখ করেছিলেন? ফররুখ আহমদ ভুল করলে শান্তিবাদী, সাম্যবাদী, মানবতাবাদী ইসলামী চিন্তাদর্শ ভুল। যে ইসলাম বিশ্বে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে, প্রভু ও দাসের ভিন্নতার বিরুদ্ধে উচ্চনীচের অসমতার বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছে তার মহিমাকীর্তন নিশ্চয়ই ফররুখের ভুল ছিল না। পন্থাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই স্বাপ্নিকের উদ্দেশ্যের পার্থক্য ছিল না বলেই আমার ধারণা। উভয় কবির মধ্যে সেইখানে কোন পার্থক্য নেই যেখানে তাঁরা শোষণ, বঞ্চনা এবং নিগ্রহের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করছেন। নিপীড়িত ও উৎপীড়িতের পক্ষ নিয়ে মসির যুদ্ধে যোদ্ধার ভূমিকা নিয়েছেন।

নজরুলের সঙ্গে ফররুখের আর একটি মিল শুধু আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগেই নেই মুসলিম পরিভাষাগত শব্দ ব্যবহারে এবং ইসলামী সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণে। এরও চেয়ে উভয়ের চিন্তাগত আর একটি গভীর মিল আছে। উভয় কবিই শক্তি ও গতিকে তাঁদের কাব্য ভাবনার অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের প্রলয়োল্লাস, ঝড় প্রভৃতি কবিতায় শক্তি ও গতির বন্দনা করা হয়েছে। যে জন্যে তাঁরা মুখ্যত জীবনের কবি হিসাবে পরিচিত হতে পেরেছেন। ইসলামী জীবনদর্শনই হয়ত তাঁদের এই বন্ধনীর মধ্যে একাত্ম করেছে।

রচনা সময়
৭-৫-০২

www.pathagar.com

ফররুখ-কাব্যে গণতন্ত্রের স্বরূপ

সমস্ত পৃথিবী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে চিৎকার করছে তখন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্যে বিবেকবান মানব-চিত্ত তখন ক্ষিপ্ত, দৃপ্ত, উন্মত্ত। উপমহাদেশের অধিকার-সচেতন মানুষ পশ্চিমা গণতন্ত্রের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যাকুল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেই ব্যাকুলতার তখন উল্লসিত প্রকাশ। লড়াই চলছে সব প্রাচীনতার বিরুদ্ধে, পুরাতনের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতা এবং অপ্রগতিশীল মূল্যবোধের বিরুদ্ধে– বুদ্ধির চিন্তার বন্ধনের বিরুদ্ধে– প্রচলিত সংস্কার, ঈশ্বর-আসক্তি এবং ঈশ্বরাশ্রিত ধর্মপ্রেমের বিরুদ্ধে। সর্ববন্ধনমুক্ত এই মানবিকতার জয়ধ্বনি গাওয়া সেই সাহিত্য-স্রোত থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে ফররুখ আহমদ তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কর্তৃক পুরনো বলে প্রচারিত মূল্যবোধকে কেন আঁকড়ে ধরলেন? চলিষ্ণু সাহিত্য-স্রোতের অনুকূলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হঠাৎ তার প্রতিকূলে কেন তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন? উল্টোস্রোতে সাঁতরাবার এই দুঃসাহস কেন হল তাঁর? সকল সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা যখন একটি কাল-নির্মিত স্রোতের অনুকূলে ধাবমান হন তখন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দুঃসাহসের পরিচয় দিতে চাইলেন কেন ফররুখ। ফররুখ কেন সেই দুঃসাহসের বিরল দৃষ্টান্ত হ'তে চাইলেন?

এটা কোন লুকনো ব্যাপার নয় যে ফররুখ আকেশাগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী। 'হে বন্য স্বপেরা' কাব্যগ্রন্থে এবং 'লক্ষ্য ধ্বংসস্তূপ' 'দুর্ভিক্ষের সন্তান', আসন্ন শীতে' 'সন্ধ্যার জনতা', 'দিন', 'কবন্ধ রাত্রি', 'আর্তনাদ', 'শকুনেরা', 'লাশ' প্রভৃতি দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক ফররুখের কবিতায় মানবপ্রেমিক যে আধুনিক কবিকে দেখি পরবর্তীতে তিনি একটি চিহ্নিত আদর্শের জামেয়ার পরে একটি নতুন আমামায় সজ্জিত হ'য়ে বুক উঁচিয়ে দাঁড়ান। এই চিহ্নিত আদর্শে আত্মসমর্পণ করে ফররুখ কি বিশ্বমানবতাবাদ থেকে অথবা জনগণ-অন্বিষ্ট গণতন্ত্র থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন?

যে চিহ্নিত আদর্শের কথা উপরে উল্লেখ করেছি সে আদর্শ ইসলামের। ফররুখ আহমদ ইসলামী আর্দশকে তাঁর জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে কখনও এই চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না যে তিনি লক্ষ্য নির্বাচনে ভুলের শিকার হ'য়েছেন বা জনগণ আকাঙ্ক্ষিত বা মানব-আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র থেকে দূরে সরে এসেছেন। যে গণতন্ত্রের বিজয় হলে পৃথিবীতে অপার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে অনেক

www.pathagar.com

মনীষীর ধারণা– ইসলামী আদর্শের বিজয় হ'লে সেই একই শান্তি নেমে আসবে বলে ফররুখের ধারণা ছিল।

গণতন্ত্রকামী তাঁরাই যাঁরা মানুষের মুক্তি চান, স্বাধীনতা চান, যাঁরা নিপীড়ন ও উৎপীড়ন মুক্ত, স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারমুক্ত সুবিচারঋদ্ধ সমাজ চান। সেই অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে যেহেতু ইসলামের সংগ্রাম তাই ফররুখ কুণ্ঠাহীনভাবে তার সত্তায় নিজেকে আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষের মুক্তির জন্যে স্বাধীনতাকামী বা শান্তিকামী বিশ্বের যেসব কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের সেই সব কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে ফররুখের সংগ্রামী চেতনার কোন পার্থক্য আছে কি? 'উমর দরাজ দিল' কবিতায় ফররুখ যখন লেখেন–

আজকে উমর পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,

দিক দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা!
যাদের হাতের দোররা অশনি পড়ে জালিমের ঘাড়ে,
যাদের লাথির ধমক পৌঁছে অত্যাচারীর হাড়ে,
আগুনের চেয়ে নিষ্কলঙ্ক, উদ্যত লেলিহান
যাদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে বহে দরদের বান,
যারা খুলিয়াছে রুদ্ধ মনের সঙ্কীর্ণতা খিল
দারাজ দিলের আরশির ছায়া ধ'রেছে দারাজ দিল
সে ভয়ঙ্কর, সেই প্রশান্ত মধ্য দিনের রবি,
এই মজলুম দুনিয়ার খাব– নিত্য দিনের ছবি।

অথবা 'ওসমান গণি' কবিতায় যখন বলেন–

সংগ্রামী সে মুজাহিদ-অশ্রান্ত জেহাদ
চালায়েছে অন্তঃহীন সত্যের বিজয় অভিযানে,
দিক হ'তে দিগন্তরে, দূর হ'তে দূরান্তর পানে,
উদ্ধত পাশব গর্ব পাদপিষ্ট করেছে হেলায়
সে নির্ভীক মুজাহিদ!

এবং 'আলী হায়দার' কবিতায় যখন বলেন–

আল্লার কাছে করেছে সে তার পূর্ণ সমর্পণ
তাই সে মানে না অত্যাচারী জালিমের বন্ধন।

www.pathagar.com

কিংবা 'শহীদে কারবালা' কবিতায় যখন বলেন–

উতারো সামান দাঁড়াও সেনানী নির্ভীক-সিনা বাঘের মত।
আজ এজিদের কঠিন জুলুমে হ'য়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত,
কওমী ঝাণ্ডা ঢাকা প'ড়ে গেছে স্বৈরাচারের কালো ছায়ায়,
পাপের নিশানি রাজার নিশান জেগে ওঠে আজ নভনীলায়;
মুমিনের দিলে জ্বলছে বে-দিন জালিম পাপীর অত্যাচারে
নিহত শান্তি নিষ্কলঙ্ক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে,
হেরার রশ্মি কেপেঁ কেঁপে ওঠে ফারানের রবি অস্ত যায়!
কাঁদে মুখ ঢেকে মানবতা আজ পশুশক্তির রাজসভায়!

তখন পৃথিবীর বিপ্লবী কবিদের মর্মবাণী অনুরণিত হয় তাঁর কবিতায়, সেখানে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি হ'য়ে বাজে। তখন তাদের গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে ফররুখের গণতান্ত্রিক চেতনার সুদূর পার্থক্য চিহ্নিত করে না।

আমরা ফররুখের "নৌফেল ও হাতেম"-এ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণকামী একটি বিশ্ব মানবতাবাদী দানশীল সর্বত্যাগী মানুষের চরিত্র পাই– লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্ষমতা ও যশোলোভী এক স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে তাঁকে অঙ্কন ক'রে ফররুখ কি তাঁর গণতন্ত্রকামী মানসিকতাকে রূপায়িত করেননি?

এবং আমরা যখন ফররুখের 'হাতেম তা'য়ী'তে পড়ি–

অশান্তি দেখেছি যত স্বপ্নময় দুনিয়া জাহানে,
অকল্যাণ, অপমান যতবার দেখেছি, বিস্ময়ে
দেখেছি স্বার্থের চক্রে সংগোপন রয়েছে অলীক
স্বপ্ন প্রভুত্বের। তামাম জাহানে জানি মালিকানা
কেবলি আল্লার। আশ্চর্য পিপাসা তবু প্রভুত্বের
দেখি পৃথিবীতে। ধ্বংস হ'ল নমরুদ, ফেরাউন,
ধ্বংস হ'ল আত্মঘাতী প্রভুত্বের যে মিথ্যা দাবীতে
সে অলীক অহঙ্কারে দেখি আজও ইবলিসের চর
খোদার বান্দাকে চায় ক্রীতদাস বানাতে নিজের।
মানি না কখনও তাই বলদর্পী ঘৃণ্যের বিধান,
মানি না কখনও আমি অত্যাচার।

হাতেম তা'য়ীর।

www.pathagar.com

যতটুকু অধিকার পৃথিবীতে রয়েছে বাঁচার
পথচারী মজলুমের তিলমাত্র নাই তার কম
দুনিয়ায়। লোহুতে পার্থক্য নাই বনি আদমের।
শিরায় শিরায় আর ধমনীতে দেখি বহমান
এক রক্তধারা, তবু দেখি আমি শঙ্কিত বিস্ময়ে
মিথ্যা আভিজাত্য নিয়ে কৌশলীরা গড়েছে এখানে
বিভেদের কী মৃত্যু দুঃসহ। সীমাহীন বঞ্চনায়
গড়েছে প্রলুব্ধ পাপী জুলুমের কি কাল জিঞ্জির!

তখন আর সন্দেহমাত্র থাকে না যে ফররুখ গণকণ্ঠকেই তাঁর কণ্ঠের অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। 'আশ্চর্য পিপাসা'য় পিপাসিত 'প্রলুব্ধ পাপী'রা 'জুলুমের জিঞ্জির' তৈরী করে 'খোদার বান্দাকে ক্রীতদাস' বানিয়ে অন্তরীণ করে রেখেছে, আভিজাত্যের পূজারী ইবলিসের চরেরা কৌশলে যে দুঃসহ বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে একই বনি আদমের সন্তানদের মধ্যে– যাদের প্রত্যেকের ধমনীতে একই রক্ত প্রবহমান– কবির দৃষ্টিতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। এই প্রগাঢ় অবলোকনই বলে দেয় ফররুখ হৃদয়ে মস্তিষ্কে গণতন্ত্রকামী ছিলেন।

আমরা জানি ফররুখ ইসলামবাদী ছিলেন। আমরা এখন যদি তাঁকে গণতন্ত্রবাদী বলি তা'হলে কি ধরে নিতে হবে যে তাঁর ইসলামবাদ ও তাঁর গণতন্ত্রবাদ সমার্থক? তাহলে কি ধরা যাবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী দর্শনের পার্থক্য অতি সামান্যও নয়!

উল্লেখযোগ্য ফররুখ আহ্‌মদের এমন কোন গদ্য লেখা আমার চোখে পড়েনি যেখানে তিনি তাঁর কবিতার মর্মান্তরে ঢোকার চাবি রেখেছেন– যেমন রেখেছেন তাঁর পূর্বসূরী নজরুল ইসলাম। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নজরুল বলেছিলেন ঃ "ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।" নজরুল "ইসলামের প্রাণশক্তিকে" "গণতন্ত্রবাদ" বলতে পারতেন– কিন্তু তার সঙ্গে তিনি "গণশক্তি" 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' ও 'সমানাধিকারবাদ'–এই তিনটি অতিরিক্ত শব্দ জুড়ে দিলেন। ইসলাম অর্থে শুধু গণতন্ত্র শব্দটি যথেষ্ট মনে না করে কেন তিনি আরও তিনটি শব্দ জুড়ে দিলেন?

সম্প্রতি বিচারপতি আবদুল বারি সরকারের "The Concept of Democracy in Islam" নামে একটি বই আমার হাতে এসেছে। এই বই-এর ভূমিকাংশে "Gist of the Book" নামে বইটির সারমর্ম তুলে ধরেছেন

www.pathagar.com

জনাব বারি এবং বলেছেন– "Islamic democracy is better and beneficial than and superior to the secular democracies of all times and countries."
অর্থাৎ তিনি বলছেন, ইসলামী গণতন্ত্র অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চেয়ে সর্বকালের জন্যে কল্যাণকর এবং শ্রেষ্ঠতর। অন্যদিকে নজরুল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৯৪০-এর অভিভাষণে বলছেন–

> "আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।"

এখানে গণতন্ত্রের স্থানে অন্য দুটি মতবাদের কথা উচ্চারিত হ'তে দেখছি– সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। এর কারণ সম্ভবতঃ বিভিন্ন যুগে গণতন্ত্র বিশেষ অর্থে গৃহীত হয়েছে। এক সময় গণতন্ত্র ছিল শাসক ও ধনীশ্রেণীর গণতন্ত্র যাকে রাজনীতির পরিভাষায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলা হয়। এরই পাশে গ'ড়ে ওঠে জনগণতন্ত্র বা Peoples Democracy । এই জনগণতন্ত্র বা পিপলস ডেমোক্রেসী থেকে সৃষ্টি হয় সমাজবাদী গণতন্ত্র এবং রূপান্তরে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্র। এখন আমরা বুঝতে পারব নজরুল ইসলাম গণতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার না করে তার সঙ্গে 'গণশক্তি' সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকারবাদ' শব্দগুলি কেন জুড়ে দিয়েছেন এবং পরে কেন বলেছেন– 'সাম্যবাদ' ও 'সমাজতন্ত্রবাদ'-এর উৎসমূল ইসলামে নিহিত রয়েছে।'

একাকী গণতন্ত্র, তা এমনকি জনগণতন্ত্র হ'লেও, তা দিয়ে ইসলামী আদর্শের সমস্ত রূপটিকে প্রকাশ করা যায় না। এর কারণ পাশ্চাত্যে উদ্ভূত, সৃষ্ট ও প্রচলিত গণতন্ত্রে ধর্ম ও ঈশ্বর নেই। আল্লাহ বিযুক্ত এই গণতন্ত্রে পূর্ণ মানবিকতার বিকাশ ঘটে না ব'লে অনেক মনীষী মনে করেন।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গণতান্ত্রিক চেতনায় পশ্চিমের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে সে সভ্যতাকে ইকবাল জড়সভ্যতা বলেছেন। এ সভ্যতায় ধর্মের স্থান একেবারে অনুপস্থিত না বললেও তা যে ন্যূন এবং কোথাও কোথাও শূন্য তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মের স্থান না থাকাতে সে সভ্যতায় হৃদয় ও আত্মার স্থানও শূন্য হ'য়ে গেছে। আর যেখানে আত্মা ও হৃদয়ের স্থান ন্যূন এবং শূন্য সেখানে মানবিকতা যে তার পূর্ণ স্বরূপে বিকশিত হতে পারে এটা মনীষী ইকবাল মনে করতে পারেননি।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের কবিতাতেও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা থাকলেও এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও তার অবিমিশ্র রূপ সেখানে নেই- নজরুল পাঠক মাত্রই তা জানেন। যে গণতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে ঈশ্বর বা ভগবান বা আল্লাহ নেই সে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র যে নজরুলের অভিপ্রেত ছিল না নজরুলের কবিতার যত্রতত্র তার পরিচয় বিধৃত আছে। তিনি যখন বলেন-

গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক? কে সে রাজা ?
কে দেয় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে ?

তখনই এ কথা বলতে ভোলেন না-

হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

স্বাধীনতা আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ হলেও এবং সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাকে তাঁর কাব্যের প্রধান সুর ব'লে চিহ্নিত করলেও তাঁর কাব্যে হৃদয় এবং আত্মার স্থান অনেক উচ্চে ছিল। বলা বাহুল্য ইসলামকে নজরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র মনে করতেন ব'লে "ওমর ফারুক" কবিতায় ইসলামকে গণতন্ত্রের 'শুভ্র মন্দির' ব'লে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

ইসলামের এ নহে ক' ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গীর্জারে করে মজিদ মুসলমান।"
কেঁদে কহে যত ঈসাই ইহুদী অশ্রুসিক্ত আঁখি
"এই যদি হয় ইসলাম- তবে কেহ রহিবে না বাকী,
সকলে আসিবে ফিরে
গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে"।

ইসলাম সম্বন্ধে এই ধারণার জন্যে নজরুল এই মহান আদর্শের গন্ডী থেকে নিজেকে কখনই নিষ্ক্রান্ত করতে চাননি। তিনি কোন কুণ্ঠা না করে তাই বলেছেন-

www.pathagar.com

ধর্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

ইকবালও অনুরূপ দৃষ্টিতে ভেবেছিলেন বিশ্ব সমস্যার সমাধান দিতে পারে ইসলাম। প্রখ্যাত অধুনিক কবি ও চিন্তাবিদ অমিয় চক্রবর্তী তাঁর "যুগসংকটের কবি ইকবাল" প্রবন্ধে লিখেছেন–

> "তাঁর চিত্তের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেখতে পাই ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর আদর্শিক ছবিতে, যে আদর্শ পৃথিবীকে নূতন করে মৈত্রী এবং মুক্তির বিশেষ সন্ধান দেবে।" (সাম্প্রতিক)

পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র যে প্রকৃত গণতন্ত্রের মুখোশ ইকবাল তা দেখতে পেয়েছিলেন। 'ইবলিশ কি মজলিশ-ই-শূরা' (শয়তানের মজলিশ) কবিতাতে এই কথাটিই শয়তানের বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বলেন–

> "ইমপ্রিয়ালিজমকে আমরা সাজ পরিয়েছি ডেমোক্রেসির। রিপাবলিক হোক আর পারস্য রাজ-দরবারই হোক, একই কথা। জনগণের অধিকার যেই গ্রাস করে প্রভুত্বের প্রকৃতি তার একই। দেখছ না য়ুরোপীয় গণতন্ত্রগুলির পরিচয় বাহিরে ঝকঝকে, অন্তরে চেঙ্গিস খাঁর চেয়ে অন্ধকার।"

আসলে গোটা "ইবলিশ কি মজলিশ-ই-শূরা"র কবিতাটিতে ইকবাল ইসলামের মহত্বের রূপকে এঁকেছেন। কবিতাটির পরিচয় প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন–

> "মুখ্যত ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে লক্ষ্য করে কবিতা গঠিত, কিন্তু এই কাব্যের তাৎপর্য সকলেরই অবাধ গ্রহণীয়। শ্রেষ্ঠতার একটি প্রতীক রূপে যে লোভহীন, আদর্শিক ত্যাগ– ভূষিত ইসলামের সর্বধর্মপ্রেমশীলতার বাণী এই গভীর লীলাকৌতুকী কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থই অভিনব।"

এই বক্তেব্যের পর অমিয় চক্রবর্তী গোটা কবিতার যে গদ্যরূপ তুলে ধরছেন তাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্য চিন্তার সমীপে ইসলাম সম্পর্কে ইকবালের ধারণা। আমি এই প্রবন্ধের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় অনিবার্য প্রসঙ্গ হিসাবে অমিয় চক্রবর্তীর ইকবালের উক্ত কবিতার গোটা পর্যালোচনা এখানে উদ্ধৃত করলাম–

www.pathagar.com

"পারিষদ পরিবৃত স্বয়ং শয়তান বলছেন, ভয় কর না, আধুনিক জগতের এই সব ব্যাপার আমারই সৃষ্টি। আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ শিখিয়েছি য়ুরোপীয়ানকে, গরীবকে করেছি অদৃষ্টবাদী, জন্ম দিয়েছি ধনিক সভ্যতার– কে পরাজিত করবে আমাদের? প্রধান পারিষদ আশঙ্কিত প্রশ্ন করলেন, এখন যে আমাদেরও বিপদ। জানি আপনি শিখিয়েছেন গরীবদের অদৃষ্টবাদ, মোল্লা এবং সুফীকে করেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের গোলাম, তাদেরই ক্রীতদাস। ঠিকই হ'য়েছে, পূর্ব-দেশীয়দের যোগ্য এই আফিম সেবন। যদি-বা মুসলমান হজ্জ করতে যায় তাতে বিপদ নেই, কেননা তাদের আত্মা আজ মরচে পড়া।

দ্বিতীয় পারিষদের প্রশ্ন, পৃথিবীতে যা ঘটছে সবই জানেন আপনি। এই যে ডেমোক্রিসির জন্যে দাবি, এটা কি ব্যাপার?

ভয় নেই' উত্তর দিলেন শয়তান। ইমপিরিয়ালিজমকে আমরা সাজ পরিয়েছি ডেমোক্রেসির। রিপাবলিক হোক আর পারস্য রাজ-দরবারই হোক, একই কথা। জনগণের অধিকার যেই গ্রাস করে প্রভুত্বের প্রকৃতি তার একই। দেখছ না য়ুরোপীয় গণতন্ত্রগুলির পরিচয় বাহিরে ঝকঝকে, অন্তরে চেঙ্গিস খাঁর চেয়েও অন্ধকার।

তৃতীয় পারিষদ আশ্বস্তি জানিয়ে বললেন, ডেমোক্রেসির জন্যে পাগল হয়েছে পৃথিবী, এতে ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু এই যে সোশালিজম-এর নতুন রূপ দেখছি এর প্রতিকার কোথায়? ইহুদী কার্ল মার্কস হলেন পথ-প্রদর্শক কালিম, অথচ তার হাতে নেই আলো, তিনি হলেন ক্রুশ নেই এমন যীশুখ্রীস্ট। ধর্মগুরু তিনি নন, কিন্তু তার আছে গ্রন্থ। ক্রীতদাসেরা পরাজিত করেছে প্রভুর দলকে, এর চেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহী বাণী আর কিছু ত কল্পনা করা যায় না।

চতুর্থ পারিষদ বললেন, ভয় করি না আমরা ইহুদী ব্যক্তিটিকে– তার পাল্টা ওষুধ বার হ'য়েছে রোমের প্রাসাদে। দেখো না, রোমের নতুন দরবারে জেগেছে পুরোনো রোমের সম্রাটত্বের স্বপ্ন। (ফ্যাসিজম হ'ল শয়তানের সৃষ্টি, কম্যুনিজমকে নাশ করবার জন্যে।)
তৃতীয় পারিষদ মাথা নাড়লেন। তিনি নব্য রোম জাতির দূরদর্শিতার অভাব সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত ক'রে বললেন, তারই ঔদ্ধত্য সমগ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ভিতরকার কথাটাকে জগতে রাষ্ট্র করে দিল যে।

www.pathagar.com

পঞ্চম পারিষদ শয়তানকে উদ্দেশ্য ক'রে দীর্ঘ প্রশস্তি জানালেন, তারপর তার নিবেদন। হে শয়তান, আর যে ইউরোপীয় জাতিগুলির উপর নির্ভর করা চলে না, আমাদের। তারা তোমার শিষ্য সে কথা সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মনই বদলিয়ে দিয়েছে ঐ বিদ্রোহী ইহুদী চিন্তানায়ক। আসন্ন বিপদ এল বুঝি ঐ দেখো ভয়ে কম্পিত হচ্ছে মরু-প্রান্তর, নদী-পর্বত, এই প্রসারিত পৃথিবীর সর্বত্র। হে গুরু, দুনিয়া ভর করে আছে তোমার নেতৃত্বের উপর, সবই কি যাবে ধ্বংস হ'য়ে?

মা ভৈঃ বললেন শয়তান। ডেমোক্রেসি বা নতুন সোশালিজম কী করতে পারে। খেপিয়ে তুলব যখন সারা য়ুরোপকে, দেখবে পরস্পরের মধ্যে ওরা কোন কাণ্ড বাধায় (আসন্ন মহাযুদ্ধের উল্লেখ) কোথায় থাকবে তাদের ধর্মযাজক আর তাদের রাষ্ট্রনেতার দল! হোঃ- এই এক শব্দে দেব তাদের উড়িয়ে। কিন্তু আমার ভয় সেই জাতিকে যারা ছাই হয়ে গিয়েও আজ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছে প্রাণের বহ্নি। এখনও সেই ধর্মবিশ্বাসীর দলে এমন বহু মানুষ আছে যারা চোখের জলে ভোরের প্রার্থনা শুরু করে। ওয়াজু হ'ল তাদের দুঃখের দ্বারা প্রত্যহ শোধিত কৃত্য। নূতন যুগে ভয় হ'ল তাদের কাছে অন্য কোন বিদ্রোহকে নয়। এই জাতি হ'ল ইসলামী।

জানি, মুসলমান আজ কোরআন অনুসরণ করে না, তাই তাদের হাতে তত ভয় নেই শয়তানের রাজ্যে তারাও ক্যাপিটালিস্ট হ'য়ে আছে অন্যদের মত। জানি, যে হারেম-এর প্রভু সে আজ অন্ধকারের শিষ্য। পূর্ব দেশের তিমিরে তাদের হাতে নেই প্রদীপ। কিন্তু আমরা মনের আশঙ্কা জানাই তোমাদের– নূতন যুগে ইসলামের চিরন্তন কানুন আবার দেখা যাবে উজ্জ্বল হ'য়ে। সেই ইসলামের নীতি হ'ল নারীদের সম্মান বাঁচানো, মানুষকে চরম সাধনায় ব্রতী করা, তৈরী করা বীরের দলকে। সব ভৃত্যতন্ত্রের মৃত্যু আছে তারই হাতে।

তার রাজ্যে থাকে না রাজা, থাকে না পুরোহিত। ধনের পাপ সে করে দূর, ধনী হয় সেবক, সর্বজনের ধনরক্ষক। এতবড়ো বিপ্লবী ঘটনা কোথায়,– তারা জানে জমির অধিকার ঈশ্বরের এবং মানুষের, রাজার নয়। পৃথিবীর চক্ষুর অন্তরালে থাকুক এই ধর্ম, কেউ না খবর পাক, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আশার কথা এই যে, মুসলমানেরা পর্যন্ত ঐ ধর্মে বিশ্বাস অনেকটা হারিয়েছে। আহা, তারা যেন ধর্মতত্ত্বের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যানে বিবৃতিতেই আপাদমস্তক জড়িয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা যেন কেবল আল্লার বাণীর ভয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রচারে ব্যবসায়ী হয়।"

অমিয় চক্রবর্তী সমস্ত কবিতাটির অনুবাদ করে এই মন্তব্য করেন–

ইকবাল সর্বধর্মের মহান ভূমিকায় যে ইসলামের পরিচয় দিলেন তা যেমন আদর্শিক তেমনি ব্যবহারিক জগতের প্রসঙ্গতায় নবীন সমুজ্জ্বল। মিলনতন্ত্র আছে তাঁর ইসলামী বাণীতে শুভকর্মের প্রেরণায়। এই ধর্ম মানবের সর্বোত্তম প্রত্যহ সাধনার সহায়ক। কবিতাটির শেষে শয়তান বলছে, তার শয়তানী রাজ্য রক্ষা হবে না যদি পবিত্র ইসলাম ধর্ম কলহ ঈর্ষা ত্যাগ করে। বৃথা তর্ক ও অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা উত্তীর্ণ হ'য়ে তার প্রকৃত রূপে দেখা দিলেই শয়তানের বিপদ।

ইকবাল তাঁর মেধা ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দিয়ে ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন ফররুখ আহমদ তার দ্বারা প্রভাবিত হন। ইকবালের কবিতার মধ্যে তিনি তাঁর স্বভাব-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান। ইকবাল স্থান ও দেশভিত্তিক জাতীয়বাদী ছিলেন না এবং তাঁর কাব্য বিশেষ আদর্শমণ্ডিত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিসারী। ইকবালের কাব্যাদর্শের এই গুণ ফররুখকে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে রুমি যেমন ইকবালের কবিগুরু হ'য়ে ওঠেন ইকবাল তেমনি হ'য়ে ওঠেন ফররুখের কবিগুরু।

ফররুখের ইকবালানুরাগ লক্ষ্য করা যায় তাঁর ইকবাল অনুবাদ থেকে। তাঁর কাব্য রচনাবলীতে যে একটিমাত্র কবির অনূদিত কাব্য দেখি তা ইকবালের। ইক্‌বালের পরে তাঁর অনুপ্রেরণা দাতা আর একজন কবিকে দেখি– নজরুল ইসলামকে। তিনি সামান্য কটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রধান প্রবন্ধটি ছিল ইকবালের উপর– দু'টি ছিল নজরুলের উপর। এবং নজরুলের সেই চরিত্রটি তাঁর প্রেরণার অংশ ছিল– যা ছিল ইকবালের স্বভাবস্বরূপে রূপায়িত। অতএব তিনি পূর্ণভাবে ছিলেন ইশবাল-সংক্রমিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"ও তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ইকবালের নামে। লিখেছিলেন– "বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশে" সঙ্গে ছিল ইকবালকে উদ্দেশ করে লেখা চতুর্দশপদী একটি কবিতা। যার শেষের পংক্তি কটি এমন–

যেথা ক্ষীয়মাণ মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে
জীবনের ক্ষীণ সত্তা মূর্ছাতুর, অসাড় নিশ্চল

www.pathagar.com

মুহূর্ত পদধ্বনি জাগে না সে সুষুপ্ত পাথরে;
জ্বলে না রাত্রির তীর, নাহি জাগে স্বপ্ন সমুজ্জ্বল
প্রাণবন্ত মাদকতা; সে নির্জীত তমিস্রা সাগরে
দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছ হে স্বর্ণ ঈগল ॥

ফররুখের প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতার মধ্যে উৎপীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা, ক্রোধ ও বিদ্রোহ লক্ষ্য করা গেলেও সেখানে আশার সঙ্গে ছিল নৈরাশ্যের সুর অথবা আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। কিন্তু ইকবালের মধ্যে যেই মাত্র তিনি তাঁর অন্বিষ্ট সত্যের সন্ধান পেলেন তখনই তাঁর মধ্য থেকে না-ধর্মী চেতনার অন্তর্ধান ঘটলো, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটলো হ্যাঁ-ধর্মী চেতনার। 'সাত সাগরের মাঝি'র আকুল আবেদনের মধ্যে যে সামান্য বিষণ্নতার সুর আছে তা 'হ্যাঁ'র লক্ষ্যাভিমুখী। পাঞ্জেরীতে তাঁর যে অনুরোধ মিশ্রিত তিরস্কারের আবেদন সেখানেও 'না' এর অবলুপ্তি ঘোষণার কণ্ঠ ধ্বনিত।

বলা বাহুল্য, তাঁর ইকবালের উপর লেখা প্রবন্ধটি পড়ে আমার মনে হয়েছে তাঁকে ইকবালই হাত ধ'রে দ্বন্দ্বের অন্ধকার থেকে নির্দ্বন্দ্বের আলোর মধ্যে এনেছেন– ইসলামের মধ্যে তিনি অনিশ্চিত লক্ষ্য আক্রান্ত ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন– তিনি শৃঙ্খলিত মানসের সন্ধান পেলেন। একটি সুশিক্ষিত জ্ঞান চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় পরিণত মানসই তাঁকে শিখিয়ে দিল দিকভ্রান্ত প্রবহমান স্রোত বিশুদ্ধ সত্যের পথে ধাবিত স্রোত নয়।

ফররুখের পূর্বসূরী ত্রিশের কবিরা প্রকরণ নির্মাণে কারিগরী দক্ষতার প্রমাণ রাখলেন বটে, কিন্তু চিন্তার রাজ্যে হয়ে রইলেন নেতিবাচক বিশৃঙ্খল। পাশ্চাত্য সাহিত্য-চিন্তাবৃত এইসব কবিদের রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল বা নজরুলের মত কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। বিশ্বাসের দর্শনে এদের কোন আস্থা ছিল না। বিভিন্ন চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে আবর্ত-সঙ্কুল এই মানস শেষ পর্যন্ত ফররুখকে শৃঙ্খলিত করতে ব্যর্থ হয়। চিন্তা-শৃঙ্খলা তিনি ইকবাল থেকে আহরণ করেন। তাঁর বিশিষ্ট গণতন্ত্রের শিক্ষাও এই ইকবালী গণতন্ত্রের শিক্ষা। আর ইকবালের গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসী কী সে যেমন কোন চক্ষুষ্মানকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই তেমনি ফররুখের গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসীর স্বরূপ বোঝাবারও প্রয়োজন নেই কোন চক্ষুষ্মানকে। ফররুখের আনখকেশাগ্র সেই গণতন্ত্রের সুরে অনুরণিত– যাকে নজরুল বলেছিলেন 'গণতন্ত্রের শুভ্র মন্দির!'

রচনা সময়
৪-৬-৯১

www.pathagar.com

ফররুখ-কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

আগে কথা না আগে অলঙ্কার? আগে বিষয় না আগে আঙ্গিক? আগে বক্তব্য না আগে শিল্প?

আমার ধারণা বক্তব্য বিষয়টা আগে, আঙ্গিক, অলঙ্কার, বা শিল্প পরবর্তী বিষয়। শিল্প বা আঙ্গিক গড়ে ওঠে কবি বা লেখক বিশ্বমানবকে তাঁর কোন একটা ভালো-লাগা কথাকে, স্বপ্ন বা আশার কথাকে, সুখ ও দুঃখের অনুভূতির কথাকে কিভাবে জানাতে চান তারই উপর ভিত্তি করে। সেই কথাটাকে মানুষের কাছে তিনি পৌঁছে দিতে চান সবচেয়ে সুন্দরভাবে– আকর্ষণীয় উপায়ে। কিন্তু প্রথমে কথা পরে শিল্প। এটা অনেকটা এই রকম– অতিথিকে খাওয়ানো হবে এবং কী খাওয়ানো হবে এটা প্রথম কথা, কিভাবে কেমন ভাবে খাওয়ানো হবে সেটা পরবর্তী বিষয়। তাজমহল নির্মাণ করা হবে এটা প্রথম কথা, কিভাবে নির্মাণ করা হবে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপার।

একটা বিশেষ তাগিদে তাজমহল নির্মাণের ধারণা এসেছে। সে আবেগটা সৃষ্টি হয়েছে কোথা থেকে। ভালোবাসার পরিণাম থেকে। সুতরাং সৃষ্টি-উৎস এখানে ভালোবাসা তথা প্রেম।

ফররুখের কাব্য আলোচনায় এই বিষয়ের, এই ভালোবাসা ও প্রেমের আলোচনাটা তাই প্রথমে আসবে।

আমরা জানি ফররুখ মানবতাবাদী কবি। মানুষের প্রতি তাঁর নিখাদ ভালোবাসা তাঁকে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তবু ফররুখের ভারতীয় মুসলিম প্রীতি তাঁর কাব্য রচনার আবেগে আগুন উদ্দীপ্ত করার তেল যুগিয়েছিল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মুসলিম জাগরণের, বৃটিশবিরোধী এবং স্বৈরাচারী সাম্প্রদায়িক হিন্দু মানসিকতাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

ফররুখ কাব্যের উৎসে ফররুখের সমাজ সচেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা কাজ করেছে। তিনি নজরুল ইসলামের উপর যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটি প্রকাশিত "নজরুল সাহিত্যের পটভূমি" (১৯৫৯-এ 'ঐতিহ্য ও নতুন

www.pathagar.com

ধারা' নামে এটি পাকিস্তান পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত; আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল পরিচিতি' নামে গ্রন্থে সংকলিত হয়। এটি ছিল একটি বেতার কথিকা।)। অন্যটি ফররুখের জীবিতকালে অপ্রকাশিত 'নজরুল প্রসঙ্গে' (ফররুখ রচনাবলী– ১ম খণ্ডের সম্পাদক বলেছেন, প্রবন্ধটি ফররুখ আহমদের পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া।)। সেই দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় ফররুখ সম্পর্কেও প্রযোজ্য । "নজরুল সাহিত্যের পটভূমি"তে ফররুখ আহমদ লিখেছেন–

> "ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের সৃষ্টি করেছিল, ১৯০৫ সালের আগে তার ভেতর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।
> এই সুদীর্ঘ সময় একটানা ক্লান্ত ও হতাশার। অন্ধকার যবনিকা দীর্ণ করে কোন সূর্যের সাক্ষাৎই এ সময় পাওয়া যায়নি। তবু জাতি পুরোপুরিভাবে মরেনি।
>
> রাজনীতি আর অর্থনীতি ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েও শুধুমাত্র মৌলিক তমদ্দুনের জোরেই এ জাতি কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর না হলেও মুমূর্ষ প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্লিষ্ট প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। তার নিজস্ব তাহজীব তমদ্দুনের ক্ষীণরেখা কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার নিজস্ব অস্তিত্ব।
>
> ইতিহাসের এই পটভূমি পিছনে রেখে বিচার করলে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই আয়তনে প্রথম সাড়া জাগালো। আর আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে খিলাফত আন্দোলনই সর্বপ্রথম নিয়ে এল দু'কূল প্লাবী বন্যা।
>
> খিলাফত আন্দোলন কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেল সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়।
> স্বতন্ত্র তমদ্দুনের যে বৈপ্লাবিক দাবিতে পাকিস্তান আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে একদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনন্দিত

www.pathagar.com

হয়েছিল তার গোড়াপত্তন হয় এ-সময় থেকেই।

বহু শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী ফারসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গড়ে তুলেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ষড়যন্ত্র যে ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিল কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেন শিক্ষিত সমাজ। এমনকি সাধারণের মাধ্যেও সাড়া পৌছাতে দেরী হল না।

ইসলামের মরমীবাদ ও সূফীবাদ থেকে কাজী নজরুল যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণশক্তিই দেশের দুর্গত জনসাধারণকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করলো মঞ্জিলের পথে।

"নজরুল প্রসঙ্গ" লেখাটিতে ফররুখ লিখেছেন–

"পলাশীর আম্রকাননে মুসলমানের যে সৌভাগ্য-সূর্য্য পরাজয়ের যবনিকায় ঢাকা পড়েছিল, ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় মুসলমানের বহ্নি-যৌবনে যে তুহিন পাথর নেমেছিল সেই স্থবিরত্বে অধিক গতিবেগ সঞ্চার করলেন কবি নজরুল ইসলাম।"

দুটো লেখাতেই ফররুখ মূলতঃ নজরুল প্রতিভা উদ্ভাসের ঐতিহাসিক পটভূমির ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। মনোযোগ দিয়ে ফররুখ পাঠ করলে দেখা যাবে, যে ঐতিহাসিক পটভূমি নজরুলের জন্যে সত্য সে ঐতিহাসিক পটভূমি ফররুখের জন্যেও সত্য। তবে দু'জনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে যেমন সাধারণ মিল আছে তেমনি পার্থক্যও আছে । এখানে সে বিষয়টি আলোচনা করা অনুচিত হবে না।

১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে ইবরাহীম খাঁ নজরুলকে একটা চিঠিতে শুধুমাত্র বাঙালী মুসলমানের কবি হওয়ার জন্য গভীর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি নজরুলের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে ইসলামের আদর্শের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন। নজরুল ইসলাম ইব্‌রাহীম খাঁর এই অনুরোধ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। ১৯২৯-এ কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুলকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তার অভিনন্দন পত্রের জওয়াবে নজরুল বলেছিলেন, তিনি একক সম্প্রদায়ের বা জাতির কবি নন তিনি সকলের কবি। তিনি সকল বাঙালীর কাছে অনুরোধ

www.pathagar.com

করেছিলেন যে তাঁকে যেন সকলের কবি হিসাবে দেখা হয়– যেমন আকাশের পাখী ও বনের ফুল সকলের তেমনি তিনিও সকলের– জাতি-ধর্ম নির্বেশেষে তিনি সব মানুষের কবি। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি দেশ কাল জাতি ধর্মের বন্ধন ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছেন বলে তিনি কবি। সেই ধারণার বশবর্তী হওয়াতে তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য তাঁর কবি-জীবনের লক্ষ্যকে ধর্ম-ভিত্তিক লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করেননি।

ফররুখ ইবরাহীম খাঁর চিঠি, সে চিঠির উত্তরে লেখা নজরুলের চিঠি এবং এলবার্ট হলে নজরুলের দেওয়া অভিভাষণ সবই পড়েছিলেন অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না। "নজরুল প্রসঙ্গ" নামক ছোট্ট নিবন্ধটিতে ফররুখ ইব্রাহীম খাঁর অনুযোগটি নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরেন। তিনি সেখানে বলেন–

> "নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, কারণ তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়।"

নজরুলের উপর ফররুখের এই লেখাটি তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। 'ফররুখ রচনাবলী'র সম্পাদক ফররুখের এই প্রবন্ধ পরিচয়ে বলেছেন–

> "নজরুল প্রসঙ্গ প্রবন্ধটি ফররুখ আহমদের 'পাণ্ডুলিপি' থেকে নেয়া; লেখাটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা, জানা যায়নি। ক্ষুদ্রকায় এই নিবন্ধটিতে লেখা নজরুল সাহিত্যের পটভূমি, জাতীয় জাগরণ– বিশেষ করে মুসলিম নবজাগরণে তার অবদান, নজরুল প্রতিভার স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর রচনার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য একাধিক কবিতায় ফররুখ আহমদ নজরুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।"

মোটকথা ফররুখ ভেবেছিলেন ইসলামী চেতনা ও আদর্শের প্রতিষ্ঠায় যতটা মনোযোগী ও অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল ততটা নিষ্ঠা ব্যয় বা ব্যবহার করতে না পারায় নজরুল ঐ বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ কাব্য জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে পারেননি। সম্ভবতঃ নজরুলের শুরু করা কিন্তু শেষ বা সম্পূর্ণ না করা এই

www.pathagar.com

কাজের দায়িত্ব ফররুখ আহ্‌মদ নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যধর্মী ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত লেখাই তার প্রমাণ। ইবরাহীম খাঁ যে অনুরোধ নজরুলকে করেছিলেন সেই অনুরোধ, উপদেশ ও পরামর্শকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে তাঁকে বাস্তবায়িত করতে সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন ফররুখ আহ্‌মদ।

শেষ পর্যন্ত এ-কথা মানতেই হয় যে, নজরুল কাব্য ও ফররুখ কাব্যের পটভূমি অভিন্ন হয়েও ভিন্ন ছিল। সে ভিন্নতার কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের বা বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি। বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় হিন্দুদের এবং সমগ্র ভারতীয় মুসলিমের আন্দোলন এক ধরনের ছিল না। ১৭৫৭-তে সিরাজদ্দৌলার পতনে সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজে যে দুর্দশা নেমে এসেছিল সে দুদর্শা হিন্দু-সমাজে তত গভীর হয়ে নামেনি। হিন্দুরা মুসলমানদের আগ্রাসী শক্তি হিসাবে দেখত এবং বৃটিশ শক্তিকে তারা সেই আগ্রাসী শক্তির উৎখাতকারী শক্তি ভেবে তাকে যতটা শত্রু ভাবা উচিত ছিল তা না ভেবে তাকে বন্ধু হিসাবে স্বাগত জানায়। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"-এ এই ভাবনার উদঘাটন হয়েছে। বঙ্কিম বলেছিলেন, ইংরেজ হিন্দুর শত্রু নন, বন্ধু, মিত্র। সে জন্যেই ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে জানপ্রাণ লড়াই ছিল সে লড়াইয়ে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার সেটা ছিল অন্যতম কারণ।

আসলে ফররুখ ও নজরুল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কবি। তাঁদের দু'জনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এমতাবস্থায় নজরুলকে ফররুখ যে সমালোচানা করেছেন সেটা অস্বাভাবিক নয়। আমার ধারণা ফররুখ এই লেখাটি যখন লেখেন তখন সমগ্র নজরুল রচনাবলী প্রকাশিত হয়নি এবং সমগ্র নজরুলকে অখণ্ডভাবে দেখার সুযোগ তিনি পাননি। এই না দেখার জন্য একা ফররুখ নন বাংলা সাহিত্যের অনেক মনীষী লেখক বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, কাজী আবদুল ওদুদ, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ এমনকি নজরুল রচনাবলীর সম্পাদক আবদুল কাদির পর্যন্ত একদা নজরুল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছেন।

উল্লেখ্য, একদা যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য মিলনের প্রয়োজন ভেবেছিলেন, তেমনি নজরুল ইসলামও ভেবেছিলেন যে ভারতের

www.pathagar.com

সার্বিক উন্নতির জন্যে হিন্দু মুসলমানদের মিলনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্যে এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা সে কথা একদা যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ উপলব্ধি করেন তেমনি উপলব্ধি করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সেই সঙ্গে কবি মুহাম্মদ ইকবালও। এঁদেরই চিন্তাদর্শের উত্তরসূরী ফররুখও ভেবেছিলেন মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন রক্ষার জন্যে এবং উন্নতির জন্যে পৃথক বাসভূমির প্রয়োজন। ভারতীয় হয়ে ভারতীয় হিন্দুদের ভিতরে থেকে সে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। কারণ ভারতীয় হিন্দুরা ভারতীয় মুলমানদের কখনও ক্ষমার চোখে দেখেনি, ক্ষমা করেনি এবং ভবিষ্যতে ক্ষমা করবে না। নজরুলের চিন্তাদর্শে যত মহত্ত্বই থাকুক সে মহত্ত্বের অনুসরণ করে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব ভেবেছিলেন ইক্‌বাল ও ইক্‌বাল-শিষ্য ফররুখ।

নজরুল মুসলিমদের জাগরণ চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন জ্ঞানে গুণে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাদের হিন্দুদের সমকক্ষ করে তুলতে; তাদের হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করে একটি বলীয়ান জাতিতে পরিণত করে তাদের প্রতি অন্য জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে। তিনি ভেবেছিলেন, সমশক্তিমান দুটি বাহুই কেবল শত্রুর সঙ্গে সমশক্তি হিসেবে যুদ্ধ করতে পারে। সে জন্যে দুর্বল বাহু মুসলমানদের শক্তিমান করে তোলার প্রয়োজন। তিনি হিন্দুদের কখনও শত্রু হিসাবে দেখতে চাননি। কিন্তু তাঁর সে চিন্তা অনেকটা ইউটোপিয়ান স্বাপ্নিক চিন্তা বলে প্রমাণিত হয়। এটা দেখাও গেছে যে হিন্দুকে তিনি বন্ধু ভেবে ভেবেছেন তারা তাঁকে বড় কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত। এই দ্বিধান্বিত মানুষকে শনাক্ত করতে পেরেই ফররুখের চিন্তা ভিন্ন পথ ধরে। সে জন্যেই আধুনিক কবিতা আন্দোলনের কালে ফররুখের উদ্ভব ঘটলেও সেই কালস্রোতে ফররুখ ভাসেননি। তিনি এই কারণে শুধু নজরুল থেকে পৃথক হ'য়ে যান নি– তিনি আধুনিক বাংলা কাব্য চিন্তাধারা থেকেও পৃথক হ'য়ে গিয়েছিলেন। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ফররুখের যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল তাকে বাস্তবায়িত করতে ফররুখ সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। মুসলমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পৃথক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তাধারা বিবর্তিত ও আবর্তিত হয় এবং কাব্যে তাকে রূপদানের জন্য তাঁর সমস্ত কবি-প্রতিভাকে তিনি নিয়োগ করেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, কোন পেরেককে যদি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে কোন দেয়ালে বা কাঠে ঢোকাতে হয় তাহলে তাকে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে রেখে তার সম্পূর্ণ শরীরকে ঐ কাঠ বা দেয়ালে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত পেরেকের মাথায় নিরবচ্ছিন্ন আঘাত হানার প্রয়োজন।

নজরুলও সে প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কিন্তু তা যতটা বিদেশী শক্তি হটানোর জন্যে ততটা ইসলামী আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়। নজরুলের সঙ্গে ফররুখের এটাই পার্থক্য।

রচনা সময়
২২-১১-৯৩

www.pathagar.com

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ফররুখ আহ্‌মদ

প্রবন্ধের শুরুতে 'আমাদের সংস্কৃতি' বিষয়টি বুঝে নেয়া উচিত। কে এই আমি বা আমরা? আমরা কি বাংলাদেশী? আমরা কি বাংলাদেশী বাঙালী? আমরা কি মুসলমান? আমরা বাংলাদেশী মুসলমান? অথবা আমরা মানুষ বা বিশ্বমানুষ? এখানে 'আমাদের সংস্কৃতি' বলতে যা বোঝানো হয়েছে নিশ্চয়ই তা তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃতি বিশ্বের হতে পারে– বিশ্বমানুষের হতে পারে। হতে পারে তা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা এশিয়ার। হতে পারে প্রাচী বা প্রতীচ্যের– পূর্বের বা পশ্চিমের। কিন্তু যখন আমাদের বলা হয় তখন তা 'আমি'র মধ্যে চলে আসে, তখন তা সকলের থাকে না– তখন তা বিশ্বের থাকে না; তখন তা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জাতির বা দেশের হয়– তখন তা হয় স্বাতন্ত্রে বিশিষ্ট একটি সীমার বা সীমানার।

আমার ধারণা এখানে যে 'আমাদের' বলা হয়েছে তা সীমার মধ্যে অন্য সীমানার। ব্যাপারটা স্পষ্ট করা ভালো। ভালো এই জন্যে যে তাতে আমাদের আলোচনায় সুবিধা হবে। এখানে 'আমাদের' অর্থ শুধু বাংলাদেশের বা শুধু 'বাংলাদেশের বাঙালী' নয়। তাহ'লে কি তা বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমানের?

নজরুল ইসলাম তার একটি বিখ্যাত গানে লিখেছিলেন–

> "ধর্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
> সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।"

এখানে যে জাতির কথা বলা হ'য়েছে সে মুসলিম জাতি; এবং 'আমরা' মানে মুসলিম। কিন্তু নজরুল ইসলাম যখন লেখেন–

> কবে সে খোয়ালী বাদশাহী
> সেই সে অতীতে আজো চাহি'
> যাস মুসাফির গান গাহি
> ফেলিস অশ্রুজল ॥

বা

> দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে

www.pathagar.com

দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল
ওরে বে-খবর তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল ॥

তখন তা স্থানীয়ত্বে সঙ্কুচিত হয়। স্পষ্টতঃ নজরুল ইসলাম এখানে উপমহাদেশের মুসলমানদের ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু এইখানে একটু সতকর্তার প্রয়োজন আছে। আমরা যখনই মুসলিম শব্দটি উচ্চারণ করব তখন তা আর দৈশিক জাতীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইসলামে সংকীর্ণ জাতীয়তার স্থান নেই– বিশেষ করে দেশভিত্তিক জাতীয়তার। সে জন্যেই মুসলিম জাতি বলতে গোটা বিশ্বের মুসলিম জাতির কথা এসে যায়; এবং তাদের সংস্কৃতি বলতে বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতির কথা আসে এবং সে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানে বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এখানে 'আমাদের সংস্কৃতি' মানে বিশ্ব-মুসলিম সংস্কৃতি বা ইসলামী সংস্কৃতি।

আর বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতি মানে দেবতা বন্দনা নয়– আল্লাহ বন্দনার সংস্কৃতি; অসাম্যের নয় সাম্যের সংস্কৃতি; অশান্তির নয় শান্তির সংস্কৃতি; অন্যায়ের নয় ন্যায়ের সংস্কৃতি; অমানবিকতার নয় মানবিকতার সংস্কৃতি; অশ্লীলতার নয় শ্লীলতার সংস্কৃতি; ঘৃণার নয়, ঈর্ষার, বিদ্বেষের, হিংসার, অহঙ্কারের নয়– প্রেমের, ভালোবাসার, অবিদ্বেষ, অহিংসার, নিরহঙ্কারের সংস্কৃতি। সুতরাং 'আমাদের সংস্কৃতি' ইসলামের সংস্কৃতি হ'লে আমাদের সংস্কৃতি মানবতার তথা মনুষ্যত্বের সংস্কৃতি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব 'আমাদের সংস্কৃতি' বলতে প্রথমত যাকে সংকীর্ণার্থে বোধগাম্য হচ্ছিল তা গভীরতম অর্থে উদার এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ। ফররুখ আহ্‌মদ যেহেতু এই মানবিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক তাই তিনি আমাদের সেই চির কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকার।

তাহ'লে এখানে একটা প্রশ্ন আসবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু লেখকের লেখায় বহু কবির কবিতায় মানবিকতার রূপ প্রকাশিত হয়েছে বলে তাঁদের সংস্কৃতিও কি আমাদের সংস্কৃতি? এবং সেই জন্যে ফররুখের সংস্কৃতি? মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সংস্কৃতি বা রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যের সংস্কৃতি কি নজরুল বা ফররুখের সম আদর্শের সংস্কৃতি? একজন বিশ্বাসীর সংস্কৃতির সঙ্গে

www.pathagar.com

অন্য ধর্মের আর একজন বিশ্বাসীর সংস্কৃতি কি এক বলে বিবেচিত হবে? ধর্ম জগত, সমাজ জগত, রাষ্ট্র জগতের সংস্কৃতির মধ্যেও রয়ে গেছে ভিন্নতা। একেশ্বরবাদী ধর্ম হ'লেও খৃস্টান, ইহুদী, ব্রাহ্মধর্মের সংস্কৃতি এক নয়। আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন প্রভু নেই– মুসলমান শুধু এই কথা বলবে না; সে বলবে আল্লাহ আমার প্রভু এবং মুহাম্মদ (সা) আমার রাসুল। একজন মুসলমানকে সেই সঙ্গে আল কুরআনের পূর্বের আল্লাহপ্রেরিত কিতাবসমুহকেও মান্য করতে হবে, মান্য করতে হবে ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে, মান্য করতে হবে তকদীরকে, মান্য করতে হবে পরকালকে। সুতরাং সার্বভৌম সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে যেমন তেমনি তাঁর বাণীকে এবং বাণী-উক্ত আদেশ, নির্দেশকেও মান্য করতে হবে। এইখানেই 'আমাদের সংস্কৃতি' মানবিক সংস্কৃতি হয়েও অন্য মানবিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক। সে শুধু নাস্তিকের মানবিক সংস্কৃতি নয়– ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আস্তিকের সংস্কৃতি থেকেও পৃথক। ফররুখ এই ইসলামবর্জিত মানবিক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ইসলামী আদর্শযুক্ত সংস্কৃতিকে মান্য করেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যে ও কাব্যে তা রূপায়িত করেছিলেন। ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে পৃথক হয়ে তাই তিনি ভাষা ও শব্দ সংস্কৃতিতে পৃথক হয়েছিলেন এবং আমাদের সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি করেছিলেন।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। সংস্কৃতি শব্দটা যেখানে ব্যবহৃত হয় উদারতা শব্দটির ব্যবহার সেখানে সমীক্ষক দৃষ্টিতে যথার্থ নয়। কারণ সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মরূপকে নিশ্চিহ্ন করা সংস্কৃতি নয়, স্বরূপকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করাই সংস্কৃতি। এই জন্যে আরবীয় ও ইরানীয় সংস্কৃতি বা উমাইয়া, আব্বাসীয় খলিফা বা মুঘল বাদশাহদের সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতি নয়। পৃথক জাতীয় আদর্শ ও আচরণ মিলেই একটি জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মানবিকতার সংস্কৃতির নামে মুসলিম দেশসমূহের সংস্কৃতিকেও সমরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব না। আরবের ও ইরানের মুসলিম সংস্কৃতি যেমন এক নয়; তুরস্কের ও আফগানিস্তানের মুসলিম সংস্কৃতি যেমন এক নয়– তেমনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বা উপমহাদেশের সংস্কৃতি এক নয়। বলা বাহুল্য, আদর্শ, মানবতা ও সংস্কৃতি ভিন্নার্থবোধক বিষয়। ধর্ম সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, দেশীয় আদি মানব সমাজের আচার আচরণও

www.pathagar.com

সংস্কৃতিকে নির্মাণ করে– নির্মাণ করে ভাষার পার্থক্য। আমরা বাংলাদেশী বাঙালী হিসাবে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের উপর যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আছে তেমনি বাংলাদেশী বাঙালী মুসলমান হিসাবে মুসলিম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তেমনি আমাদের উত্তরাধিকার আছে। আমরা মুসলমান কিন্তু বাঙালী মুসলমান হিসাবে আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার মুসলিমদের সংস্কৃতি ও আমাদের বাঙালী মুসলিমদের সংস্কৃতি এক নয়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা তাদের শিল্প সঙ্গীত ও সাহিত্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করেছি। কিন্তু দেশজ ও ভাষাগত সংস্কৃতির এই পার্থক্য থাকলেও আমাদের ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যে সেই পার্থক্য নেই। এই মিশ্র ও অবিমিশ্র সংস্কৃতি মিলিয়েই আমাদের সংস্কৃতি। ফররুখ আহ্‌মদ খুব সচেতনভাবে– যা আমাদের নয় এমন সংস্কৃতিকে পরিহার করে তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেও স্বতন্ত্র ভাষা সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন পূর্বসূরীদের অনুকরণ করে।

ফররুখের কাব্য সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি এখানে আলোচনা করব।

ফররুখের "নৌফেল ও হাতেম" বা "হাতেম তায়ী" গ্রন্থ দুটিতে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। প্রবৃত্তির শৃঙ্খল ভেঙে, লোভের দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে, ভোগকে পায়ে দলে কেবল আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভর করে, আল্লাহর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মানুষ কি করে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে, পশুত্বকে কুরবানী দিয়ে মানবিকতায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে– এই দুটি গ্রন্থে ফররুখ পাঠকদের তা দেখিয়েছেন। এখানে মানবতার সংস্কৃতিকে আমরা দেখেছি– সৌজন্য, ভালোবাসা, সম্ভ্রম, প্রেমের আদর্শ এখানে উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু এটুকুতেই 'আমাদের সংস্কৃতি'র সম্পূর্ণ স্বরূপ উন্মোচিত হয়নি। তিনি যে আরবী ফরাসী শব্দ ব্যবহার করছেন তাতেও সম্পূর্ণ নয়,– 'আমাদের সংস্কৃতি'র স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তাঁর মুসলিম কাহিনী, কুরআন কাহিনী ও মুসলিম রূপকথা ও ইসলামিক পরিভাষা ব্যবহারে।

মহাকাব্যের শুরুটা যে-ভাবে হয় ফররুখ "হাতেম তায়ী"তে তা করেননি। অনেকেই জানেন যে সৈয়দ হামজার "হাতেম তাই"-এর একটি আধুনিক-

www.pathagar.com

ভাষ্য– সম্পূর্ণ রূপান্তরিত কাব্য ফররুখের "হাতেম তায়ী"। কিন্তু "হাতেম তাই" এবং "হাতেম তায়ী"র শুরুটা এক নয়। সৈয়দ হামজা "হাতেম তাই"-এর শুরুটা করেন এইভাবে–

ইলাহী আলামীন আল্লা জগতের সার ॥
চৌদ্দ ভুবন মাঝে যার অধিকার ॥
একলা আছিল যবে সেই নিরঞ্জন ॥
আপনার নুরে নবী করিল সৃজন ॥
মোহাম্মদ নামে নবী পয়দা করিয়া ॥
আপনার নূরে তাঁরে রাখে ছাপাইয়া ॥

আর ফররুখ "হাতেম তায়ী" শুরু করেন এইভাবে–

তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খোদার,–
যে রহতম পেয়ে বাঁচে জিন ও ইনসান– আশরাফুল
মখলুকাত দু'জাহানে, অথবা পরেন্দা প্রাণীকুল

আঙ্গিক ও উপস্থাপনার পার্থক্য থাকলেও এর মধ্যে একটা মিল আছে। সে মিলটা মুসলিম পরিভাষা ও জীবনা-দর্শের। কিন্তু এর বিপরীতটা আমরা দেখি মধুসূদনের "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" এবং "মেঘনাদবধ কাব্য"-এ। একেবারে শুরুতে না হ'লেও "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য"-এর প্রথম সর্গে মধুসূদন "সরস্বতী"কে এইভাবে বন্দনা করেছেন–

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা-মন্দর-দানব-দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ– দেহ এ দাসেরেঃ
এ বাকসাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত– নিরুপম সুধা!

এবং "মেঘনাবধ কাব্য"-এর প্রথম স্বর্গে বলেছেন–

www.pathagar.com

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বালমিকীর রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চ বধু সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ, বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে আসি, দয়া কর, সতি !

মধুসূদন খৃস্টান হ'য়েও তাঁর ধর্ম সংস্কৃতির এখানে মর্যাদা দেননি। এমনকি ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় যখন কবির মুখ দিয়ে বলান–

প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমলমানস সরসবাসিনী
শুভ্রবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা

তখন দেখা যায় সংস্কৃতিতে তিনি ব্রাহ্ম নন হিন্দু এবং তাঁর সংস্কৃতিও অনেকটা দেবদেবীবন্দনার সংস্কৃতি।

বলা বাহুল্য, ভাষার ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে কায়কোবাদের মত মুসলিম কবিও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। ইসমাইল হোসেন সিরাজীও নন। আধুনিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতিতে মুসলিম ভাষা সংস্কৃতি প্রবর্তনের প্রথম বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম মুসলিম কবি রচিত পুঁথির ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন– ফররুখ তাঁকে অনুসরণ করে তাকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠা দান করতে সহযোগিতা করেছেন।

উল্লেখযোগ্য, ফররুখ আহমদ মাইকেল মধসূদন দত্তের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। মধুসূদনের ক্লাসিক কাব্য আঙ্গিক ও ছন্দ নির্মাণের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-চিন্তাদর্শের অনুসারী ছিলেন না। মধুসূদন সাহিত্যকে ধর্ম-চিন্তা বহির্ভূত শিল্পবস্তু হিসাবে দেখতেন– হয়ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

www.pathagar.com

ইসলামেরও অনুরূপ সাহিত্য-চিন্তা ছিল; কিন্তু ফররুখের তা ছিল না; ধর্মকে তিনি সাহিত্যাদর্শের বহির্গত বিষয় হিসাবে মনে করেননি। সে জন্যে তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতির চিন্তা তাঁর ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফররুখ তাঁর সমগ্র কাব্য সাহিত্যে এই সংস্কৃতিকে ধারণ করেছেন এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

রচনা সময়
১৬-১০-৯৩

www.pathagar.com

ফররুখের জীবনাদর্শ

কবিতার দুটো দিক আছে একটি তার বহিরাঙ্গিকের অন্যটি তার বিষয়ের বা অন্তর্বিষয়ের। সাহিত্যের ভাষায় একটি আধারের অন্যাটি আধেয়ের।

কবিতার সৃষ্টি-রহস্য কি জানতে গিয়ে দেখা যায় তা এক বেদনার উৎসার। দু'টি পাখীর মিলন মুহূর্তে পুরুষটি ব্যাধের শিকারে পরিণত হয়। আর্তনাদকারী পাখীটির ক্রন্দন স্পর্শ করে বাল্মিকীকে– আর সেই বেদনার উৎস থেকে জন্মগ্রহণ করে 'রামায়ণ' নামক মহাকাব্য।

অর্থাৎ, যে কোন শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে মমতা প্রেম বা ভালোবাসা হ'চ্ছে শক্তি-প্রেরণা। যে সৃষ্টির মূলে এই বেদনার আবেগ থাকে না সেখানে সৌন্দর্যের মাধুর্য মূর্ত হ'য়ে প্রকাশ পায় না। কাব্য ও সাহিত্য তাই, অথবা অন্য কোন বড় শিল্প, গভীর প্রেম বা ভালোবাসা থেকে উৎপন্ন হয়। তা একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে অথবা ধর্ম, দেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে– অথবা মানুষ, প্রাণী বা প্রকৃতির প্রতি নিবিড় মমত্ব থেকে উদ্ভূত হ'তে পারে।

এদিক থেকে দেখলে বিষয় প্রথমে, আঙ্গিক পরে– আধেয় আগে আধার পরে। ফররুখের কবি জীবনের আলোচনায় তাই ফররুখের কাব্যবিষয় নিয়ে প্রথমে আলোচনার প্রয়োজন। আর এই আলোচনায় ফররুখের জীবনাদর্শের প্রাথমিক বিবেচনা লাভ করা উচিত। ফররুখের কাব্যপাঠে, বিশেষ করে তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' পড়ে আমরা তাঁকে একজন মানব-প্রেমিক রূপে জানতে পাই। তিনি নির্যাতিত নিগৃহীত মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন। সে মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি ইসলামকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে নির্বাচন করেছিলেন।

একটা প্রশ্ন জাগবে! ফররুখের কবিতা পড়ে তাঁকে যেমন মানবপ্রেমিক বলে মনে হয় তেমনি খুব বেশী করে মুসলিমপ্রেমিক মনে হয়। ইতিহাস সাক্ষী তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে লেখনীর সাহায্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' নামক প্রচারধর্মী গানই লেখেননি– "আজাদ করো পাকিস্তান" নামক একটি প্রচারধর্মী কাব্যপুস্তিকা লিখেছিলেন। এতে দশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলির নাম এই : ফৌজের গান, আজাদ কর পাকিস্তান,

www.pathagar.com

ওড়াও ঝাণ্ডা, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, নতুন মোহাররম, পথ, পাকিস্তানের কবি, রাত্রির অগাধ বনে, কারিগর ও জালিম ও মজলুম। এই কাব্য-পুস্তিকার উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে– 'ইসলামের জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন তাদের উদ্দেশে'। এখানে দেখা যায় তিনি খোলাখুলিভাবে মুসলিম স্বার্থকে স্বতন্ত্রভাবে বড় করে দেখেছেন এবং এর প্রতিটি কবিতায় সুস্পষ্টভাবে কোন অলংকারের অন্তরালের আশ্রয় না নিয়েই মুসলমানদের জাগরণের গান গেয়েছেন। যেমন : "ফৌজের গান" এ তিনি বলেছেন–

সামনে চল : সামনে চল
তৌহিদেরি শান্ত্রীদল
সামনে চল্ : সামনে চল্
লক্ষ ভয় করবো জয়
তুলবো ঝড় বিশ্বময়
গড়বো আজ খোদার রাজ
ভাঙবো বাঁধ অমঙ্গল
সামনে চল : সামনে চল।

'আজাদ কর পাকিস্তান'-এ লিখেছেন–

আজাদ করো : আজাদ করো : পাকিস্তান
বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে মরার গান
কণ্ঠ ভরি নাও শিখে আজ
নও জোয়ান
আজাদ কর : আজাদ কর
পাকিস্তান ॥

'ওড়াও ঝাণ্ডা' কবিতায় বলেছেন–

আনো সাম্যের নতুন গান
আনো মানুষের নতুন প্রাণ
আনো উদ্দাম ঝঞ্ঝার গতি
দরিয়ার ঝড় ফেনোত্তাল ॥

জালিমের হাতে পশুর প্রায়

www.pathagar.com

আজো মজলুম মরিছে হায়
ছিঁড়িতে তাদের মরণের ঘের
হও মুজাহিদ আজি সামাল ॥

মোরা মুসলিম সারা জাহান
ভরিয়া গড়িব পাকিস্তান
আজাদীর দিন হবে রঙিন
লভিয়া মোদের রক্ত লাল ॥

'নতুন মোহররম' কবিতায় লিখেছেন–

আজিকে জোহাদ এজিদের সাথে,
দল বেঁধে এসে খুনেরা প্রভাতে
ভাঙো জুলুমের জুলমাত : হোক
জালিমের শিরে বজ্রপাত॥

আজ মুজাহিদ উদ্যত শির
ভাঙবে পাপের সকল প্রাচীর
আজ নির্ভীক জনতা হয়েছে
জেহাদের জোশে রণোন্মাদ ॥

কিন্তু এই কাব্য পুস্তিকার 'পথ', 'রাত্রির অসাধ বনে' 'কারিগর' ও 'জালিম ও মজলুম' উদ্ধৃত কবিতাসমূহের মত সম্পূর্ণ পদ্যধর্মী নয়। যেমন 'কারিগর' কবিতায় তাঁর এই বক্তব্য–

লক্ষ পাথরে গড়া এ পাহাড় ভেঙে হ'ল একাকার,
ঘুম ছেড়ে তুমি ছুটে এস কারিগর !
চলো এক সাথে তুলে নেই হাতে পাহাড় গড়ার ভার
আজ বিরামের নাই তিল অবসর
কাঁধে কাঁধ দিয়ে গড়ে তোল আজ কাতারে শামিল হ'য়ে
বিশাল জামাত বিপুল পাহাড় মোর
গিরিতটচ্যুত পাথরের ব্যথা বাতাস আনিছে বয়ে
কারিগর ! ভাঙো সুমধুর ঘুমঘোর !

www.pathagar.com

মোর পাহাড়ের পাথর নিয়ে কে করিছে ব্যবসাদারী,
কারিগর ! তুমি সন্ধান নাও তার।
প্রবঞ্চকের খোলসে ফিরিছে জালিম অত্যাচারী
অবসর তাকে দিও না ক পালাবার।

এটাকে বলব পর্দা-আশ্রয়ী। এখানে তাঁর বক্তব্য উন্মোচিত মুখাবয়ব নয়।

কিন্তু বলছিলাম তাঁর এই মুসলিম-প্রিয়তা ও মানবপ্রিয়তা কি সমার্থক? ফররুখ 'ওড়াও ঝান্ডা' কবিতায় বলেছেন– 'আনো সাম্যের নতুন গান'। এই সাম্য ইসলামী আদর্শের সাম্য। এর সঙ্গে কি সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সাম্যের তফাৎ আছে? একই কবিতায় ফররুখ বলেছেন– 'জালিমের হাতে পশুর প্রায়/আজো মজলুম মরিছে হায়।' প্রশ্ন জাগবে : এই জালিম কি শুধু মুসলিম সমাজের জালিম এবং এই মজলুম কি শুধু মুসলিম মজলুম? আমরা যখন ফররুখের 'রাত্রির অগাধ বনে' কবিতায় পড়ি–

তোমার পাঞ্জার সাথে জালিমের শাণিত পাঞ্জার
হবে নাকি সুকঠিন প্রাণান্ত প্রয়াস !
হবে নাকি বোঝাপড়া জীবন-মৃত্যুর !
হবে নাকি ব্যর্থতার চাপাকান্না
জেহাদের ঝড় সাইমুম:
জাগো জনতার আত্মা ! ওঠো, কথা কও !

এখানে যে জনতাকে তিনি সম্বোধন করেছেন সে কি নির্বিশেষ মানব জনতা না মুসলিম জনতা?

"সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের 'লাশ' কবিতায় তিনি যে জনতার কথা উল্লেখ করেছেন সে জনতা মানবজনতা। ঐ কবিতায় তিনি যে মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন সে মানুষ নিপীড়িত বিশ্বমানুষ। ঐ কবিতায় তিনি যখন বলেন–

এ কোন্ সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে
করে পরিহাস ?
কোন ইব্‌লিশ আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস?

www.pathagar.com

কোন আজাজিল লাথি মারে
মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে
কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে!

তখন অনুমান করতে দেরি হয় না যে, কবি কোন বিশেষ সমাজের মানুষ নয় বিশ্ব সমাজের মানুষকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলছেন। তিনি যে সভ্যতার কথা বলেছেন সে সভ্যতা যে বিশ্বের বর্বর সভ্যতার ছদ্মবেশ তা অনুমান করা সহজ। তাহলে এই বিশ্ব মানুষ থেকে ফররুখ কেন মুসলিম মানুষ সমাজে প্রত্যাবর্তন করলেন? ফররুখের এ প্রত্যাবর্তন কি বৃহৎ আকাশ থেকে ক্ষুদ্র আকাশে প্রবেশ?

"ফররুখ রচনাবলী"র ১ম খণ্ডে সম্পাদকবৃন্দ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের বক্তব্যে আমরা জানতে পারছি–

> প্রথম জীবনে ফররুখ আহ্‌মদ ছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' মানবতাবাদী কমরেড এম. এন রায়ের অনুসারী।

এখানে অবশ্য স্ব-বিরোধী উক্তিও আছে। তাঁরা এর পরেই বলেছেন– "মার্কসবাদে তিনি কখনো বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন কি না, বোঝা যায় না।" বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যিনি জড়িত থাকেন তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হবেন না, এটা অবিশ্বাস্য। আমরা ধরে নিতে পারি কবি জীবনের প্রাথমিক পর্বে নাস্তিক্যবাদী জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন– গভীরভাবে না হলেও। এ কথাকে সমর্থন করে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ তাঁর "ফররুখ আহ্‌মদ কবি ও ব্যক্তি" প্রবন্ধে লিখেছেন–

> গোড়াতে ফররুখ আহ্‌মদ কোন বিশেষ জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, মুসলিম জীবন এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না তেমন ঘনিষ্ঠ। অন্তত তাঁর আগেকার কবিতায় এর রূপায়ণ ঘটেনি। মানবতাবাদী এই কবি তখন নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি চাইতেন বটে, কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ তাঁর ছিল না, যদিও তিনি বলতেন যে নাস্তিক্য প্রবণতাই তাঁর মধ্যে তখন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য পুরোপুরি নাস্তিক না হলে কম্যুনিস্ট হওয়া যায় না; অতএব নাস্তিক্য প্রবণতায় আবদ্ধ ফররুখ সংক্ষিপ্তকালের জন্যে হ'লেও কম্যুনিস্ট হয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে তিনি নিবদ্ধ থাকতে পারেননি। কারণ কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে তিনি মানবকল্যাণের যে মন্ত্র শিখেছিলেন সেটা ছিল তাঁর চরিত্র-বিরুদ্ধ অপরিণত মানসের স্বপ্ন রোমাঞ্চের প্রতি আকর্ষণ; মানুষের নতুনের প্রতি যে স্বভাবগত আকর্ষণের আবেগ থাকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই আবেগের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর সামনে অভিজ্ঞতার জ্ঞানের দর্পণ ধরা হ'ল তখন তাঁর মন থেকে বিভ্রান্তির কুয়াশা পালাল। তিনি ইংরেজী ও আরবীতে শিক্ষিত পণ্ডিত অধ্যাপক আবদুল খালেকের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে হার মানেন এবং আলোর জ্যোতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই রূপান্তরিত ফররুখের সৃষ্টি 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'নৌফেল ও হাতেম' এবং 'হাতেম তা'য়ী'। তিনি অবিলম্বে বুঝতে পারেন, ইসলামের একটি ভগ্ন অংশ, আল্লাহ-বিযুক্ত অংশ নিয়ে কম্যুনিজম সারা বিশ্বে মানবতা ও শান্তির ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছে। যেটা সত্যিকার অর্থে একটা সত্যকে চাপা দেওয়ার অসত্য প্রচার। কারণ যে আদর্শে আল্লাহ-ভীতি থাকে না সে আদর্শ অন্যায় ও উচ্ছৃখলতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং পরোক্ষভাবে পৃথিবীতে জন্ম দেয় বর্বরতা ও অমানবিকতা। ধর্ম নিয় ধর্ম-ব্যবসা করে বলে ধার্মিকদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের যে প্রচার– সে প্রচার যে শধু অধার্মিক সৃষ্টি করে না অপরাধীও সৃষ্টি করে সে বিশ্বাসে জাগতে ফররুখের দেরী হয়নি; এবং ফররুখ যে মানবতার জয়গান গাইতে চেয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক যে ইসলাম এবং তার একমাত্র বাহন, সেটা ফররুখ শুধু উপলব্ধি করেননি তাতে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এটাই ফররুখকে নতুন কবিতে উর্ত্তীণ হওয়ার– তাঁর কাব্যের আত্মার ও শরীরের রূপকল্পনা পরিবর্তনের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। ফররুখের বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'প্রতিক্ষণ'-এ ফররুখ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই বক্তব্যই পেশ করেছেন। নব আদর্শে দীক্ষিত ফররুখের কবিতার ছন্দ নতুন তরঙ্গে নেচে উঠল। তাঁর কবিতাকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করলো তার সৌন্দর্য মহিমা।

ফররুখ কি সকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন? না এ শুধু বিশিষ্টের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া না উচ্চতর চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া! কারণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে পরিচিত যে মানুষ প্রকৃত মানুষ হওয়ার বাণীর চর্চা করেছেন

www.pathagar.com

এবং তা দিয়ে সমাজে সাম্য শান্তি ও মানবতা প্রচার করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেটা সামান্য আকাশ নয়– সেটা অসামান্য আকাশ। তাই বলা যায়, ফররুখ মহাকাশ থেকে ক্ষুদ্র আকাশে নামেননি– ক্ষুদ্র আকাশ থেকে বৃহৎ ও মহৎ আকাশে ওঠার চেষ্টা করেছেন। এই ঊর্ধ্বারোহণই ছিল ফররুখের জীবনাদর্শ।

এই প্রবন্ধে আমি পাকিস্তান আন্দোলন এবং তার সঙ্গে ফররুখের সম্পৃক্তি এড়াং তার উপর কবিতার কথা উল্লেখ করেছি। আমার ধারণা ফররুখের জীবনালোচনায় অথবা জীবনাদর্শের আলোচনায় এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার নয়। বিষয়টি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। কারণ বিশ ত্রিশ চল্লিশের দশকে এই আন্দোলনে উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমান জড়িয়ে পড়েছিল। তারা উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মজলুম মানুষে পরিণত হয়েছিল– ফররুখ তাঁর কবিতায় যে মজলুম মানুষের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। উপমহাদেশে ১৭৫৭-এর পর যখন ইংরেজ শক্তির হাতে সিরাজউদ্দৌলার পতন হয়– মুসলিমরা ঐ মজলুম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য অনেক চিন্তাশীল মুসলিম মনীষীদের মত ফররুখও ভাবতে পারেননি ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে মুসলমানদের মুক্তি ঘটবে। বরং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ও শিক্ষায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সংখ্যালঘু নাগরিক হিসাবে আরও দুর্দশা ও দুর্গতিতে পড়তে হবে। তাদের সেই নিপীড়নের শিকার হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে যে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল ফররুখ সে আন্দোলনকে সঠিক ও যথার্থ ভেবেছিলেন। মুসলিম জাতির ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ঐ পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। এটাকে তিনি কখনও ভুল সিদ্ধান্ত বলে ধারণা করেননি শুধু নয়, তখনকার তরুণ বহু শিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে তিনি সেই আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।

প্রশ্ন জাগতে পারে, পাকিস্তান আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ ফররুখ পাকিস্তান ও ইসলামকে কি এক করে দেখেছিলেন? পাকিস্তান যে ইসলামের লালনভূমি হবে এটা ফররুখের স্বপ্ন কল্পনায় ছিল। ফররুখ যে পাকিস্তান চেয়েছিলেন সে পাকিস্তান জুলুম মুক্ত মানবতার স্বর্গরাজ্য– যেখানে লাঞ্ছনা বঞ্চনার কোন চিহ্ন থাকবে না– নিপীড়ন উৎপীড়ন ও নিগ্রহের কোন দাগ থাকবে না। সেখানে সাম্য ও শান্তির অপার বসন্ত বায়ু প্রবাহিত হবে; এক মানব কল্যাণকর রাষ্ট্রের হবে অধিষ্ঠান; যা সত্যিকারভাবে রূপায়িত করবে পরম মানবতাবাদী শান্তির ধর্ম

www.pathagar.com

ইসলামের। কিন্তু বাস্তবে তিনি তা দেখতে পাননি। সুতরাং ইসলাম ও পাকিস্তান তার কাছে সমার্থক ছিল না। ইসলামের লালন ভূমি বলে যে পাকিস্তানের তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন তাঁর চোখে ধূলিমলিন হয়ে গিয়েছিল। বলিষ্ঠ লেখনির মাধ্যমে তিনি তাঁকে কলুষতামুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। গভীর নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা সেই চিন্তার রূপায়ণ "নৌফেল ও হাতেম" ও "হাতেম তা'য়ী" এই দুই নাট্যকাব্য ও কাব্যগ্রন্থে তিনি পাকিস্তানী শাসকদের মানবতার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, হাতেমকে মানবতার প্রতীক হিসাবে রূপায়িত করে। রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যে শিক্ষা, পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেননি। মানবতার মহান আদর্শের মহিমাঋদ্ধ ইসলামী জীবনের শিক্ষা গ্রহণ না করে তাঁরা আত্মসুখঅভিমুখী অনৈক্য সৃষ্টিকারী এক ভোগসর্বস্ব-স্বার্থপর জীবনের চর্চা করেছিলেন– তার ধ্বংসকারী স্বরূপ ও তার শেষ পরিণামের কথা চিন্তা করেননি। ফররুখ-জীবনে সেটা ছিল বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা ফররুখের জীবনকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিঃশেষ করেছে। সেই পাত্র যখন ভেঙে গেলো তখন কঠিন আঘাতে ফররুখের হৃদয় ভেঙে গেলো। এটাই যে ফররুখের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল তাতে অন্ততঃ আমার সন্দেহ নেই। তাঁর জীবৎকালে তাঁর এত বড় পরাজয় হবে তিনি ভাবতে পারেননি। দু'শো বছরের অক্লান্ত সংগ্রাম ও সাধনার পরে মুসলমানের আত্মরক্ষার জন্য যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল– অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, নির্বুদ্ধিতা এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে চোখের সামনে তার ধ্বংস হওয়াটা ফররুখ সহ্য করতে পারেননি। বলাই বাহুল্য, মূর্খতা-বন্দী পাকিস্তানী শাসকদের পক্ষ তিনি কখনই গ্রহণ করেননি। তিনি চিরকালই উৎপীড়ক, জালিম এবং মানবতাদলনকারীদের ছিলেন বিরুদ্ধবাদী। তার পরিচয় ছদ্মনামে লেখা তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ শুধু নয়; তার পরিচয় তাঁর কবিতা 'লাশ'; তার পরিচয় পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা অজস্র কবিতা– তার পরিচয় মহা মানবতা ও সাম্য-শান্তির ধর্ম ইসলামকে মানুষের একমাত্র ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার তাঁর নিরন্তর এবং অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা। সে জন্যে আপাত-দৃষ্টিতে যা মনে হয় যে, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন সে ব্যর্থতা তাঁর আদর্শিক চিন্তার ব্যর্থতা বা পরাজয় নয়– তাঁর মৌল আদর্শের পরাজয় হয়নি তাঁর বিপ্লবী চিন্তা এবং তাঁর ভাষা ছন্দ ও শব্দের মধ্যে তা জীবন্ত এবং জীবিত হয়ে আছে। তা মরেনি, তা অনাদি আয়ু লাভ করেছে। ফররুখের দেহের মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু তাঁর রূপ বা আত্মার মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়নি- তাঁর আদর্শেরও মৃত্যু হয় নি। সে আদর্শ অমর! কারণ তিনি যে আদর্শের অনুসারী ছিলেন তা ইসলাম শান্তিকামী বিশ্বমানুষের কামনা।

রচনা সময়
২-৬-৯৪

www.pathagar.com

আত্মস্বরূপে ফররুখ

আধুনিক সাহিত্যের একটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল অসম্ভব উদারতা। এই চিন্তায় ধর্ম ভীষণ প্রতিপক্ষ বলে আধুনিক লেখকেরা ধর্মের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার প্রয়াসী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী যাঁরা তাঁরা বলেন যে কেবল সাহিত্য পড়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না– সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় সাহিত্য-বৃত্তের বাইরের উপাদানের। ধর্ম বা ধর্মাদর্শ এক সময় এই উপাদান যোগাত। কিন্তু ধর্মকে যখন দল বেঁধে ঝেঁটিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হলো তখন সেই শূন্যতা পূরণের জন্যে তারা আমদানী করল ধর্মশূন্য জীবনের অভিজ্ঞতা। ধর্মের স্থান অধিকার করল যৌনবাদ ও অর্থনীতি। পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান ধারণা করা হল, এই দুই বিষয়ের সমাধানের মধ্যে নিহিত আছে। ধারণা করা হল এই দুই জটিল বিষয়কে কেন্দ্র করে পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সমাজের প্রচলিত নীতির ও বিধানের নিগড় ভেঙে, সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করে। সমস্ত ঘৃণা, বিদ্বেষ, আভিজাত্যবোধ, স্বার্থপরতা দূর করে, বিশেষ করে ধর্মশাস্ত্রীয়, বিধিনিষেধকে উৎপাটন করে মানুষকে সর্ববন্ধনমুক্ত এক বিশাল স্বাধীনতার সুযোগ দিয়ে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারলেই নিশ্‌ছিদ্র উদার মানবতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা হল, যে-সব মূল্যবোধের উপর মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা দিয়ে সভ্যতা স্বাধীন মানুষ গড়ে তুলতে বা স্বাধীন সমাজ বা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেনি। যে ধর্ম মানুষকে মুক্ত করতে এসেছিল সে ধর্মই মানুষের কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে। ধর্ম মুক্তির মরুদ্যান হয়নি হয়েছে মুক্তির মরীচিকা। মানুষ তাই প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠার, আপন ব্যক্তিত্বে বিকশিত হওয়ার সমাজ গড়ে তুলতে চাইল। জীবনের নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে টান দিয়ে নিয়ে আসা হল এক স্বপ্নের ও আশার জগতে। আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের বাগিচা করতে গিয়ে তার আত্মরক্ষার উপায় সেখানে দেখানো হল না।

যৌননীতি ও অর্থনীতি এ দুটোই জৈববাদ ও জড়বাদের ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত। এই বাস্তবতা বা অতি বাস্তবতার মধ্যে মানুষের জীবন যে কিছুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না উপর্যুক্ত চিন্তায় নিবিষ্ট মনীষীরা তা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারেননি এবং এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্পী সাহিত্যিকরাও না । এঁরা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে নতুন সমস্যার উদ্ভব দেখে বাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতার দিকে ঝুঁকলেন। মানুষ যে স্বপ্ন দেখে এবং মানুষ যে স্বপ্ন দেখবে

www.pathagar.com

এবং অর্থনীতিক এবং যৌন সমস্যা সমাধানের পরও মানুষের প্রাকৃতিক স্বভাবে যে আরও অনেক গভীর সমস্যা থেকে যায় এই পরাবাস্তবতাবাদীদের মস্তিষ্কে তার সুর বেজে ওঠে এবং তারই যন্ত্রণায় তারা ঝুঁকে পড়ে অস্তিত্ববাদের দর্শনে। কিন্তু যন্ত্রণার প্রকৃতপক্ষে কোন উপশম হয় না। মুস্কিল হয় ব্যক্তি তার নিজের স্বভাব বিশ্লেষণ করে যে সমাধান পায়, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির স্বভাবের সঙ্গে তার সাযুজ্য না থাকাতে তার নিজস্ব নির্মিত জগতের মধ্যে তার ধারণাকৃত সমস্যার সমাধান মেলে না। নিয়ন্ত্রিত বিধানের বাইরে উদারতা যে স্বাধীনতার জন্ম দেয় সেখানে মানবতার পাশে মূর্তিমান হয়ে ওঠে আর এক পাশবতা। ফররুখ সম্ভবত তাঁর নিজস্ব মেধার শক্তিতে অথবা কোন মনীষীর ব্যাখ্যায় এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফররুখ বুঝেছিলেন প্রচলিত যে বিধানের মধ্যে তাঁর জীবনের তার বাঁধা সে বিধান বহু সহস্র মনীষীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারাৎসার; এবং সে বিধান মানুষের সৃষ্ট নয়– তা আল্লাহরই সৃষ্টি। জগতের পল্লবিত সকল সমস্যার সমাধান এই বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

অতি উদারতার পর্বত চূড়ায় পৌঁছে আধুনিক বিশ্বে এমন কিছু সাহিত্য ও কাব্যের সৃষ্টি হয় যা সত্যিকার অর্থে মানুষকে কোন স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য দেখাতে পারল না। বোদলেয়ার পারেননি, লরেন্সও না। এলিয়ট তাঁর Riligion and Literature প্রবন্ধে তাই মার্জিত তিরস্কারের ভাষায় লরেন্সকে লক্ষ্য কওে বলেছেন–"A writer like D. H. Lawrence may be in his effect either beneficial or pernicious. I am not sure that I have some pernicious influence myself."

এ কথার নির্গলিতার্থ এই দাঁড়ায় যে, লরেন্স উদার মানসিকতার শরীর সৃষ্টি করতে গিয়ে অজ্ঞাতে তার ফুসফুসে যক্ষ্মার বীজ রোপণ করেছেন। ঔদার্যের বীজ দিয়ে তিনি যে সোনার গাছ তৈরী করতে চেয়েছিলেন তা দিয়ে সোনার গাছ তৈরী হয়নি, হয়েছে বিষের গাছ।

এটা এক দিক, আর এক দিক হ'ল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিতে গিয়ে ব্যক্তিত্বকে হারানোর দিক। চরম উদারতায় নিজস্বতা হারাতে হয় ব্যক্তিত্বকে এবং চরিত্রকে।

আমরা ত্রিশের কবিদের দেখেছি, আমরা চল্লিশের কবিদের দেখেছি। আমরা দেখেছি কোন আদর্শে নিবেদিত হয়ে, উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, কোন লক্ষ্য সামনে নিয়ে যারা ফসল ফলিয়েছেন কেবল তাঁরাই স্বতন্ত্র চারিত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যাঁরা তা করেননি এবং তাঁদের অনুসরণ করে যাঁরা

www.pathagar.com

তা করেননি তাঁরা ক্রমেই বিস্মরণের চাদরে ঢাকা পড়েছেন। অধিকাংশ মানুষ এদেশের মাটিতে প্রোথিত ধর্মের গভীর শিকড়ের সঙ্গে আত্মিকভাবে, আত্মীয়ভাবে সংযুক্ত। সেই শিকড় অগ্রাহ্য করে যারা উদারতার বলয়ে আবর্তিত তাদের চারিত্র-স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মত নয়। এরা মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কথা সুন্দরভাবে লিখছেন কিন্তু একটা কৃত্রিম ভাবের মধ্য দিয়ে তার উদ্ভব হচ্ছে। সেখানে যথার্থ আবেগের জন্ম হচ্ছে না– কারণ বহুজনের আবেগে ঝঙ্কার তোলার মত প্রেম সেই আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ফররুখ আহ্‌মদ এই নির্বুদ্ধিতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বিশিষ্ট হতে পেরেছিলেন, হতে পেরেছিলেন চরিত্রবান। অসম্ভব উদার হতে গেলে তিনি তা পারতেন না বলে আমার ধারণা এবং আমার এও বিশ্বাস ঐ চিন্তার স্রোতধারায় গা ভাসালে তাঁর আদর্শের সঙ্গে একান্ত আত্মীয়দের সঙ্গে, তাঁর প্রকৃত পরিবারের সঙ্গে, তাঁর বিচ্ছেদ ঘটত, তিনি তাঁদের আত্মা থেকে নির্বাসিত হতেন যেমন তিনি একই ভাষাভাষী পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী সমাজ থেকে নির্বাসিত।

"হে বন্য স্বপ্নেরা" কাব্যগ্রন্থে যে ফররুখকে আমরা পাই তাঁর কণ্ঠে মানবতার গান উচ্চারিত হয়েছে। যে আধুনিক ছন্দে ও ভাষার অপূর্ব লালিত্যে সেখানে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন তা অনেক আধুনিক কবিরও চিত্তে ঈর্ষা জাগাতে পারে। এই যে তিনি লিখছেন–

> ঘোলাটে দিনের প্রান্ত শঙ্কিত আঁধারে
> পাখীর কাকলি নাই স্তব্ধতার ভয়াল শ্মশান
> রেখায়িত হ'ল এ আকাশে।
> ঐ আসে,
> ঐ আসে উদ্যত ফণা সরীসৃপ
> ও কি মৃত্যু প্রেতচ্ছায়া ও কি কোন অমানুষী জীব
> অথর্ব বধির
> মৃত্যু দোলা তার।
> পৃথিবী হ'ল যে একাকার–
> মুক্তির সরণি কই সে-কথাও জাগে না ত মনে।
>
> (দিন : হে বন্য স্বপ্নেরা)

অথবা

> হে ক্ষুধিত অজগর ! দাঁড়ায়েছ এ কোন সংকটে,

www.pathagar.com

চেয়ে দেখ বালিয়াড়ি, আলো নাই শর্বরীর তটে,
তবুও চলেছ একা দ্বিধাহীন পিশাচের পিছে।
একে একে তিমিরের ক্ষুব্ধ গ্রাসে সকলি সঁপিছে
বন্দী মন ! কোথায় চলেছ তবে এ কোন সংকটে?
পিছনের পথ দেখ মুছে আসে মৃত্যুনীল পটে।
(সন্ধ্যার জনতা : হে বন্য স্বপ্নেরা)

এর ভাষার মধ্যে, এর কল্পনার ও উপমার কারিগরির মধ্যে যে কবি-সত্তার বিকাশ ঘটেছে তার শক্তি সন্দিগ্ধ হওয়ার মত নয়। প্রশ্ন উঠবে ফররুখ যদি এইখানে আবদ্ধ হয়ে যেতেন অথবা এই পরিচিতির সড়কে যদি তাঁর পদচারণা দীর্ঘায়িত হত তাহলে কি তিনি যে বিশিষ্ট চারিত্র্য আজ অর্জন করেছেন, যে ব্যক্তিত্বের স্বরূপে তাঁর আত্মউন্মোচন ঘটেছে সে চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব তিনি লাভ করতে পারতেন কি? উদার হতে গিয়ে উদরসর্বস্ব চেতনায় নিমন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা কি তাঁর থাকত না? সত্যিকার আবেগ বিশেষ পাত্রের প্রেমের আবেগ থেকে উৎসারিত হয়। সেই প্রেম ও আবেগ তাঁর পক্ষে লাভ করা সম্ভব হত কি? আরও দশ জনের মত তিনিও কি কৃত্রিম প্রেমের স্রোতে ভেসে বিস্মৃতির অন্ত রালে চলে যেতেন না? যে জড়বাদী সভ্যতার ধ্বংস কামনা করেছেন সেই উদরসর্বস্ব চিন্তার আবর্তে তলিয়ে যেতেন না কি তিনি ? নিঃসন্দেহে ঐ পথ তাঁকে পথহারাদের দলে ভিড়িয়ে দিত এবং তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হত না 'পাঞ্জেরী', 'সিন্দাবাদ', ও 'সাত সাগরের মাঝি'র মত অমর কবিতা বা "হাতেম তায়ী"র মত অমর কাব্য।

উদরসর্বস্ব চিন্তার উদারতা ত্যাগ করার সাথে সাথে দেখা যায় সত্যিকার ফররুখের আত্ম-উপলব্ধি এবং আত্ম-আবিষ্কার ঘটেছে। সুনির্দিষ্ট পথ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর আবেগে এসেছে গতি এবং জ্যোতি; বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠতা, এসেছে রূপের ও গুণের ভিন্নতা; সাধারণত্ব ছাড়িয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন অসাধারণত্বে; তিনি লাভ করেছেন সত্যিকার কবির নিয়তি।

মধুসূদন খ্রীস্টান হয়েছিলেন, সাহেবী পোষাকও পরেছিলেন, এমনতর বাক্যও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন যা তাঁর পূর্ব-পুরুষদেও ধর্ম বিরোধী, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ভোলেননি, ভোলেননি তাঁদের রচিত কাব্যগাঁথা ও পুরাণ। এই প্রেম তাঁকে বাংলার কবি করে তুলেছিল এবং হিন্দুবাদে বিশ্বস্তরা তাঁকে ঘৃণা না করে 'শ্রীমধূসূদন' করে ঘরে তুলেছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মধুসূদন সত্যিকারভাবে উদার হয়ে ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হননি বলেই বিশিষ্ট হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ফররুখও তেমনি আধুনিক গড্ডলিকা স্রোত থেকে নিজের ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন করেই বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্য অর্জন করেছেন, হয়ে উঠেছেন ভিন্ন, স্বতন্ত্র, একক– সব বড় কবির যেটা শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রচনা কাল
১০-১০-৯৪

www.pathagar.com

ফররুখ-কাব্যে তের শ' পঞ্চাশ

তের শ' পঞ্চাশে (ইংরেজী ১৯৪৩-এ) বাংলাদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং যে দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা যায় বাংলা সাহিত্যে তার চিত্র কতটুকু পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই মহা দুর্ভিক্ষের তেমন বিশদ বর্ণনা কোথাও দেখি না। শিল্পী জয়নুল আবেদীন তাঁর বিখ্যাত তুলিতে এই দুর্ভিক্ষের পরিণতির কিছু হৃদয়বিদারক ছবি এঁকে অমরত্ব লাভ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশনি শঙ্কেত' উপন্যাসে এই দুর্ভিক্ষের দারুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই কাহিনীর করুণ চিত্র রূপায়িত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ছায়াছবিতে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এর কিছু কিছু ছবি কোন কোন কবির কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', 'স্বাগত' 'বর্ষশেষ' কবিতায় এই দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । যেমন–

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে–
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধানবোনা জমি আছে পড়ে।
* * * *
রাখালের দেখা নেই–
কোথাও গরুর পাল ওড়ায় না ধূলো ;
ঢেঁকিতে ওঠে না পাড় ;
একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে ।
(স্বাগত : পদাতিক)

অথবা

পথে পথে ভগ্নস্তূপ,
চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক ।
দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহূর্মুহূ কড়া যায় নেড়ে
রক্তলোভাতুর শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে ।
দিশাহীন জীবনের গোলক ধাঁধায়
দু'মুঠো অন্নের মোহে
গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে ।
ভিটা শূন্য প'ড়ে

www.pathagar.com

আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধূলি ।
(বর্ষশেষ : পদাতিক)

সুভাষের চেয়ে বয়সে কিছু বড় সমর সেনের কিছু কবিতায় দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত ঘটেছে । একটি উদাহরণ–

গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই
কঙ্কালে ভরেছে দেশ ।
* * *
দু'কোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাঙলা দেশে ।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
নিবিড় মিতালী মহাজন ও শকুনে ।
(২২শে জুন : সমর সেনের কবিতা)

এঁদের চেয়ে বয়সে অনুজ সুকান্তের কবিতাতে একটু গভীর তীব্রতায় দুর্ভিক্ষের সুর ধরা পড়ে। 'মনিপুর' শীর্ষক কবিতায় সুকান্ত লিখছেন–

দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে–
এখনো শত্রুকে ক্ষমা ? শত্রু কি করেছে ক্ষমা বিদ্ধস্ত বাংলাকে।

একটা ঘটনা কবিকে কতটা আবেগোদ্বেল করেছে কবিতার উদ্ধৃত পংক্তিতে সম্পৃক্ত হয়েছে তার স্বাক্ষর। দুর্ভিক্ষ সুকান্তর আবেগকে যে দুর্দম ক'রে তুলেছিল সুকান্তের 'বোধন' তার স্বাক্ষর। সুকান্ত দুর্ভিক্ষের উপর একটা গোটা কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটির নাম 'বিবৃতি'। শুধু দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমার মনে হয় ফররুখ আহ্মদের পরে কেবল সুকান্ত একটা গোটা কবিতা লিখেছেন এবং অন্যদের মত সেখানে ফররুখের মত কোন শিল্পের আড়াল দেয়ার চেষ্টা নেই। দুর্ভিক্ষের বিশদ বর্ণনাময় কবিতাটির কিয়দংশ এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করলাম–

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল ।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ ;

www.pathagar.com

বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু'পাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্ততঃ ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে ।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত মুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে ।

আরও কারও কারও কাব্যে বা সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের চিত্র আঁকা হয়েছে এই মুহূর্তে যা আমার স্মৃতিতে নেই। তবে এর পরে যাঁকে দুর্ভিক্ষ সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠিত, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল তিনি ফররুখ আহ্‌মদ। ফররুখ কাব্যে এই দুর্ভিক্ষ মূর্ত হ'য়ে ওঠা নিয়ে আলোচনা করার আগে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে দু'জন মনীষীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে লিখছেন–

> "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা থেকেই দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের, বিশেষ ক'রে খাদ্য দ্রব্যাদির দাম দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪২ সালে যখন জাপানী হামলা ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, সে সময়ে জাপানী হামলার প্রতিরোধকল্পে বৃটিশ সরকার বিদেশী সৈন্য ভারতে আমদানী করেন। তাদের খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের যে অভিযান চালানো হয়, তার ফলে ধান-চাউল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দেশের নাগরিকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তার পর বৎসর জাপান যখন বর্মা দখল করে একেবারে ভারতের উপকণ্ঠে এসে হামলার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন বৃটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে বাংলাদেশের ধান-চাউল নষ্ট করে ফেলেন। এতে দেশ দারুণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। এটাই পঞ্চাশ সালের (১৩৫০ বাংলা সন) মন্বন্তর নামে খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।"

এ সম্পর্কে মরহুম আবুল মনসুর আহ্‌মদ তাঁর "রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" গ্রন্থে লিখেছেন–

> "নাযিম মন্ত্রিসভার আমলেই ১৯৪৩ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে (বাঙলা ১৩৫০ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে) বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা

www.pathagar.com

ধ্বংসকারী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অনেকের মতে এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১২৭৬ বাংলা সাল) চেয়েও ব্যাপক ও দুর্বিষহ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতার ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময় আমরা প্রধানতঃ যানবাহনের অভাবে কলিকাতার বাইরে যাইতে পারি নাই। কাজেই মফস্বলের দুর্ভিক্ষের দুর্বিষহ চিত্র আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। শুধু মফস্বলে যাইতে পারি নাই, তাও নয়। শহরের ভিতরেও আমরা পায় হাঁটিয়াই কাজকর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তা করিতে গিয়া কলিকাতা শহরের রাস্তাঘাটে সেদিন যা দেখিয়াছিলাম তাই এতদিন পরেও বিষম যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের মতই স্মৃতিপটে উদিত হয় এবং গা শিহরিয়া উঠে। অভুক্ত নিরন্ন রুগ্ন অস্থি-চর্মসার উলঙ্গ নর-নারীর মিছিল আমরা শুধু এই সময়েই দেখিয়াছি।... এই দুর্ভিক্ষে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।... আসলে আকালের কারণ ঘটাইয়াছিলেন ভারত সরকার। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অন্যতম পন্থা হিসাবে তাহারা বাঙলার চাউল যতটা পারিলেন 'সংগ্রহ' করিয়া বাঙলার বাইরে সুদূর জব্বলপুরে গুদামজাত করিলেন। জাপানীদের হাত হইতে দেশী যানবাহন সরাইবার মতলবে 'ডিনায়েল পলিসি' হিসাবে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্য অচল করিয়া দিলেন। চরম প্রয়োজনের দিনেও ভারত সরকার বাংলা হইতে নেওয়া চাউলগুলি ফেরত দিলেন না। বাংলা সরকার (নাজিম মন্ত্রিসভা) যখন বিহার হইতে উদ্বৃত্ত চাউল খরিদ করিতে চাহিলেন তখন বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু নেতারা চাউল সরবরাহের প্রতিবাদ করিলেন। কেউ কেউ স্পষ্টই বলিলেন, খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ কেমন করিয়া পাকিস্তান দাবি করে তা শিখাইতে হইবে।"

উপরে দুর্ভিক্ষের কারণ, দুর্ভিক্ষজনিত কারণে বাংলার অবস্থা, বাংলা সাহিত্যে ও ছায়াচিত্রে তার রূপায়ণের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও চিত্রায়ণ করে দেখানো হ'ল । এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমি দেখাবো ফররুখ কাব্যে এই দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর কিভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং ফররুখের কাব্য-মানস এই দুর্ভিক্ষ দ্বারা কতটা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হ'য়েছে এবং এই দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে কি ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে সে মানস বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃপক্ষে তের শ' পঞ্চাশ ফররুখকে মানুষ সম্বন্ধে শুধু নতুন ধারণাই দেয়নি মানুষের সভ্যতার গুণাগুণ পরিমাপ করার নতুন চোখও দিয়েছিল। ইতিহাস পড়লে বা জানলে মোটামুটি

www.pathagar.com

আঁচ করা যায় যে তের শ' পঞ্চাশের কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বিদেশী শাসন এবং পরাধীনতাজনিত কারণে মানুষের মানবিক চেতনার সুপ্তিমগ্নতা। বিদেশী শাসন যে অন্যতম কারণ এটা খুব কম বয়স্ক সুকান্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন (সুকান্তের বয়স তখন সতের)। সে জন্যে 'বিবৃতি'তে তিনি লিখছেন–

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসক
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকট-নাশ

ফররুখ আহ্‌মদ-এর চোখ শুধু বিদেশী শাসনকে অন্যতম কারণ মনে করল না সে তার কারণ হিসেবে দেখল সভ্যতাকে– মানুষ যে সভ্যতাকে নিয়ে গর্ব করে সেই সভ্যতাকে। তিনি 'লাশ' কবিতায় সভ্যতাকে প্রথমে বললেন 'স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা', তারপর বললেন, 'জড়পিণ্ড নিঃস্ব সভ্যতা' বা 'জড় সভ্যতা' বা 'মৃত সভ্যতা'। লিখলেন–

স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রুরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী,
রাত্রির আকাশ।

লিখলেন–

জড়পিণ্ড হে নিঃস্ব সভ্যতা।
তুমি কার দাস ?
অথবা তোমারি দাস কোন পশুদল !
মানুষের কি নিকৃষ্ট স্তর !
যার অত্যাচারে আজ প্রশান্তি ;
মাটির ঘর : জীবন্ত কবর
মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরণীর পর !

(লাশ)

লিখলেন–

সু-সজ্জিত তনু, যারা এই জড় সভ্যতার দাস,
যাদের পায়ের চাপে ডুকরিয়া কেঁদে ওঠে
পৃথিবী আকাশ,

www.pathagar.com

তারা দেখে নাকো চেয়ে কী কলুষ
দুর্গন্ধ পুরীতে
তাদের সমগ্র সত্তা পশুদের মাঝে চলে মিশে

(লাশ)

এবং এই শুধু লিখলেন না অর্থাৎ ঐ সভ্যতাকে শুধু দায়ী করলেন না তিনি তার ধ্বংসও কামনা করলেন। সুকান্ত বিদেশী শাসনকে দায়ী করে তাকে ধ্বংস করতে চাইলেন, ফররুখ জড় সভ্যতাকে– যাকে তার মৃত বলে মনে হয়েছে– তাকে দায়ী করে তাকে ধ্বংস করতে চাইলেন। লিখলেন–

হে জড় সভ্যতা !
মৃত সভ্যতার দাস ক্ষীতমেদ শোষক সমাজ ;
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি ;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও ।

(লাশ)

দুর্ভিক্ষ যে ফররুখকে দারুণভাবে বিচলিত, উদ্বেলিত, উৎকণ্ঠিত এবং বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল তা শুধু 'লাশ' কবিতাতে নয় অনেক কবিতায় তার স্বাক্ষর আছে, বিশেষ করে আছে তার মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কাব্যে । ("হে বন্য স্বপ্নেরা" কাব্যের অধিকাংশ কবিতা "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাসমূহের পূর্বে লেখা। "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ১৯৪৪-এ লেখা ; "হে বন্য স্বপ্নেরা"র অধিকাংশ কবিতা বা শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ ১৯৪৩ (১৩৫০)-এ লেখা।) 'হে বন্য স্বপ্নেরা' পড়তে পড়তে মনে হয় তার সমস্ত শরীরে যেন দুর্ভিক্ষের আগুন লেগেছে তার আত্মা থেকে বেরিয়ে আসছে তারই নির্মম আর্তনাদ। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ 'প্রেক্ষণ', 'পরিপ্রেক্ষিত', 'হে বন্য স্বপ্নেরা', 'লক্ষ ধ্বংস স্তূপ', 'আসন্ন শীতে', 'সন্ধ্যার জনতা', 'দিন', 'আর এক দিন', 'কবন্ধ রাত্রি' ইত্যাদি কবিতায় আংশিকভাবে এবং 'দুর্ভিক্ষের সন্তান' এবং 'শকুনেরা' কবিতায় সম্পূর্ণভাবে

www.pathagar.com

চিত্রিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই কাব্যটিতে যে কবিতাকে মনে হয় দুর্ভিক্ষ-স্পর্শ-বিরহিত তাতেও আছে দুর্ভিক্ষের অনুরণন। যেমন 'অনুরণন' কবিতাটির কথাই ধরা যাক । কবি লিখছেন–

অন্ধকারে শুনিলাম
কারা যেন ডেকে যায় মানুষের মৃত নাম,
কারা যেন বলে
কারা যেন চলে
কারা যেন পথ খোঁজে উদ্যত শাবলে।

উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ সরকারকে দায়ী না করে ফররুখ সভ্যতাকে কেন দায়ী করলেন? আসলে ফররুখ সমস্যার মূল কারণের অনুসন্ধান করছিলেন এবং সেই অনুসন্ধানে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের নির্বিবেক হওয়ার কারণ মানুষের জড়বাদী চিন্তা। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, ধর্মহীন আত্মার পক্ষে পশুত্বে উত্তরণ অনেক বেশী সহজ। মানুষের চিত্তে ধর্মবিশ্বাস না থাকলে অন্যায় ও উৎপীড়ন করায় ভয় থাকে না; আর সে ভয় না থাকলে মানুষের পক্ষে পাপ করা সহজ হয়। ফররুখ যে প্রথম জীবনে কম্যুনিস্ট এবং পরে হিউম্যানিস্ট হয়ে সেখানে দৃঢ় অধিষ্ঠিত হতে পারলেন না এটা তার কারণ। তিনি ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেয়েছিলেন। 'সাত সাগরের মাঝি'র 'আওলাদ' কবিতায়– যে কবিতাটিতে তের শ' পঞ্চাশের রক্তলিপ্ত হাতের ছাপ আছে– তাতে তাঁর এই উত্তরিত চিন্তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আওলাদ' কবিতার শেষাংশে ফররুখ লিখছেন–

এবার
ক্লীবের প্রতীক এই মানুষের আদালতে নয়,
শয়তানের কাদামাখা কালো পথে নয়–
এবার আল্লার আদালতে
আমাদের ফরিয়াদ,
ক্ষুধিত লুণ্ঠিত এই মানুষের রিক্ত ফরিয়াদ।

মানুষের জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ দেখে হতাশাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের দুঃখ ও বেদনা দেখে, মানুষের পৈশাচিক বিবেক দেখে হতাশার শিকার হয়েছিলেন ফররুখ, অনেক গাঢ় অন্ধকার তাঁর সামনে পর্বত হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাস দর্শন থেকেই জেনেছিলেন যে অন্ধকারের পরেই আলো আসে। তাই তিনি 'আওলাদ' কবিতায় লিখছেন–

www.pathagar.com

অনেক সভ্যতা জানি মিশেছে ধূলির নিচে,
অনেক সমুদ
কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ
মিশে গেল ধূলিতলে
নতুন যাত্রীর দল দেখা দিল দুর্গম উপলে
উড়ায়ে নিশান
সাথে করে নিয়ে এল জীবনের অশ্রান্ত তুফান ॥

দুর্ভিক্ষের দিনে বাংলাদেশে ফররুখ যে দুর্বৃত্ত দস্যু ও শোষকদের দেখেছিলেন তারা শুধু এই বর্তমানের ইতিহাসের ভিলেন নয়, তারা অতীতের ইতিহাসেরও ভিলেন। একদিন তারা ধূলিতলে মিশে গেছে ভবিষ্যতে আবারও তারা ধূলিতলে মিশে যাবে। তের শ' পঞ্চাশ ফররুখকে এই নিরাশা ও আশার কবি করে তুলেছিল– জড়বাদী চিন্তা থেকে তাঁকে আশাবাদী বা আদর্শবাদী বিশ্বাসীর চিন্তায় উত্তীর্ণ করেছিল।

রচনা সময়
৬-৬-১৯৯১

www.pathagar.com

ফররুখ কাব্যে মানুষ ও শয়তান

এই পৃথিবী বহু দিন ধরে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে নিরত। জীবন চিরকাল ভালো ও মন্দকে নিয়ে। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা চিরদিন মন্দ থেকে ভালোয় উত্তরণের, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে এই ভালো-মন্দ, এই আলো-অন্ধকার মিশে আছে। এই দু'টোকে মিলিয়ে মানুষের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিকে তাই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক দিকে সু-প্রবৃত্তি অন্যদিকে কু-প্রবৃত্তি। এক দিকে মানুষ অন্য দিকে শয়তান। ইসলামের আদর্শ হ'ল এই শয়তানকে হারিয়ে মানুষকে বিজয়ী করা। কু-প্রবৃত্তিকে হারিয়ে সু-প্রবৃত্তিকে জয়ী করা।

এ-জন্যই আমরা ইসলামী রেনেসাঁস বা ইসলামী পুনর্জাগরণের কথা বলি; তখন কথাটার সঠিক অর্থ বিবেচনা করে বলি না বা গভীর অর্থে তাকে নির্দেশিত করি না। চিরকালের সত্য চির জাগরিত। কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু নেই। এর যেমন খণ্ডমৃত্যু নেই তেমনি এর পূর্ণমৃত্যু নেই। তাই এর তন্দ্রাও নেই। তাই এর নিদ্রা নেই। যেখানে নিদ্রা থাকে না সেখানে জাগরণের প্রশ্ন ওঠে না। তবে মানুষ ঘুমায় এবং ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসীরাও ক্লান্তির আক্রমণে ঘুমায়। মানুষের তন্দ্রা আছে, নিদ্রা আছে, মুমূর্ষু অবস্থা আছে এবং মৃত্যু আছে। তাই জাগরণের প্রয়োজন মানুষের, ইসলামে বিশ্বাসীদের, ইসলামের নয়।

এই প্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদের একটি ক্ষুদে নাট্যকাব্যের কথা উল্লেখ করা যায়। এর নাম "ইবলিস ও বনি আদম"। শয়তানের সঙ্গে মানুষের চির-প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবী বারবার যেমন আঁধারের গ্রাসে পরিণত হচ্ছে তেমনি বারবার ঘটছে তার আঁধারের বিদীর্ণ ক'রে আলোয় উত্তরণ। শয়তান বলছে মানুষের বিরুদ্ধে সে তার বিজয়কে সম্পূর্ণ করেছে, মানুষ বলছে এটা তার ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি– তার সাময়িক বিজয় মানুষের হাতে বারবার পরাজয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফররুখের কাব্যছন্দে শয়তান অর্থাৎ ইবলিস বলছে–

অস্বীকার কর কেন, পরাজিত নও!
পূর্ণ মানবতা আজ দুঃসাহসী তোমার মনের

www.pathagar.com

উন্মত্ত কল্পনা শুধু! দেখনি কি ইঙ্গিতে আমার
কপট মুখোশ আজ শবগন্ধী এ পাশবিকতা
অপমৃত্যু খোঁজে কোন জড়বাদী পিশাচের কাছে?
লক্ষ কোটি ভ্রূণহত্যা কেন আজ নরহত্যা নয়?
ক্লেদাক্ত, বিকৃত কেন অর্ধনগ্ন এ চিত্র সভ্যতা?
মুক্তি– স্বপ্ন নয় সে কি স্বকপোল কল্পিত তোমার?
যৌনবিকৃতির পক্ষে করিনি কি জ্ঞানীর জগৎ
পুঁতিগন্ধময়? বিকৃত সভ্যতা আর মৃত্যুমুখী
কৃষ্টির পঙ্কিল স্রোতে শ্বাসরুদ্ধ করিনি কি আমি
বন্দী জনতাকে? ঘৃণ্য সেই পাশবতা আনিনি কি
শ্রান্ত এ শোষণ-রিক্ত, প্রবঞ্চিত, পৃথিবীর বুকে?
দেখনি কি দুনিয়ার প্রতি পথে, প্রত্যেক সড়কে
দানবিক স্বৈরাচারে অপমৃত্যু মানবিকতার?...

শকুনির

যে স্বভাব, যে স্বভাব পিশাচের,– সে স্বভাব আমি
সঞ্চারিত করিনি কি তোমাদের মাঝে? দুনিয়াকে
দু'ভাগে দ্বিখণ্ড ক'রে মারিনি কি খোদার শান্তিকে?
শেষ করিনি কি আমি মানুষের শেষ সম্ভাবনা?

এর জবাবে মানুষ অর্থাৎ বনি আদম বলছে–

পরাজিত নই তবু !

তবু বলি নিঃসংশয়ে,– ফেরাউনি কারুণের ব্যূহ
যেখানে দ্বিখণ্ড হ'য়ে জাগে আজ দীর্ণ মানবতা,
সেই চক্রান্তের বুকে প্রশান্তির নবীন নকীব
তুলেছে নতুন ধ্বনি তৃতীয় শক্তির। সে মাটিতে
দেখি বিশ্ব মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা। জানি আমি
স্খলনের এ অধ্যায় তিক্ত, তিক্ততম; জানি আমি
মুষ্টিমেয় নারী নর নিম্নস্তরে পাশবিকতার
মানুষের সত্তা বুনে জীবনের খোঁজে সার্থকতা
স্বার্থপরতার চক্রে, ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির পর্দায়

www.pathagar.com

ইবলিসের অনুগামী চলে আজও বিচিত্র মুখোশে
নর-রক্ত পায়ী কিম্বা রক্ত-লোভাতুর। তবু জানি
বিকৃতির এ অধ্যায় বিভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া শুধু।
বিকৃত 'সভ্যতা' আর মৃত্যুমুখী পঙ্কিল কৃষ্টির
ঘূর্ণাবর্তে তবু আমি নই হতাশ্বাস। এ বিকৃতি
অতিক্রম করে যাব আমি। প্রাণস্পর্শ দেব আমি
প্রাণহীন জনপদে। নবকৃষ্টি, সভ্যতা নতুন;
নতুন পৃথিবী আমি গ'ড়ে যাব রসুলের রাহে।

ইবলিস ও বনি আদমের প্রগাঢ় যুক্তি-ধৃত বক্তব্যের ভিতর দিয়ে ফররুখ তাঁর নিজের বক্তব্য ও আদর্শটিকে তুলে ধরেছেন। বলা বাহুল্য, ফররুখের সমস্ত বক্তব্য কল্যাণের, ন্যায়ের, সত্যের, সুপ্রবৃত্তির পক্ষে। শয়তানের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে তিনি মন্দের অন্ধকারের, কু-প্রবৃত্তির, মানুষের তন্দ্রাভিভূত অচেতন হৃদয়ের, মানুষের বিভ্রান্তির, তার পদস্খলনের, তার নৈতিক অবক্ষয়ের, তার পাশবিক উন্মত্ততার রূপ আঁকার পরই তিনি তা থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়ার ব্যগ্র প্রচেষ্টার রূপ এঁকেছেন। তাই ইবলিস যখন বলছে–

মানুষের
মস্তিষ্কে, হৃদয়ে, প্রাণে, অন্ধকার সংশয়ের বীজ
বপন ক'রেছি আমি কত যত্নে, জানো না সে কথা
ক্ষণজীবী পৃথিবীতে অনভিজ্ঞ তুমি। জানো না তা
দীর্ঘ যুগ যুগান্তের সেই শ্রম, প্রয়াস আমার
ফুলে ফলে সুশোভিত শতাব্দীর বিষবৃক্ষ সেই
অপমৃত্যু এনেছে কিভাবে? জিব্রাইল, মিকাইল
জান্নাতী ফেরেশতা যত দেখেছে তা শংকিত বিস্ময়ে
সময়ের তীরে। মানুষের ইতিহাস-কলঙ্কিত
সে কাল-কাহিনী, কলঙ্কিত দেখে আরও ভ্রাতৃরক্তে
হত্যায়, লুণ্ঠনে, পাপে, ব্যভিচারে, শোষণে, ঈর্ষায়,
ফিরে গেছে বেদনার্ত তারা। মানুষের পৃথিবীতে
আমি জাগি শবের প্রহরী। প্রত্যয়ের এক বিন্দু
পাবে না এ পঙ্কিল ধারায়। সংশয়িত মানুষের
ব্যক্তি বা সমাজসভা দিশাহারা তিক্ত অবিশ্বাসে
হারায়েছে মূল লক্ষ্য ইবলিসের অভিজ্ঞ কৌশলে!

www.pathagar.com

তখন তার জবাবে 'বনি আদম' যা বলে তার মধ্যেই বিজ্ঞপিত হয় ফররুখের মত ও পথের স্বরূপ। বনি আদমের কণ্ঠে ফররুখ তখন শাণিত যুক্তির তরবারি উঁচিয়ে বলেন–

তোমার ফাঁকির চক্র, তোমার কৌশলী মতবাদ
রাত্রির আলোয় যেন মিথ্যাময়ী, নিষ্প্রভ, এখন
স্পষ্ট দিবালোকে হিংসা-হিংস্রতার ছুরি ঢেকে রেখে
শান্তির খোলস মুখে প্রতারক, প্রভুত্ব পিয়াসী
প্রচার করেছে যত মিথ্যা বুলি, ধরা পড়ে গেছে
সম্পূর্ণ স্বরূপ তার এ বিশ্ব জগতে! ঘূর্ণমান
মানুষের এই মিছিলে রসূল এসেছে বারেবারে।
অগণ্য যাত্রীকে তারা নিয়ে গেছে সত্যের মঞ্জিলে,
পথের দিশারী– পৃথিবীতে। মানুষের ইতিহাস
কলঙ্কিত নয় তাই শুধু পাপ-পঙ্কিল প্রবাহে।
সেখানে ঔজ্জ্বল্য আছে, আছে দীপ্ত পূর্ণ পরিচয়
আশরাফুল মখলুকাত ইনসানের। বনি আদমের
মহান ভ্রাতৃত্বে, ত্যাগে, সততায়, সংগ্রামে, শান্তিতে,
প্রেমে ও প্রজ্ঞায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল সে পুণ্যকাহিনী;
নতমুখ ইবলিস যেখানে।– জামানার ঘূর্ণাবার্তে
সব আলো নিভে গেলে অন্ধকারে জ্বলেছে আবার
সিরাজাম মুনীরার দীপ্ত শিখা অনির্বাণ তেজে
বহু বর্ষ আগে; তবু প্রোজ্জ্বল ভাস্বর দু'জাহানে।
পেয়েছে বিভ্রান্ত যাত্রী মঞ্জিলের দিশা তারা খুঁজে
সে সত্য আলোকে! দিকে দিকে আজ তাই উঠে আসে
সারা জিন্দেগীর খোঁজে নারী নর তৌহিদী আলোকে;
আখেরী নবীর পন্থা একমাত্র কাম্য যে তাদের!

ফররুখ আহমদ তাঁর জীবন-পাঠ, প্রকৃতি-পাঠ, সমাজ-পাঠ দিয়ে এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং সকলকে সেই সত্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মনে এ বিষয়ে কোন কুণ্ঠা ছিল না যে, আলোর জীবনে উত্তীর্ণ হ'তে গেলে 'আখেরী নবীর পন্থা' মানুষের কাম্য হ'তে হবে। সারা জীবনের কাব্য-সাধনায় বহু দীপ্ত কাব্য পংক্তিতে তিনি তারই স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি শুধু ইসলামের মুক্তি চাননি, তিনি চেয়েছিলেন আলোর জন্যে নিদ্রিত মানুষের জাগরণ– যে আলো তাঁর ধারণায় আখেরী নবী প্রবর্তিত তৌহিদী আলো।

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদ : তাঁর জীবন ও কবিতা

পৃথিবীতে বহু কবি আছেন যারা স্ব-বিরোধী। এই স্ব-বিরোধিতা আমরা দেখেছি ওমর খৈয়ামে, হাফিজে, হুইটম্যানে, বোদলেয়ারে, রবীন্দ্রনাথে এবং নজরুল ইসলামে। কোন কোন কবি এই স্ব-বিরোধিতার পক্ষে ওকালতি করেছেন কিংবা গর্ব করেছেন। চরিত্র না থাকাটাই যে প্রকৃত কবি-চরিত্র এ-কথা বলেছিলেন কীটস্। রিচার্ড উডহাউসকে লেখা এক চিঠিতে কীটস্ বলেছিলেন :

> As to the poetical character itself (I mean that sort of which, if I am anything, I am member; that sort distinguished from the Wordswarthian or egotistical sublime; which is a thing per se and stands alone) it is not itself– it has no self– it is everything and nothing– It has no character– it enjoys light and shed; it lives in gusto, be it foul or fair, high or low, rich or poor, mean or elevated– It has as much delight in conciveing an iago as an Imogen. What shocks the virtuous philosopher delights the comelion poet.

কবির এই স্ব-বিরোধী চরিত্র আমরা হুইটম্যানে এইভাবে দেখতে পাই। হুইটম্যান তাঁর Song of myself-এর এক স্থানে বলছেন–

> I am the poet of commonsense and
> of the demonstrable and of
> Immortality;
> And on not the poet of goodness only...
> I do not decline to be the
> Poet of wickedness also.

এই স্ব-বিরোধিতাকে সমর্থন করে তিনি আবার বলছেন–

> Do I contradict myself ?
> Very well then.... I contradict myself,
> I am large..... I contain multitudes.

www.pathagar.com

এই স্ব-বিরোধিতা খুব স্পষ্টভাবে হুইটম্যানের মত নজরুল ইসলামে আমরা লক্ষ্য করি। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নজরুল নায়ক-চরিত্রের 'বিশেষণে' "অপরূপ বিপরীত" বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন। এবং এরই স্বরূপ দেখিয়েছিলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায়। যেখানে তিনি লিখেছেন–

আমি সৃষ্টি আমি ধ্বংস আমি লোকালয়, আমি শ্মশান
আমি অবসান নিশাবসান।

পরস্পরবিরোধী শব্দের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা যে স্ববিরোধিতার কথা বলছিলাম সেটা এখানে লক্ষ্য করা যাবে। আমরা নজরুল ইসলামে এই কীটস্ কথিত 'ক্যামেলিয়ান পোএট' বা বহুরূপী কবি চরিত্রের স্বরূপের সন্ধান পাব। কিন্তু ফররুখ চরিত্র অন্যরূপ। তিনিও কবি কিন্তু কীটস্ বা হুইটম্যান উল্লেখিত কবি-চরিত্রের নন।

ফররুখের কবি জীবন সম্বন্ধে বলতে গেলে তাঁর জীবন সম্বন্ধে দু'একজন বিশিষ্ট লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ফররুখ আহ্মদ সম্বন্ধে লিখেছেন :

> তিনি মৃত্যুবরণ করলেন নীরবে, কিন্তু তাঁর ধারণা ও বিশ্বাসে অটল হয়ে রইলেন; টললেন না, নিজের ও পরিবারের লোকদের জীবন রক্ষার তাগিদেও না। (তাঁর নাম ফররুখ আহ্মদ : ফররুখ আহ্মদ ব্যক্তি ও কবি)

এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন–

> একবার আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একটি তরুণের প্রতি তাঁকে ক্ষুব্ধ হতে দেখি। রাজশাহীর তরুণটি তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এবং কাব্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছু অজানা বিষয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় আসে। ফররুখ নিজের প্রশংসা শোনা পছন্দ করতেন না। ছেলেটির প্রশংসা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে কোন কিছু আলোচনা করতেই অস্বীকার করলেন। হতাশ হয়ে ছেলেটি চলে যায়। আমরা ফররুখের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি রাগে ফুঁসছেন এবং বলছেন, 'আমি এ-সব সস্তা প্রশংসা শোনা পছন্দ করি না। আমি এ ধরনের প্রশংসার জন্যে কলম ধরিনি। আমি লিখেছি আল্লার উদ্দেশ্যে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।... ইসলামের রীতিনীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যদি কোন কিছু করা যায় তাহলে তা করব, না হলে উপোষ করে মরে যেতে প্রস্তুত

www.pathagar.com

আছি, তবুও কোন গায়ের-ইসলামী কাজ করবো না, এই ছিল ফররুখ আহ্‌মদের জীবন-নীতি। (অনমনীয়-ফররুখ : ফররুখ আহ্‌মদ: ব্যক্তি ও কবি)

ফররুখের জীবনের এই একরৈখিকতাই ছিল তাঁর চরিত্র। এবং বলা বাহুল্য, তাঁর জীবন ও কাব্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। অনেক লেখক আছেন যাঁরা জীবনাদর্শকে আর কাব্যাদর্শকে পৃথক করে দেখেন– যেমন মধুসূদন দত্ত। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছিলেন–

When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias.

মধুসূদন ফররুখের প্রিয় কবি হলেও ফররুখ এই উপলব্ধি বা জীবনাদর্শকে গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর কাব্য-হৃদয়কে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন।

এখানে ফররুখের বৃহৎ জীবনী ও বিশাল কাব্য নিয়ে আলোচনার পরিসর নেই। আমার সম্পাদিত 'ফররুখ আহ্‌মদ: ব্যক্তি ও কবি' সংকলনে আমি বিভিন্ন লেখক সমালোচক কবিদের এবং ফররুখ আহমদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের তাঁর সম্পর্কিত যে স্মৃতিকথা ছেপেছি তা থেকে দেখা যায় তিনি স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রেমিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন মানবপ্রেমিক ও মানবতাপ্রেমিক; তিনি যেমন ছিলেন সন্তান ও বন্ধুবৎসল, তেমনি ছিলেন অতিথিবৎসল। তাঁর বাংলা ভাষাপ্রীতিও যে সামান্য ছিল না তাঁর গদ্যে ও পদ্যেও তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন যে তাঁর লেখাটিতে বলেছেন–

> 'ফররুখ আহ্‌মদ আত্মসচেতন ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু কারও অন্যায় কাজ বা অবিচার দেখলেই তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠতেন। তাঁর কবিতা ছিল অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক এবং তাতে মানবতাবোধ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত।'

ফররুখ জীবন সম্বন্ধে এ-বক্তব্য সত্য অভিভাষণ। এবং দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ ফররুখ আহ্‌মদের চরিত্রকে শনাক্ত করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, তিনি যে 'সংস্কৃতি জগতের বহুরূপী' নন সে-কথাকে অর্ধ সত্যে গ্রহণ করার উপায় নেই।

www.pathagar.com

বলেছি ফররুখের জীবনাদর্শ ও কাব্যাদর্শের তেমন পার্থক্য ছিল না; কিন্তু জীবন-চিন্তা ও কাব্য-চিন্তায় বুঝি কিছু পার্থক্য ছিল। ফররুখের জীবনাদর্শ স্পষ্ট, অকপট, সরল এক-রৈখিক; কিন্তু কবিতায়, বিশেষ করে কবিতার আঙ্গিকে, আধারে এবং অলংকারে তিনি অতরল, অসরল এবং অস্পষ্ট। কবিতায় বেশি সরল স্পষ্ট হলে কবিতা যে তরল এবং পদ্যধর্মী হয়ে যায় সব শ্রেষ্ঠ কবির মত ফররুখের এ বোধ ছিল শিল্পধর্মী। লেবাসে তিনি অবিমিশ্র মুসলিম হলেও, অকপট ও নিষ্কুণ্ঠ মুসলিম হলেও– সেই আচ্ছাদনহীনতার প্রত্যক্ষতা বা প্রকাশ্যতা তাঁর কবিতায় নেই। ইসলামী জীবনাদর্শে অন্বিত থাকতে তিনি যেমন ছিলেন অটল, প্রকৃত কাব্যের শিল্পাদর্শের সংগে সংযুক্ত থাকতে তেমনি ছিলেন অটল। বোদলেয়ার লিখেছিলেন– 'পাছে রেখা স্রস্ত হয় ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা'– কবিতায় পরম শিল্পসিদ্ধি লাভ করতে সম্ভবত ফররুখ এই বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন। কোন বাক্য যাতে উলঙ্গভাবে প্রকাশ না হয়; কোন শব্দ যাতে অসম ওজনের হয়ে শব্দান্বয়কে দুর্বল করে ছন্দকে টালমাটাল না করে তোলে, বাক্য যাতে শব্দ নির্মাণের খেয়ালীপনায় ঔজ্জ্বল্যের বালখিল্যতায় আত্মসমর্পণ না করে– এ-দিকে ফররুখ ছিলেন অতি সতর্ক। মুসলিম সমাজের তন্দ্রাতুর অলস বিলাসী জীবনের দিন শেষ হয়ে যে জাগরণের নতুন সমাজ গড়ার দিন শুরু হয়েছে সে-কথা বলতে তিনি লিখছেন–

কেটেছে রঙিন মখমল দিন; নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক।
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ;
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক।

"সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" ফররুখ মুসলমানদের লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, মুসলিম ইতিহাসকে পটভূমিতে রেখেই তাঁর এই কাব্য রচনা, কিন্তু কবিতায় তিনি ইসলাম ও মুসলিম এই শব্দ কোথাও ব্যবহার করেননি। যখন তিনি যোশের বা উদ্দীপনার বা আশার কথা শোনাচ্ছেন তখন তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মত এভাবে বলছেন না–

নির্বিঘ্ন শান্তিকে চাও তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে।

তখন তিনি বলছেন–

ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ

www.pathagar.com

দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ;
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ!

বা

তুমি দেখছো না, এরা চলে কোন্ আলেয়ার পিছে পিছে ?
চলে ক্রমাগত পথ ছেড়ে আরো নীচে।
হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভেনি এ-কথা
জানো তো তুমি;
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখছে এ মরুভূমি;
দেখ জমা হ'ল লালা রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে!

তিনি আশা ও অভয় দিচ্ছেন কিন্তু অনাবৃত ভাষায় নয়। এমন কি যখন তিনি মুসলমানদের উত্থান পতনের ইতিহাসকে ইঙ্গিত করে বর্ণনা দিচ্ছেন তখনও তাঁর ভাষা নিরাবরণের নগ্নতার শিকার হচ্ছে না। 'বার-দরিয়ায়' আমরা এই ধরনের বর্ণনার সাক্ষাত পাই–

কত স্রোত আর ঘূর্ণি তুফান পাড়ি দিয়ে অবহেলে;
কত লাল, নীল জরদ প্রভাত; সন্ধ্যা এসেছি ফেলে;
আমাদের তাজী ফেন উচ্ছল মুখ
থামবে না বুঝি সব স্রোত থেমে গেলে।

বিশুদ্ধ শিল্পের একটা লক্ষণ হল লুকিয়ে প্রকাশ করা। বোদলেয়ার তাঁর 'পাঠকের প্রতি' কবিতায় লিখেছিলেন 'কপট পাঠক দোসর জমজ ভাই, আমার!' প্রকৃত কাব্য এই আড়াল করার চাতুর্য! নজরুল ইসলাম তাঁর একটি গানে বলেছিলেন– 'কাঁটা নিকুঞ্জে কবি/ এঁকে যা সুখের ছবি/নিজে তুই গোপন রবি/তোরই আঁখির সলিলে!' ফররুখ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করেননি কিন্তু কবিতার বক্তব্যকে উলঙ্গ করতে দ্বিধা করেছেন। কবিতার আধেয় নয় আধারের এই নির্মাণে তাই তিনি চির-আধুনিক!

তবে এখানে এইটুকু বলে রাখা আবশ্যক যে 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে ফররুখ এই বিশুদ্ধ কাব্য নির্মাণে– দু'একটা কবিতা ছাড়া– যত সফল, সম্ভবতঃ তাঁর অন্য কাব্য গ্রন্থসমূহে বা অন্য অনেক কবিতায় ততটা সার্থক নন। সে জন্যেই 'সাত সাগরের মাঝি'ই শাজাহানের তাজমহলের মত শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে

www.pathagar.com

থাকবে। আবেগ, কবি কল্পনা, শব্দ চয়ন কুশলতা এবং গতিমান ছন্দ নির্মাণ দক্ষতা একত্রিত হয়ে এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

[দুই]

সম্ভবতঃ কারবালার যুদ্ধে হোসেনের পতনের ইতিহাস ইসলামের গণতন্ত্রের ধ্বংসের ইতিহাস। ঐদিনই রাজতন্ত্রের তথা একনায়কত্বের বিজয়ের সূচনা হল। হযরত ওসমানের সময় যে আভিজাত্যগর্বী বুর্জোয়া-মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তার পূর্ণ বিজয় সূচিত হল ইমাম হোসেন (রা)-এর পরাজয়ে।

মুসলিম ইতিহাসে রাজতন্ত্র তার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রভূত পরিমাণ সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রাখলেও ইসলামের কতকগুলো মানবিক মূল্যবোধকে সংগে সংগে ধূলিসাৎ করে। প্রকৃত অর্থে ইসলাম শাস্ত্রাচারের মধ্যে গুটিয়ে যায়– তার কার্যকরী রূপায়ণ আর ঘটে ওঠে না।

কারবালার যুদ্ধের পরেও ইমাম হোসেনের উত্তরপুরুষকে নিয়ে কয়েকবার সংঘবদ্ধভাবে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু বারবারই কায়েমী স্বার্থের কাছে সেই মূল্যবোধ মার খেতে থাকে। সাংগঠনিক শক্তির দুর্বলতায় এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে সেই সব প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায়।

ইরানের মুসলিম বাদশাহরা অথবা ভারতবর্ষের মুসলিম মোগল বাদশাহদের মধ্যেও সেই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিস্ফুটন ঘটেনি। সে-জন্যে প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরকে শাস্ত্রাচারের মুখোশ পরা বুর্জোয়া শ্রেণীর লালয়িতা বলা গেলেও আদর্শ মুসলমান বলা চলে না । ইসলামের কোন একটি আদর্শকে রূপ দেওয়ার কোন রকম প্রচেষ্টা এঁদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে লক্ষ্য করা যায় না।

হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খলিফাদের জীবনে বিশেষ করে আবুবকর (রা) ও ওমর (রা)-এর জীবনে– ইসলামী আদর্শের যে প্রতিফলন ঘটেছিল– এই সব বাদশাহরা তা অনুসরণ করার আদৌ চেষ্টা করেননি। এঁরা জীবন-ধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শকে স্থান দেননি। নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমানুল্লাহ' নামক বিখ্যাত কবিতায় তাই দুঃখ করে বলেছিলেন–

'আমানুল্লা'রে– করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহিনা গান,

www.pathagar.com

মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান!
ঐ বাদশাহী তখতের নীচে দীন-ই-ইসলাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু করে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়!

ঐ 'দীন-ই-ইসলাম'-এর প্রকৃত রূপ কী তা দেখানোর জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) ক্রীতদাসকে সেনাপতির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁর শেষ বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন বংশ মর্যাদা, আভিজাত্যের গর্ব– ইত্যাদি সবকিছুই হারাম। ইসলামে এই সাম্যের রূপ আছে বলে প্রকৃত অর্থে ইসলাম বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের ধর্ম বলে পরিচিত। আরব ইতিহাসের হযরত মুহাম্মদ (সা) পরিচ্ছেদই বলে কুসংস্কার, গোঁড়ামী, বর্বরতা, সামাজিক বৈষম্য, উচ্চ-নীচের ভেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধেই মহানবী সংগ্রাম করেছিলেন। নিপীড়িত মানবের এই মুক্তি সংগ্রামের বাণীই আল কোরআন।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রীয় শাসনের কপাট ভেঙে এর প্রকৃত অর্থ যখনই জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে তখনই কায়েমী স্বার্থের তরবারি তার শিরশ্‌ছেদ করেছে। ফলে ইসলাম তার প্রকৃত রূপে কখনই মুক্ত হতে পারেনি।

ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে ইসলামের অনুকরণ অনুসরণ চললেও পালা-পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠানের কারাগার ভেঙে সে বেরুতে পারেনি। প্রকৃত রূপ নিয়ে সে যদি মানব সমাজে অধিষ্ঠিত হতে পারত তাহলে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজকে ফিরে পাওয়া কঠিন হত না বলে ফররুখ আহ্‌মদের বিশ্বাস। ফররুখ আহমদের কাব্যমানস বিচারের পূর্বে এই খবরটুকু আমাদের জানা দরকার।

আমরা কেউ কেউ ফররুখ আহ্‌মদকে শাস্ত্রীয় গোঁড়ামীর শিকল পরা একজন আদর্শবাদী মানুষ বলে ভাবি, তাঁর কাব্যজীবনের ব্যর্থতার কারণ ঐ একরৈখিক চিন্তার পরিণতি বলে উল্লেখ করি। কিন্তু কেন তিনি ব্যর্থ, এই কথাটাকে আমরা যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করি না।

যদি বলি যুগের সংগে তিনি তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি, মানব ইতিহাসের অগ্রসর চিন্তার সংগে তাঁর ধারণার মিশ্রণ ঘটাতে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারা একটা গোষ্ঠীগত ধারণায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে প'ড়েছিল– তা'হলে তার প্রতি খুব সুবিচার করা হয় বলে আমার মনে হয় না।

এটা অবশ্যই একটা জিজ্ঞাসা যে ইসলামী আদর্শ ও পাকিস্তানী আদর্শ সমার্থক কিনা? এবং পাকিস্তানী আদর্শ ও ইসলামী আদর্শ যদি সমার্থক না হয় তাহলে পাকিস্তান ইসলামের লালনভূমি এই চিন্তাধারা রুগ্ন কিনা? যদি তা রুগ্ন হয়

www.pathagar.com

তাহলে সেই রুগ্ন চিন্তার আধারে আত্মসমর্পণ ফররুখ আহ্‌মদের শিল্প জীবনের ভ্রমাত্মক পরিণিত এই কথা যথার্থ কিনা? যেখানে পাকিস্তান নেই সেখানে কি ইসলাম নেই? ইসলাম কি নেই আরবে, ইরানে, তুরস্কে, ইন্দোনেশিয়ায় অথবা ভারতবর্ষে? এবং "পাকিস্তান" নামক রাষ্ট্র চাননি যে আবুল কালাম আযাদ তাঁর ইসলাম এবং পাকিস্তানী ইসলাম কোন পৃথক ব্যাপার কিনা? এবং পৃথক রাষ্ট্রের জন্যে পৃথক ধরনের ইসলাম এ-কথাটা একটা হাস্যকর ব্যাপার কিনা?

এ কথা ঠিক, রাজ্যহারা ভারতীয় মুসলমানদের বৃটিশ রাজত্বে স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছিল। কিন্তু এই স্বার্থ ক্ষুণ্নতার পিছনে অর্থনৈতিক কারণটাই যখন প্রধান তখন ধর্মীয় কারণের সেখানে অনুপ্রবেশ কেন ঘটল? ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা কি শুধু মুসলমানেরই ছিল, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ছিল না? বৃটিশের কাছ থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা পেলেও সব শ্রেণীর হিন্দুরাই সে সুযোগ পেয়েছিল কি? এই যে সর্বহারা শ্রেণীর মুসলমান ও সর্বহারা শ্রেণীর হিন্দু কেবল কি ধর্মীয় কারণেই এঁরা সর্বহারা? যখন ভারতবর্ষের রাজা মুসলমান মোগল বাদশাহ্ ছিল, অথবা বাংলার নবাব ছিল মুসলমান তখন কি বাংলাদেশে অথবা ভারতবর্ষে এই বঞ্চিত, নিপীড়িত সর্বহারা মুসলমান বলে কিছু ছিল না? যদি তা থেকে থাকে তাহলে শুধুমাত্র মসনদের অধিকর্তা মুসলমান হলেই মুসলিম জনতা অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে এ ধারণা কেমন করে হয়? পাকিস্তান সৃষ্টির পরে তাহলে সেই সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তি কেন লাভ করল না পূর্ব বাংলার শতকরা আশিভাগ মুসলমান? বাস্তবক্ষেত্রে পাকিস্তানের সত্যিকার আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি বলে? কেন প্রতিফলিত হয়নি? কারা হয়েছিল প্রতিবন্ধক সেই মানবিক আদর্শের প্রতিফলনের? ফররুখ আহ্‌মদ কি সেই বাধার দেয়ালগুলো চূর্ণ করার কোন চেষ্টা করেছিলেন? যদি বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত মুসলমানদের স্বার্থের সংরক্ষণের ভূমি এই পাকিস্তান তাহলে তাদের সেই স্বার্থ-সংরক্ষণের দায়িত্ব পড়ল কেন তেমন লোকের স্কন্ধে যারা মানবিক দায়িত্ব পরিবহণের যোগ্য নয়? ইসলামের সাম্যের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে এই অযোগ্য লোকসমূহের বিরুদ্ধে মসির অসি কেন চালনা করলেন না ফররুখ আহ্‌মদ? না করেছিলেন তিনি প্রতীক ও রূপকের আশ্রয় নিয়ে? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পেলে বোঝা যাবে যে ফররুখ আহমদ তাঁর আদর্শের প্রতি কতখানি বিশ্বস্ত ছিলেন।

ফররুখ আহ্‌মদের এই মানস বিচারের পূর্বে আমাদের প্রথম এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফররুখ আহ্‌মদ মূলত কবি। অবশ্য কেবল আত্মরতির পূজায় কিম্বা নারীপ্রেমের কাব্যগাথার মধ্যেই তাঁর কবি-কল্পনা নিঃশেষিত নয়। যে-প্রথম গ্রন্থটি তাঁকে বিখ্যাত করে সেই "সাত সাগরের মাঝি" এক বিশেষ

www.pathagar.com

সময়ের বিশেষ সমাজের মানসদর্পণ। বেদনা থেকে কাব্যের জন্ম হয়– সাহিত্যের জন্ম হয়, শিল্পের জন্ম হয়। এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত বেদনার ভার নিয়েই "সাত সাগরের মাঝি" সোচ্চার। বেশ বোঝা যায়– মুক্তির ডানা মেলে উড়বার চেষ্টায় নিরত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মুখপাত্রের ভূমিকা নিয়েছেন ফররুখ আহ্‌মদ। কিন্তু নির্যাতিত সর্বশ্রেণীর, সর্বসম্প্রদায়ের মুখপাত্র না হয়ে তিনি সম্প্রদায় বিশেষের জন্যে ব্যগ্র হলেন কেন? বাঙলার মুসলমান বেশী অনুন্নত এবং বেশী বঞ্চিত বলে? জানি ইতিহাস তাঁর সপক্ষে রায় দেবে। কিন্তু সংগে-সংগে এ কথাও জানাবে যে বাংলাদেশের আর এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শুধু ধর্মীয় কারণে তাঁর সাহিত্যের বহির্ভূত থাকার কী কারণ। নজরুল ইসলাম যা করেছিলেন– সচেতনভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের পুরাণের ব্যবহার ফররুখ আহ্‌মদ সচেতনভাবে তার উল্টো দিকে গেলেন কেন? সাহিত্য-ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কেন সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করলেন? এবং সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যকে কি তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করেছিলেন? স্ববিরোধিতা কি একেবারেই ফররুখ আহ্‌মদে ছিল না? শুনেছি মাইকেল মধুসূদন ফররুখ আহ্‌মদের প্রিয় কবি ছিলেন। কি জন্যে? তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করেছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'তো রামায়ণ-মহাভারতের এবং হিন্দু পুরাণের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে পরিপূর্ণ। খৃস্টান হয়েও হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করেও মধুসূদন এই সাহিত্য ঐতিহ্যকে বাদ দিতে পারেননি। অথচ ফররুখ আহ্‌মদ মাইকেলকে পড়েও মাইকেলকে ঐভাবে এড়িয়ে গেলেন। পৌত্তলিক ঐতিহ্যকে এড়িয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে কি তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তনের মনোভাব গড়ে উঠেছিল? তা যদি সত্যি হয় তাহলে পৌত্তলিক পুরাণকে তিনি তো এড়াতে পারেননি! আমরা লক্ষ্য করেছি, সমস্ত ইরানী সাহিত্যে মুসলিম যুগের প্রধান কবিরা পৌত্তলিক পুরাণ অথবা ইতিহাসকে ব্যবহার করছেন। কায়কাউস, কায় খসরু, রুস্তম এঁরা সবাই ফেরদৌসী, হাফিজ ও ওমরের কাব্যে প্রতীক ও রূপকের রূপে ব্যবহৃত হয়েছেন। কিন্তু ইক্‌বালকে পড়ে ফররুখ বুঝেছিলেন, ইরানী জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে তৌহিদবাদী ইসলামী আদর্শের মিল নেই। অতএব তিনি এই জ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরানের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার কবিদের আদর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন।

আমরা লক্ষ্য করি, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাহিত্যিকরা মুসলমান সমাজকে পুরোপুরি জানার চেষ্টা করেননি। তাঁদের সাহিত্যে গ্রীক পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে বরং হয়নি মুসলিম পুরাণের কোন ব্যবহার। বোধ হয় একমাত্র মোগল বাদশাহ্‌দের জীবন, কাহিনী এবং মোগল

www.pathagar.com

যুগ তাঁদের কারও কারও সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু সর্বত্র সুবিচার কোথাও পায়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল "শাহ্‌জাহান" নাটক লিখেছেন "আওরঙ্গজেব"এর কলঙ্কিত চরিত্রকে আঁকবার জন্য, বঙ্কিমচন্দ্র "রাজসিংহ" লিখেছেন সেই একই কারণে। শাহজাহান তাঁর ভাই শাহরিয়ারের চোখ উপড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সমালোচিত হননি। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁদের একক সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন তাঁর ধর্মীয় আদর্শের জন্যে। যে আদর্শের জন্যে তিনি আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। ফলে তাঁকে আক্রমণ করে পরোক্ষভাবে তারা মুসলমানদের সেন্টিমেন্টে আঘাত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের লেখায় সেই বিশেষ সেন্টিমেন্টের উপর আঘাত দেওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাপারটি উপেক্ষা করা নজরুল ইসলামের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কিন্তু ফররুখ আহমদের পক্ষে হয়নি।

ধর্মের সঙ্গে কবিতাকে তিনি একাত্ম করে দেখেছেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা ইসলামিক অনুশাসন হতে পারে কিন্তু তা শিল্পের অনুশাসন নয়– এটাও ভাবতে পারেননি ফররুখ। রেনেসাঁসের যুগের ইউরোপীয় শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে পৌত্তলিক পুরাণ বর্জিত হয়নি। ফররুখ আহ্‌মদ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। তৌহিদের মন্ত্রে দীক্ষিত কোনো ব্যক্তিই তাঁর ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে যেতে পারে না এই ছিল তাঁর অবিচলিত ধারণা।

পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বস্ত থাকলেও ফররুখ আহ্‌মদ তার বুর্জোয়া শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তাঁকে সরকারী চাকরী করতে হত। সরকারের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহের মনোভাব দেখিয়ে সরকারী অফিসে চাকরী করা যায় না। সেজন্যে তাঁকে কাব্যের রূপক ও প্রতীকের ছদ্মবেশ পরতে হ'য়েছে। অনস্বীকার্য, তিনি আমাদের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী লেখকদের মত কেবল পশ্চিম পাকিস্তান অথবা অন্য কোন মুসলিম দেশ কিংবা বহির্দেশে যাওয়ার সামান্য লোভের হাতে ধরা দেননি; কিংবা তিনি নুয়ে পড়েননি অসাধারণ বিনীতভাবে সেই সরকারের পদতলে– মুখোশ বদলানো বুদ্ধিজীবীদের মত। কিন্তু যে-কারণে তিনি সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহ করেননি তার কারণ অন্যত্র। সে-কারণের মধ্যে আছে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিণতির চিন্তা। তাঁর বোধ হয় আশঙ্কা ছিল যে, প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উল্টে ফেললে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। আর পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেলে মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর প্রবল আঘাত আসবে। সেজন্যে তিনি পাকিস্তান পরবর্তী কালে তাঁর শাসকদের সমালোচনা করেছেন কিন্তু পাকিস্তানকে উৎখাত করার কথা ভাবেননি। কিন্তু প্রকৃত আদর্শবাদী এবং

www.pathagar.com

ইসলামের সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানবতাবাদী মানুষের পক্ষে অমানুষদের সহ্য করা কেমন করে সম্ভব? যে ইসলামের বিমল সৌন্দর্য দেখার অভিলাষী তিনি ছিলেন কেবল তাঁরই জন্য ঐ অমানুষদের ধ্বংস করার চিন্তা তো অনিবার্য ছিল। সে কথাটা তিনি ভেবেছিলেন? যে ভাষা আন্দোলনকে অনেকে বাংলাদেশ সৃষ্টির উৎস মনে করেছেন সেই বাংলা ভাষাকে ফররুখ রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে পিছপা হননি; সে আন্দোলনে শরীক হতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহ প্রদর্শনের ব্যবহারিক পন্থা ছিল তাঁর ভিন্ন ধরনের। "সাত সাগরের মাঝি"তে "অগ্নি-বীণা"র প্রচণ্ড ক্রোধ নেই। মুসলমানদের তিনি জাগাতে চাইলেন কিন্তু তা ভিন্ন সুরে। এখানে তাঁর একটি স্তবক উদ্ধৃত করে সেই সুরটিকে চিনে নেওয়া যাক–

সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো–
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো।
তুমি উঠে এসো তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতী আবার ভেসেছে সাগর জলে।
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ!
তবে তুমি জাগো কখন সকালে ঝরেছে হাস্‌নাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না?

এই সুর অনুগ্র মিনতিময়, হাস্নাহেনার গন্ধের মত স্নিগ্ধ কোমল। কাব্যকে তিনি তাঁর ভাবনার মার্জনায় তাঁর শিক্ষার মার্জনায়, শিল্পসুষমাবর্জিতভাবে চিন্তা করতে পারতেন না। তাই যেখানে তাঁর ভর্ৎসনা স্থূল সেখানে তিনি হায়াত দারাজ খান নাম নিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে তিনি সুমার্জিত সেখানে তিনি কবি ফররুখ আহ্‌মদ। এই কবি ফররুখ আহ্‌মদ "নৌফেল ও হাতেম" ও "হাতেম তা'য়ী"-এর মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক আবেদন শিল্পের সাজিতে তাঁর সময়ের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রতিবাদ ছিল না সে-কথা ঠিক নয়। তবে তিনি বোঝেননি যে, পিশাচের কাছে ফুলের সাজির মূল্য নেই। নৌফেলরা তাঁর হেনার গন্ধের আবেদনকে ভ্রূক্ষেপ করেনি কোন দিন। অধম সন্তানের সামনে উপদেশ তাঁর তুচ্ছ হয়ে গেছে এবং তাঁর স্নেহময় অকঠোর মনোভঙ্গীর পরিণতি তাঁকে বর্বর সন্তানের কাছ থেকে পাওয়া চূড়ান্ত আঘাতের শিরোপা উপহার দিয়েছে। তাঁর রোমান্টিক স্বপ্নের সোনার মুণ্ডে পড়েছে বাস্তবের অকরুণ পদাঘাত– যে বাস্তব

www.pathagar.com

সম্বন্ধে ফররুখ আহ্‌মদের ধারণা ছিল কবি জনোচিত। অর্থাৎ কবি তিনি শুধু লেখায় ছিলেন না ছিলেন বুদ্ধির জগতেও।

রচনা সময়
৩০-০৫-৯৪

www.pathagar.com

ফররুখ ও তিন কবির 'ঝড়' ও 'বৈশাখ'

শেলী "ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড" নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন। ১৮১৯ খৃস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তিনি এই কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির মর্মার্থ হল জরাজীর্ণ অতীতের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে জন্ম হবে নতুনের। শেলী বিশ্বাস করতেন– ...history developed in phases of disorganization and reproduction, like the seasons and everything else in nature." (ইতিহাস উন্নতি লাভ করে ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে ঠিক প্রাকৃতিক অন্যান্য বস্তুর মত।) প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের মতই মানব সমাজও প্রাকৃতিক কারণে ঋতু পরিবর্তনের মত ক্রমাগত খোলস বদলে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতির কাছে ধ্বংস যেমন অনিবার্য সত্য; ক্ষয়-অবক্ষয় যেমন অনিবার্য সত্য, তেমনি সৃষ্টি ও নবজন্ম অনিবার্য সত্য। শেলী তাই পশ্চিমা বায়ু ঝড়ের প্রশস্তি গেয়েছেন, তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন–

Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth !
And by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind !

কারণ শেলীর বিশ্বাস যে ঝড় শুষ্ক পত্র ঝরিয়ে দেয় সেই ঝড় নবীন পাতার জন্মকে ত্বরান্বিত করে। শেলী প্রকৃতির কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছেন–

The trumpet of prophecy ! O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind ?

শেলীর বিশ্বাস শীত এলে বসন্ত আসবেই। জীবনে দুঃখ এলে সুখও আসবে। কোন ঋতু যেমন স্থায়ী নয় তেমনি দুঃখময় সময়ও স্থায়ী নয়। যখন ঝড় আসে তখন সে সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে যায় তার দুর্দান্ত গতির প্রচণ্ডতা দ্বারা। সেজন্য ঝড় ধ্বংসের ও ভয়ঙ্করের প্রতীক। কিন্তু সেই ধ্বংস-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।

রবীন্দ্রনাথ সেজন্যেই 'ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান'-এ ঝড়কে আহ্বান করে বলে ওঠেন :

গাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মত উর্ধ্ববেগে

www.pathagar.com

অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিঃশ্বাসে।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নতুনের প্রতি আগ্রহী এবং জীবনহীন পুরাতনের প্রতি অনাগ্রহী, সেজন্য তিনিও আমন্ত্রণ জানান কালবৈশাখীকে। বলেন–

আনন্দে আতঙ্কে মিশি– ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহা রবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের মত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

কিন্তু শেলীর মত রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" কবিতাটিতে শেলীর জীবনদর্শন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। এই জীবনদর্শনটি যুক্তিগ্রাহ্য স্পষ্টতায় নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় প্রস্ফুটিত। নজরুল যখন বলেন–

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !

তখন বোঝা যায় দ্বন্দ্ব প্রগতিমূলক বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে নজরুল সুপরিচিত।

নজরুল ইসলামের কবিতায় আমরা আর একটি বিষয় দেখতে পাই– সেটি সময়ের হিসাব। পৃথিবীর নিয়তি আলো অন্ধকারের, দিন রাত্রের। সময় কখনও রাত্রির অনুগত, কখনও দিনের অর্থাৎ সময় কখনও সুখের অনুকূলে কাজ করে কখনও দুঃখের অনুকূলে। সেজন্যে নজরুল 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে বলছেন–

ঐ সে মহাকাল সারথী রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !

www.pathagar.com

ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল-খিলানে !
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধকারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে !
এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।

পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলো এই কালের কথা বলছে। সুনির্দিষ্ট সময় মহাপুরুষদের শুধু জন্ম হয় না, মহা সময়ের, সুন্দর সময়ের আবির্ভাব হয়। সুন্দর সময়ের জন্য সুন্দর মানুষের মহা মানুষের জন্ম হয়। সময় প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই সময়ের কাঁধে চড়ে। কালো কাল আসে– সে চলে গেলে আসে শুভ্র কাল। এই কালজ্ঞান থাকলে মানুষ শঙ্কিত হয় না, দুঃখ-বেদনায় মুষড়ে পড়ে না, হতাশায় মূহ্যমান হয় না। শেলীর মধ্যেও আমরা এই কাল-চেতনাকে দেখি। সেই জন্য শেলী মনে করতেন–

The reproductive half of the cycle, however, was unlikely to be shorter than the other half, which according to Prometheus had lasted 3,000 years ; and in any case an evil could not be tolerated just because if it were removed, new riddles of death (such an over population) might crop up in sixty centuries time. Besides, he foresaw that science, its eyes unbanded after, Jupiters downfall to probe deeper into nature's laws, would eventually extend human control over the physical as well as the social environment, and eliminate winter permanently in both. (Introduction: Shelley: Selected Poems and Prose: Chosen and edited by G.M.Mattews.)

অর্থাৎ, কালচক্রের পুনরুৎপাদনের অর্ধেক কাল বাকী অর্ধেকের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হতে পারে না। প্রমেথিউসের মতে যা তিন হাজার বছরে শেষ হয়। যে-ভাবেই হোক ক্ষতিকারক সময় প্রাকৃতিকভাবে নিঃশেষ হয়েও, নতুন মৃত্যুরহস্য (যেমন জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি) ষাট শতাব্দীর মধ্যে শস্য কর্তনের মত উৎখাত করা যেতে পারে। এ-ছাড়া তিনি পূর্বেই আঁচ করতে পেরেছিলেন বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাবে তার অন্তর্দৃষ্টি প্রাকৃতিক আইনের অন্তস্থলে প্রবেশ করবে, অবশেষে

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং শেষ পর্যন্ত শীতকে উভয় স্থান থেকে উৎখাত করবে।

এটা যদিও পৃথিবীর সমাজের পরিবর্তন কেন হবে, কখন হবে, শুভ-অশুভের কাল কতদিন স্থায়ী হবে এবং মানুষ শেষ পর্যন্ত শীতার্ত সময়কে স্থায়ীভাবে বিশ্ব থেকে নির্বাসন দেবে, সে সম্বন্ধে শেলীর নিজস্ব মন্তব্য; তবু এর মধ্যে রয়ে গেছে তাঁর আশাবাদী চিন্তার ধারণা। রবীন্দ্রনাথের "বৈশাখ" কবিতাটিতে শেলীর 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডে'র একটা সুদূরতর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা যখন পড়ি–

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক গগনে,
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ সনে
আকুল আকাশ–
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ ।

তখন শেলীর জীবনোপলব্ধির অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করি।

এখানে বলা ভালো, আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে বিশেষ করে কালবৈশাখী ঝড় হয়। এটা কখনও কখনও বৈশাখের সামান্য পূর্বে ও পরেও হয়ে থাকে। শুকনো গরম আবহাওয়ায় বৃষ্টিহীন প্রকৃতিতে হঠাৎ মেঘের আবির্ভাব ঘটে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গতির ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের আবির্ভাবে মনে হয় যেন খন্ড কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। এই ঝড়ের রূপকে শেলী বর্ণনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন এবং নজরুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নজরুল ইসলাম শুধু "প্রলয়োল্লাস" কবিতাতেই এই কালবোশেখীর কথা তথা ঝড়ের কথা উল্লেখ করেননি বা তার বর্ণনা করেননি। তিনি ঝড়-এর উপর দুটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। এর একটি 'ঝড়' (পূর্ব তরঙ্গ) অন্যটি 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ)। 'ঝড়' (পূর্ব তরঙ্গ) বাংলা ১৩৩১-এর শ্রাবণে অর্থাৎ ইংরেজী ১৯২৪-এর জুলাইতে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়; 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) প্রকাশিত হয় "বিষের বাঁশী" কাব্যে যার প্রকাশকাল ১৩৩১-এর ১৬ই শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯২৪-এর জুলাইতে। ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ) ঝড় (পূর্ব তরঙ্গ)-এর আগে লেখা এবং কবিতা হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। এটি প্রকাশিত হয় "কল্লোল"-এর ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় ১৩৩১-এর আষাঢ়ে অর্থাৎ ১৯২৪-এর জুনে।

www.pathagar.com

শেলীর "ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড" রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" এবং নজরুলের 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) এই তিন কবিতা রচনা কালের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। শেলী তাঁর কবিতা লিখেছিলেন ঝড়ের দিনে। তবে সেটা ছিল কার্তিক বা হেমন্তের ঝড়। সূর্যাস্তকালীন সময়ে বাজবিদ্যুত বৃষ্টি শিলাপাতের সঙ্গে যে প্রচণ্ড গতির ঝড় হয়েছিল তাকেই সামনে রেখে শেলী এই কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" কবিতার শীর্ষনামের নীচে লেখা আছে "১৩১৫ সালের ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।" আর নজরুল ইসলামের 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) লেখার ইতিহাস সম্পর্কে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন–

> "এই বৎসরই (১৯২৪) কবি কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা ও গান লেখেন। তার মধ্যে 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) কবিতাটি অন্যতম।... অনিয়মে ঘুরে ঘুরে কবির ব্যাসিলরি ডিসেনট্রি হল। প্রবল জ্বর ও রক্ত আমাশয়ে কবি প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছেন। এই রকম অবস্থায় একদিন বৈকালে আকাশ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে থমথমে হয়ে আছে। চোখ বুঁজে পড়ে আছেন নজরুল, দক্ষিণের দরোজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিঙ্গল বিহ্বল আকাশ, আমি তখন তাঁকে পরিচর্যারত। হঠাৎ চোখ খুলে আকাশের ঐ রূপ দেখে কলকণ্ঠে শিশুর মত উল্লসিত হয়ে দৌড়লেন কবি ছাদের দিকে। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, কী ব্যাপার। দীর্ঘ পল্লবায়ত চোখ, আপ্রাণ ছড়িয়ে দিলেন উদার আকাশে, ঘন কৃষ্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ বাবরী চুল উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হাওয়ায় সাপের মত। "জটাধারী গলজ্জল প্রবাহপ্লাবিত স্থলে, গলেহ লম্বলম্বি-তাং ভুজঙ্গ তুঙ্গ মালিকাম" (শিবতান্ডব স্তোত্র)-এর মতই কবিকে তখন জীবন্ত শিবের মতই মনে হচ্ছিল। আমি কোন রূপটা দেখব স্থির করতে পারছিলাম না। পরক্ষণেই শুরু হল ঝড়।
>
> পশ্চিম দিকের মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্বের দিকে। থমথমে স্থির আকাশের কোলে। প্রবল জ্বর নিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করলেন। আর মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করে বলতে লাগলেন "ঝড়– আমি ঝড়, আমি ঝড়!" যখন ঝড়ের শেষ জল এসে পড়ল তখন আমরা তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম। না হলে হয়ত, ধ্যানমগ্ন কবি প্রবল জ্বর নিয়ে ভিজে ভিজেও বাইরে থাকতেন।
>
> ঘরে এসে কাগজ পেন্সিল টেনে নিয়ে কবি 'ঝড়' কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা কবিতা ব্যাসিলরি ডিসেনট্রি ও প্রবল জ্বরের

www.pathagar.com

মধ্যে তিন চার ঘন্টা ধরে একাগ্র মনে লিখে আমাদের শুনিয়ে তবে তিনি বালিশে মাথা রেখে চোখ বুঁজলেন। (হুগলীতে : কাজী নজরুল)

নজরুল ইসলামের এই ঝড় ছিল সমকালীন সমাজ বিপ্লবের রূপরেখা– শেলীর 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইন্ডে'র মত। এ সম্বন্ধে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ; "এই কবিতাটিতে আছে প্রকৃতিকে সূক্ষ্মভাবে দেখবার ক্ষমতা, তাকে জাতীয় জীবনের উপযোগী করে তোলার নিপুণতা। তার মধ্যে ভবিষ্যত আন্দোলনের অপূর্ব ইঙ্গিত যেভাবে যোগ করা হয়েছে তা অনুভব করলে বিস্মিত হতে হয়।"

কবি ফররুখ আহ্‌মদ 'ঝড়'কে উপলক্ষ করে দু'টি কবিতা লিখেছেন। এর প্রথমটির নাম 'বৈশাখ' দ্বিতীয়টির নাম 'ঝড়'। 'বৈশাখ' ১৯৫৮-এর "পাকিস্তানী খবর"এ প্রকাশিত হয়। 'ঝড়'-এর সঠিক প্রকাশকাল না পাওয়া গেলেও ধারণা করা যায় ঐ বছরই সেটা প্রকাশিত হয়। 'বৈশাখ' ও 'ঝড়' আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ১৯৭৫-এ প্রকাশিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংকলিত হয় এবং পুনরায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৮০-তে প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। অবশ্য ফররুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতায় সংকলিত 'ঝড়' এবং কাফেলায় সংকলিত 'ঝড়' এক নয়। প্রথম 'ঝড়'টি একটি মাত্র সনেট। দ্বিতীয়টি সাতটি সনেটের সংকলন। প্রতিটি 'ঝড়'কে কেন্দ্র করে লেখা। প্রথম চারটি চতুর্দশপদীর শুরু এই সম্বোধনে– 'হে বন্য বৈশাখী 'ঝড়'!' ফররুখের 'বৈশাখ'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'-এর আঙ্গিকগত সাদৃশ্য নেই। কিন্তু তবু মনে হয় কোথাও সুদূর একটা সাদৃশ্য রয়ে গেছে। নজরুলের 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ)-এর সঙ্গে শেলীর 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড'-এর আঙ্গিকগত সাদৃশ্য নেই। তবু মনে হয় কোথাও একটা নিবিড় সাদৃশ্য রয়ে গেছে। ওদিকে ফররুখের 'ঝড়'-এর সঙ্গে শেলীর 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডে'র বক্তব্যের কোথাও কোথাও যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। ফররুখের 'বৈশাখ' ও 'ঝড়'-এর আঙ্গিক এক নয়, বক্তব্যও পৃথক। কিন্তু ফররুখ যখন 'ঝড়' শীর্ষনামের ৭নং সনেটটিতে বলেন–

চরম ধ্বংসের শেষে আসে নব সৃষ্টির আহ্বান,
তাই তো পরম কাম্য এ বিপ্লব, এ ঝড়ের গান।

তখন 'বৈশাখ' কবিতার শেষ স্তবকের শেষ দুটি পংক্তির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ফররুখের বক্তব্য ছিল–

শহীদী লহুর স্পর্শে প্রাণবন্ত হয় ফের এ জমিন কারবালার খাক;
তোমার ধ্বংসের সুরে অনাগত সৃষ্টি-স্বপ্নে মন তাই উধাও বৈশাখ।

www.pathagar.com

আসলে কবির সৃষ্টির মৌলিকতা বা স্বাতন্ত্র্য যে শুধু তার কথায় থাকে না, থাকে আঙ্গিকেও এইসব সাদৃশ্যমূলক রচনা পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখলে তা অনুধাবন করা যায়।

ফররুখের 'ঝড়'– বৈশাখের প্রতীক দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদ নয়, গীতার প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদী দর্শন নয় বা শেলীর প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদী দর্শন নয় বা মার্কসের Mechanical Materialism (যান্ত্রিক বস্তুবাদ) বা Dialectical Materialism (দ্বন্দ্ব প্রগতিমূলক বস্তুবাদ) নয়। তাঁর 'বিপ্লব' বা 'ইনকিলাব'– ইসলামী বিপ্লব। তাঁর 'ইনকিলাব' কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে। এখানে 'সাত সাগরের মাঝি'র রূপক-প্রতীকের অবসকিউরিটি বা অন্ধকার কাব্য সৌন্দর্যের ব্যবহার না করে কবি প্রভাত আলোর রশ্মি মাখানো ঝকঝকে ছুরির মত দৃশ্যকে স্পষ্ট করেছেন। আমরা যখন পড়ি–

মরু ঝঞ্ঝার মত উড়ে আসে আসে ইসলামী ইনকিলাব
এ ঝড়ের মুখে মরণ-নিদালী কুয়াশা-চাদর টানি কি লাভ
আয় ইনকিলাব !
আয় ইনকিলাব !

আয় !
হেজাজের ঝড় হেরা গহ্বর থেকে বিমুক্ত প্রাণোচ্ছল
জাগায়ে যারে এ মৃত জনপদ জনতার মন
পৃথ্বিতল
জ্বালায়ে যারে এ যুগ-সঞ্চিত অত্যাচারের
শিলা-অটল
জ্বালায়ে যারে এ হতাশার শ্বাস
নিরাশা বিলাস অজ-বিলাপ।
আয় ইনকিলাব !

অস্পষ্টভাবে এখানে তিনি 'ঝড়'কে ইনকিলাব বা বিপ্লব শুধু নয় ইসলামী ইনকিলাব বা ইসলামী বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন যার তুলনা করেছেন তিনি মরু-ঝঞ্ঝার সঙ্গে; হেজাজের ঝড়ের সঙ্গে।

তিনিও বিপ্লব চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন চেয়েছিলেন তাঁর 'ঝড়' কবিতায় তিনি সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন–

রুদ্ধগতি যে জীবন ক্লেদলিপ্ত জড়তায়, পাপে
কলঙ্কিত যে জীবন আত্মরতিমগ্ন-পাপে ডোবে

www.pathagar.com

হতাশ্বাস যে জীবন আত্মঘাতী ব্যর্থতার ক্ষোভে,
লক্ষ্যভ্রষ্ট যে জীবন পৈশাচিক বিকৃতির নীড়ে,
অভিশপ্ত যে জীবন সর্বগ্রাসী পাশবিক লোভে,
কলুষিত সে জীবনে, হে দুর্বার, আস তুমি ফিরে,
হানা দেও সে জীবনে হে বৈশাখী ঝড়, বজ্র বেগে,
প্রথম ধ্বংসের রোল তোল সেই জিন্দেগানী ঘিরে,

জাগায়ে মৃত্যুর মায়া অন্ধকার প্রলয়ের মেঘে
চকিতে জাগায়ে বিশ্ব-মৃত্যুভীত দুনিয়া জাহান
উন্মত্ত নেশায় তুমি দেখা দেও উদ্দাম আবেগে,

আত্মবঞ্চনার কিংবা বিকৃতির করি অবসান
হে বন্য বৈশাখী ঝড়! দাও তুমি সংগ্রামী আহ্বান।

আপোষহীন তাঁর এই বিপ্লবী চেতনা ইসলামী বিপ্লবের চেতনা। এখানে কোন আপোষ ভদ্রতা নেই। ছদ্মবেশী শত্রুর শেখানো উদার গণতন্ত্রের কাপট্য নেই। তাই তিনি তাঁর 'বৈশাখ' কবিতায় বলেন–

সংগ্রামী তোমার সত্তা অদম্য, অনমনীয়, বজ্রদৃঢ় প্রত্যয় তোমার,
তীব্র সংঘর্ষের মুখে বিশাল সৃষ্টিকে ভেঙে অনায়াসে কর একাকার ;

সম্পূর্ণ আপোষহীন। মধ্যপথে কোন দিন থামো না তো জান না বিরতি,
তোমার অস্তিত্ব আনে ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে অবিচ্ছিন্ন, অব্যাহত গতি;
প্রচণ্ড সে গতিবেগে ভাঙে বস্তি, বালাখানা, ভেঙে পড়ে জামশিদের ঝাঁক,
লাভ, ক্ষতি, সংজ্ঞাহীন, নিঃশঙ্ক নিঃসঙ্গ তুমি, হে-দুর্বার দুর্জয় বৈশাখ !

এই কবিতায় ইসলামী বিপ্লবের সুফলকে তিনি দেখেছেন সে-জন্যে শেলী নজরুলের মত তিনিও আশাবাদী যে এই বিপ্লবের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণময় সৃষ্টিসুন্দর সময়ের জন্ম হবে। তাই তিনি বলেন–

বৈশাখ তোমার স্রষ্টা জব্বার, কাহহার যিনি রহিম রহমান;
অশেষ রহমত যাঁর বৃষ্টি ধারা নিয়ে আসে জীবনের নব রূপায়ণ,
ধ্বংসের সমাধি-স্তূপে সবুজ ঘাসের শীষে দেখা দেয় জান্নাত নতুন,
শহীদী লহুর স্পর্শে প্রাণবন্ত হয় ফের এ জমীন কারবালার খাক ;
তোমার ধ্বংসের সুরে অনাগত সৃষ্টি-স্বপ্নে মন তাই উধাও বৈশাখ।

www.pathagar.com

এই অনাগত সৃষ্টির স্বপ্ন ছিল বলে শেলী ও নজরুলের মত বৈশাখের ঝড়ের দাওয়াত দিয়েছেন ফররুখ। এইখানে ঐ দুই পূর্বসূরীর সঙ্গে ফররুখের কোন বিবাদ নেই।

রচনা সময়
১০-১০-৯৫ এবং
১৯-০৪-২০০২

www.pathagar.com

ফররুখের কবিতায় ঝড় ও বৈশাখ

কবিতায় ঝড় ও বৈশাখ নিয়ে আলোচনা করলেও আজকের আলোচনায় তিনজন কবির কবিতায় যে বৈশাখ ও ঝড়ের ব্যবহার আছে তার মধ্যেই আমাদের আলোচনা মূলত সীমাবদ্ধ থাকবে। এই কবিদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহ্‌মদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে শেলী Ode to the West Wind নামে একটি কবিতা লেখেন। এটা ছিল ঝড়ের প্রশস্তি। সেখানে সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক হিসাবে– আরও গভীরভাবে বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে ঝড়কে রূপায়িত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ঝড় ধ্বংসের প্রতীক। কিন্তু এই ধ্বংসই নব-সৃষ্টির জন্মদাতা। ঝড় শুধু ধ্বংসই করে না সাথে সাথে আবার সৃষ্টির বীজ রোপণ বা বপন করে যায়। কবিতাটির শেষ তিন স্তবক এমনি–

Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth !
And by the incarnation of this verse,

Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened Earth

The trumpet of a prophecy ! O Wind,
If winter comes, can spring be far behind ?

এর শেষের পংক্তিটিতেই আছে শেলীর বক্তব্যের সারাৎসার। আমার দুর্বল অনুবাদে বাংলাটা এমনি–

মুমূর্ষু আমার চিন্তা উড়ে যাক এ পৃথিবী হতে
বিশুষ্ক পাতার মত, ত্বরান্বিত হোক সৃষ্টি লয় !
নতুন কাব্যের মন্ত্র ছড়িয়ে যাক সে নবীন পথে

জ্বলন্ত চুল্লি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বাহিরায়
মানবকুলের মধ্যে তেমনি সে উৎক্ষিপ্ত হোক ।
নিদ্রিত জগৎ পানে ছুটে যাক মোর ওষ্ঠ থেকে

সে ভবিষ্য বাণী, হে ঝড় ! যে তূর্যনাদের গান কয়
আসে যদি শীত তবে বসন্ত কি বেশী দূরে রয় ?

www.pathagar.com

শেলীর এই কবিতাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহ্‌মদের বৈশাখ ও ঝড়ের কবিতার উপর প্রভাব রেখেছে বলে আমার ধারণা। তবে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। বাংলা ঋতুর বিবর্তন অনুযায়ী বৈশাখের সঙ্গে ঝড়ের যে আত্মিক সম্পর্ক আছে ইংরেজী ঋতুর নিয়মে সেটা বৈশাখে পড়ে না। বাংলায় ঋতু ছ'টা– দুই দুই মাসে বিভক্ত। সে হিসাবে গ্রীষ্ম ঋতু বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠকে নিয়ে। ইংরেজী বছরে ঋতু চারটি– Summer, Autumn, Winter, Spring. তিন তিন মাসে এক একটি ঋতু বিভক্ত। সে হিসাবে ওদের ফাল্গুনের শেষ ভাগ এবং চৈত্রের প্রথম ভাগ মিলিয়ে ওদের বসন্ত শেষ হয় May তে। Summer-বা গ্রীষ্ম শুরু হয় জুন থেকে। তার মানে জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগটা পড়ে জুনের প্রথম ভাগে। আর ওদের দ্বিতীয় ঋতু Autumn-শুরু হয় September থেকে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর আর নভেম্বর মিলিয়ে ওদের Autumn। এ-সময় আমাদের বাংলা মাসের বিভাজন অনুযায়ী ভাদ্রের অর্ধেক থেকে অঘ্রাণের প্রথম অর্ধেক। তার মানে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ– এই চার মাস পড়ে যায়। এ-সময় আমাদের ঋতু শরৎ ও হেমন্ত। উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে যেমন বৈশাখে ঝড় হয় তেমনি আশ্বিনেও ঝড় হতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্বিনের ঝড়টা তেমন অবশ্যম্ভাবী নয় যেমন অবশ্যম্ভাবী বৈশাখী ঝড়। এ-জন্যেই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখের কথা আসে। সে-জন্যে কাল বোশেখী বলতে মূলত আমরা দুরন্ত বা দুর্দান্ত ঝড়কে বুঝি। কোন গতিশীল ধ্বংসাত্মক বিষয়ের উপমা দিতে তাই কবিরা কাল-বৈশাখী বা কাল-বোশেখীর কথা উল্লেখ করেন। নজরুল তাঁর 'ভাঙার গান' কবিতায় সে জন্যেই বলেছেন–

নাচে ঐ কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল বসে কি ?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি !

আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পৃথিবী' কবিতায় লিখছেন–

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে
ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মত তোমার ঝড়–
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠ্‌ল যেন
কেশর ফোলা সিংহ ;

www.pathagar.com

তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উপুড় হ'য়ে।

এখানে ঝড় ও বৈশাখ একাত্ম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বৈশাখ ও ঝড় যেন একক সত্তা। শেলীর 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড' অটাম বা হেমন্তের ঝড়। এটাকে "আশ্বিনের ঝড়"ও বলা যেতে পারে। "ওড টু দি ওয়েস্ট উইন্ড"-এর প্রথম পংক্তিটি এই– 'O Wind West Wind, thou breath of Autumn's being'। এখানে স্পষ্টভাবে Autumn বা হেমন্তের (শরৎ-হেমন্ত বললে সঠিক হয়) উল্লেখ আছে। সুতরাং শেলীর ঝড়টা বৈশাখের ঝড় নয় আশ্বিনের ঝড়। কিন্তু নজরুলের ঝড়ের উপর লেখা দু'টি কবিতার একটি– "বিষের বাশী"তে প্রকাশিত "ঝড়" কবিতার নিচে লেখা আছে "পশ্চিম তরঙ্গ"। এটা যেন "ওয়েস্ট উইন্ড"-এর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। যদিও কবিতা দু'টির প্রকাশ ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু ওয়েস্ট উইন্ডের স্ফুলিঙ্গে নজরুলের "ঝড়"-এর আগুন জ্বলে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। "ছায়ানট"-এ প্রকাশিত নজরুলের "ঝড়" কবিতার নাম "পূবের হাওয়া"। এর নিচে লেখা আছে– "ঝড় : পূর্ব তরঙ্গ"। সম্ভবতঃ ঝড় 'পশ্চিম তরঙ্গ' লেখার পর তিনি ঝড় 'পূর্ব তরঙ্গ' লেখার পরিকল্পনা করেন। সুতরাং এরও জনকের কিয়দংশ ভূমিকা যে শেলীর ওয়েস্ট উইন্ড সেটা ভাবা অনুচিত হবে না।

'কাফেলা'য় প্রকাশিত ফররুখের 'ঝড়' কবিতাটির উপর শেলীর ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাব শুধু চিন্তার দিক দিয়ে নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও। ছয় পর্বে বিভক্ত "ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড"-এর প্রতি পর্বে আছে পাঁচটি করে স্তবক। প্রথম চারটি স্তবক তিন পংক্তির, শেষ স্তবকটি দু' পংক্তির। ফররুখের "ঝড়" কবিতাটি সাত পর্বে বিভক্ত। এর প্রতিটি পর্বেও আছে পাঁচটি করে স্তবক। এরও প্রথম চারটি স্তবক তিন পংক্তির এবং শেষ স্তবকটি দু'পংক্তির। পার্থক্য শুধু শেলীর ছয় পর্বের স্থানে এখানে পর্ব আছে সাতটি। আর যে-কথা পূর্বে বলেছি বাংলা গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাস বৈশাখের সংগে ঝড়ের যে আত্মিক সম্পর্ক ফররুখের 'ঝড়' কবিতায় সেই বৈশাখকে যথারীতি উপস্থাপন করা হয়েছে। ফররুখ লিখছেন–

হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! হে দুর্দম ! জীবন-মৃত্যুর
হিংস্র পটভূমিকায়– ভ্রাম্যমাণ, তুমি যাযাবর,
পাড়ি দিয়ে যেতে চাও মহাবিশ্ব, দূরান্ত সুদূর।

এবং ফররুখ যে 'বৈশাখ' শিরনামে কবিতাটি লেখেন তার গতিদীপ্ত বাণীর মধ্যে আছে পূর্বে উল্লেখিত "ঝড়" কবিতার উদ্দীপ্ত গতির বাণীর বলিষ্ঠতা। সে জন্য

www.pathagar.com

এ-কবিতাটিকেও 'ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডে'র উৎস বললে খুব বেশী অযৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না।

এইবার রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" এবং "বৈশাখ" কবিতা দু'টির কথা উল্লেখ করতে হয়। "বর্ষশেষ" কবিতাটির নিচে লেখা আছে '১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'। এখানে মূলতঃ ঝড়ের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে এবং এখানেও বৈশাখের কথা উল্লেখ করে ('ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য হোক তবে')– ঝড় ও বৈশাখকে তিনি এক সূত্রে গেঁথেছেন। তিনি যখন বলেন–

হে দুর্দম, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজপ্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে ;
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।

তখন ভাষার কারুকার্য ছাড়া শেলীর বক্তব্য থেকে তিনি সরে যেতে পারেন না। তাঁর চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে শেলীর দৃষ্টির আদল। তাঁর "বৈশাখ" কবিতাটি সম্বন্ধেও এ-কথা বলা চলে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন–

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি ওঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

তখন এটাকেও ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডের অনুরণন না ভেবে পারা যায় না। উদ্ধৃত স্তবকটি শেলীর কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ নয়, কিন্তু এর পাশে শেলীর–

Yellow and black and pale and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes

পড়লে বোঝা যায়, ভাবানুবাদের মাধ্যমে একটি মৌলিক কবিতা আর একটি মৌলিক কবিতার কিভাবে জন্ম দিচ্ছে। এজন্যেই সম্ভবত এজরা পাউণ্ডের

www.pathagar.com

Selected poems-এর ভূমিকাতে এলিয়ট বলেছিলেন, absolutely original অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মৌলিক কোন কবিতা নেই। তিনি এ পর্যন্ত লিখতে দ্বিধা করেননি যে : The poem which is absolutely original is absolutely bad অর্থাৎ যে কবিতা যত বেশী মৌলিক সে কবিতা তত বেশী খারাপ। এলিয়ট সত্যিকার মৌলিকতা সম্বন্ধে উক্তি করতে গিয়ে বলেছিলেন– True originality is mere development মানে যথার্থ মৌলিকতা কবিতার উৎকর্ষসাধন। "ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড"-এর অনুসরণে বা অনুরণনে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহ্‌মদ যে-সব কবিতা 'ঝড়' বা 'বৈশাখ'-এর উপর লিখেছেন তার মৌলিকত্ব ঐ development বা উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য, উপরে আলোচিত চার কবির চিন্তার সাদৃশ্য থাকলেও তার মধ্যে বৈসাদৃশ্য যে নেই তা নয়। কবিতায় আঙ্গিক বা আধারের গুরুত্ব যে কত সেটা ঐ বৈসাদৃশ্যের মধ্যে নিহিত আছে। এখানে আলোচনার পরিসর সীমিত বলে বিশদ বিশ্লেষণে যাওয়ার উপায় নেই। তবু উপসংহারে নজরুল ইসলামের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ আলোচনা আরও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নজরুল ইসলামের এই কবিতার নাম "প্রলয়োল্লাস"। এর মধ্যেও আছে ঝড়ের সঙ্গে সেই বৈশাখের উচ্চারণ। প্রথম স্তবকেই নজরুলকে বলতে দেখছি–

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়।

এবং এই কবিতাতেই আছে থিসিস এ্যান্টিথিসিসের বা দ্বন্দ্ব চিন্তার দ্বান্দ্বিক দর্শন– যা প্রথমে শেলীর চিন্তায় উদ্ভূত হতে দেখি। তারপর তার বিচিত্র ব্যবহার দেখি বাঙালী তিন প্রধান কবির কাব্যে। রবীন্দ্রনাথে এই দর্শন খুব স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়নি– নজরুলে তা বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় ব্যক্ত হয়েছে। আর ফররুখ এক বিপ্লবী চেতনাকে পটভূমিতে রেখে তাকে সাজিয়ে তুলেছেন নতুন রূপে। তিনি যে আদর্শের অনুসারী, সমাজ জীবনে তার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুক্তি আসবে এটাই জোরালো উচ্চারণে ব্যক্ত করছেন তিনি "ঝড়" ও "বৈশাখ"-এর প্রতীকে। শেলী, নজরুল প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয় বিবর্তনে বিশ্বাসী। অন্ধকারের পর আলোর আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী সেই আশার অনিবার্যতাকে রূপায়িত করেছেন তাঁরা। আর রবীন্দ্রনাথ শব্দের অন্তরালের শব্দাতীত অর্থের

www.pathagar.com

ইঙ্গিত দিয়ে শুনিয়েছেন সেই আশ্বাসের বাণী। তাঁর চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যব্যঞ্জনার স্ফূর্তির সুর।

শেষে এ-কথাটি বলতেই হয় যে, শেলীর মত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহ্‌মদও সমাজের পরিবর্তন চেয়েছেন, গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। বিশেষ করে শেলী নজরুল ইসলাম ফররুখের বক্তব্যে ধরা পড়ে যে আপাত ধ্বংস নতুন সৃষ্টির জনক। বৈশাখী ঝড় বা ঝড় তাই ভীষণ হলেও, ভীষণ বিপ্লবের মত উজ্জ্বল নতুন সৃষ্টিকেই স্বাগত জানায়। বৈশাখ ও ঝড় তাই আশা ও সম্ভাবনার প্রতীক।

রচনা সময়
৯-৪-৯৩

www.pathagar.com

বৈশাখ ও ফররুখ

১৯৫৮-য় পাকিস্তানী খবরে ফররুখের 'বৈশাখ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। (সম্ভবতঃ ষাটের দশকে দৈনিক পাকিস্তানে বাংলাদেশের দৈনিক বাংলায় কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।) কবিতাটি প্রকাশের সাথে সাথে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবিতাটির স্তবক সংখ্যা ২০টি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কবিতার প্রথম স্তবকটি দু'পংক্তির। তার পর বাকি ১১টি স্তবক ছ'পংক্তির। প্রথম স্তবকের প্রথম পংক্তিটি ১৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পংক্তিটি ৩০ মাত্রার। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তিটি ২২ মাত্রার বাকি ৫ পংক্তি ২৬ মাত্রার। তৃতীয় স্তবকের সব পংক্তি ২৬ মাত্রার। চতুর্থ স্তবকের প্রথম পংক্তি ২২ মাত্রার বাকি ৫ পংক্তি ২৬ মাত্রার। পঞ্চম স্তবকের প্রথম, ২য় ও ৫ম পংক্তি ২২ মাত্রার ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ পংক্তি ২৬ মাত্রার। ৬, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭,১৮ স্তবকের সব পংক্তিগুলো ২৬ মাত্রার। বাকী স্তবকগুলোতে এই মাত্রার পরিমাণ সমমাপে স্থির থাকে নি। কোন কোন স্তবকের কোন কোন পংক্তি ২২ বা ২৪-এ নেমে এসেছে। নেমে আসা পংক্তির অধিকাংশ ২২ মাত্রার। কেবল শেষ অর্থাৎ ২০ নম্বর স্তবকটির প্রথম পংক্তিটি ২৪ মাত্রার।

মাত্রা কমের এই উনিশ বিশের পার্থক্যে তাই বলে মাত্রা পতন হ'য়েছে এমন মনে করার কারণ নেই।

আবেগমন্ডিত এই ছন্দ প্রবল ঢেউ-এর গতি নিয়ে এমনভাবে সামনে ছুটেছে যে মনে হয় না– মাত্রার পতনে কবিতাটা কোথাও হোঁচট খেয়েছে। আসলে কবিতাটির নাম 'বৈশাখ' হলেও এর নাম 'ঝড়' দিলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না। কারণ এ বৈশাখী ঝড়েরই প্রতীক। সে জন্যে এর ছন্দে আছে ঝড়ের শক্তি ও গতি– তার প্রচণ্ডতা ও প্রবলতা।

মধুসূদন পয়ারের প্রাচীন মাপ অনুযায়ী অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করলেও পংক্তির মাপ ১৪ মাত্রা রেখেছিলেন। "বলাকা"য় রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখতে গিয়ে অসমমাত্রার যে ছন্দ আবিষ্কার করেন সেখানে দেখা গেলো সবচেয়ে কম ছোট পংক্তিটি ২ মাত্রার এবং সবচেয়ে বেশী বড় পংক্তিটি ১৮ মাত্রার। ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই ১৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের সম পরিমাপের পংক্তিতে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। এর অনুসরণ করে মোহিতলাল মজুমদারও কবিতা লিখেছেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম তাঁর 'ঝড়', 'পুজারিণী' ইত্যাদি অসম মাত্রার প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে লেখা কবিতার কোন কোন পংক্তিকে

www.pathagar.com

২২, ২৪, ২৬, ৩০ এমনকি ৩৪ মাত্রায় দীর্ঘায়িত করেন। যেমন 'মহাসিন্ধু শঙ্খে গর্জে অভিশাপ-আগমনী কলকল কল্ কলকল কল্ কলকল কল্।' তাঁর বিখ্যাত 'ঝড়' কবিতার এই পংক্তিটি ৩৪ মাত্রার। এই ধরনের অসম মাত্রার পংক্তির প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে পরবর্তী কালে কবি শাহাদাৎ হোসেন, জীবনানন্দ দাশ এবং বুদ্ধদেব বসুও কবিতা লিখেছেন। ফররুখ অনেকখানি দুঃসাহস দেখিয়ে (তাঁর এই দুঃসাহস দেখানোর ক্ষমতা ছিল) অসম মাত্রার পংক্তির নয়, সমমাত্রার পংক্তির-এই পরীক্ষামূলক কবিতাটি লেখেন। ১৯২৪-এ হুগলিতে একদা বৈশাখী ঝড়ের দিনে নজরুল ঝড়ের উপরে যে কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটা পড়লে মনে হয় এই ধরনের ছোট এবং দীর্ঘ মাত্রার গম্ভীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই কবিতাটি না লিখলে ঝড়ের ধ্বংসাত্মক দুর্দান্ত রূপটিকে তিনি সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারতেন না। ফররুখেরও মনে হয়েছিল ঝড়ের জনক বৈশাখের বিশাল বলীয়ান রূপটিকে এমন এক ছন্দে আঁকতে হবে যাতে দমফাটা নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হয়। ক্রোধ, ক্ষিপ্ততা এবং পরম প্রচণ্ডতার বিশাল উচ্ছ্বাসকে কোন পল্‌কা বা চটুল ছন্দে রূপ দেওয়া যায় না। নজরুলের 'ঝড়' কবিতার ছন্দের সঙ্গে বৈশাখের ছন্দের পার্থক্য এই যে 'ঝড়'-এর ছন্দ যেন এক বল্গাহীন ঘোড়া– সে তার স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভর করে উন্মাদের মত ছুটছে। আর 'বৈশাখ' সেই রেসের ঘোড়া তার গতি দুর্দান্ত কিন্তু তার মুখে আছে বল্গা আর তার পিছে আছে দক্ষ শিক্ষিত সওয়ার। সে জন্যেই এর স্তবক পরিমিত মাপের, এর পংক্তিগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমমাত্রার।

বলা আবশ্যক, ফররুখের 'বৈশাখ' প্রকাশের পর অনেকে বলেছিলেন, এটা রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' কবিতারই অনুকরণ না হ'লেও অনুসরণ। কিন্তু 'বৈশাখ' এবং 'বৈশাখ' কেন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথের লেখা "বর্ষশেষ" কবিতা দুটির ছন্দের সঙ্গে বা ভাবকল্পনার সঙ্গে সূক্ষ্মতম মিল কোথাও থাকলেও ফররুখের 'বৈশাখ'-এর পার্থক্যটা অনেক বেশী চওড়া। রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' কবিতার প্রথম স্তবকটি এমনি–

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক–
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ॥
* * *
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,

www.pathagar.com

পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে
শুষ্কজল নদীতীরে, শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী–
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ॥

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার ॥

এই কবিতায় বিশুষ্ক আবহাওয়াময় ভীষণ রৌদ্রতাপে একটি দগ্ধ পরিবেশের দানব ভয়াল মূর্তি আঁকা হয়েছে। গম্ভীর তৎসম শব্দের সুপ্রযুক্ত ব্যবহারে সৃষ্টি করা হয়েছে ভয়াকীর্ণ ভাবগম্ভীর পরিবেশের। যদিও সেখানে ঝড়ের উল্লেখ নেই তবু আমরা যখন এই পংক্তিগুলো পড়ি–

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্র বেগে উঠেছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুবাশি–
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

তখন এর মধ্যে ঝড়েরই রূপ প্রকাশ হতে দেখি। অথবা তিনি যখন বলেন–

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধুলাসম উড়ুক গগনে,
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তখন তার মধ্যে ঝড়েরই ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। কিন্তু 'বৈশাখ' এর এখানে প্রধান রূপটি পদ্মাসনে বসা রক্তনেত্র সন্ন্যাসীর। এই রূপ গতির নয় স্থিতির। এখানে ঝড়কে শক্তির প্রতীক বলেও মনে হয় না। তবে "দীপ্তচক্ষু" যে সন্ন্যাসীর রূপ এখানে আঁকা হয়েছে তা হিন্দু দেবতা শিবের। রুদ্র দেবতা শিবও শক্তির প্রতীক বটে। তবে মনে হয় না কবিতাটিতে গতিশক্তির প্রচণ্ডতাকে ছন্দে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বরং রবীন্দ্রনাথ তার 'পৃথিবী' কবিতায় যখন বৈশাখী ঝড়ের এই রূপ আঁকেন–

www.pathagar.com

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুতচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখীর মত তোমার ঝড়–
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশরফোলা সিংহ ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উপুড় হয়ে ;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল ছেঁড়া কয়েদী ডাকাতের মত।

তখন সেখানে একটা গতির ও শক্তির প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করা যায় যা যথোপযুক্ত শব্দ ছন্দে অঙ্কিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" কবিতাতেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ও তৎসম শব্দের গম্ভীর ব্যবহার দেখি আমরা কিন্তু সেখানে ঝড়ের আবেগের গভীর আলোড়ন দেখি না। এখানে 'কালবৈশাখী' শব্দ আছে কিন্তু কালবৈশাখীর যথার্থ মত্ত রূপ নেই। এখানে কবিকে লিখতে দেখছি–

আনন্দে আতঙ্কে মিশি ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হা হা রবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

অর্থগত দিক থেকে ধ্বংস সৃষ্টির একটি রূপক ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে এবং এর কাব্যগুণের চমৎকারিত্ব সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই– কিন্তু এখানে সেই ছন্দগতি নেই বা ভাবাবেগের প্রচণ্ড স্ফূর্তির প্রকাশ ঘটেনি যা নজরুলের 'ঝড়' কবিতায় দেখি, দেখি ফররুখের 'বৈশাখ'-এ।

স্পষ্ট হওয়ার জন্যেই ফররুখের 'বৈশাখ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। ফররুখ লিখছেন–

অগণ্য, অসংখ্য বাধা ওড়ায়ে প্রবল কণ্ঠে তুলি তীব্র পরুষ হুঙ্কার
হে বৈশাখ! এস ফিরে বজ্রের আগুনে দীপ্ত– আল্লার দুধারী তলোয়ার!
ভ্রষ্ট, গুমরাহা যত নির্বোধের অহমিকা শূন্যগর্ভ দম্ভ, আস্ফালন
চূর্ণ করি এস তুমি শংকাশূন্য রণাঙ্গনে সমুজ্জ্বল সেনানী যেমন।

www.pathagar.com

নিঃশঙ্ক আল্লার শের– দীপ্ত আবির্ভাবে যার পলাতক ফেরুপাল কাক;
সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ!

মিথ্যা বাতিলের দুর্গ ধ্বংস করি, ধ্বংস করি বিভীষিকা সঞ্চিত রাত্রির
তৌহিদী পয়গাম কণ্ঠে যেমন দাঁড়ালো এসে মর্দে খোদা জালালী ফকীর।
মুসা কালীমের মত 'আসা' হাতে তীব্র দৃষ্টি বাংলার প্রান্তরে
চৈত্রের বিভ্রান্তি ভেঙে তেমনি বৈশাখ এস খররৌদ্রে এস ঘরে ঘরে,
তোমার সংঘাতে এই পৌত্তলিক জড়তার মৃত্যুম্লান শর্বরী পোহাক;
কালের কুঠার তুমি নিষ্প্রাণ এ জনারণ্যে এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ।

ধ্বংসের নকীব তুমি হে বৈশাখ এস ফিরে এস তুমি অপূর্ব সুন্দর,
বৎসরের সূচনায় পিঙ্গল আকাশে দেখি অগ্নিবর্ণে তোমার স্বাক্ষর।
প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে অচ্ছেদ্য অভিন্ন সত্তা, ধূলিরুক্ষ এ-পাক জমিনে,
জ্বরাগ্রস্ত পৃথিবীতে, অথবা বিক্ষত প্রাণে এস তুমি এস পথ চিনে,
তোমার প্রাণের তাপে ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের ক্লেদ গ্লানি সব জ্বলে যাক;
পুরাতন বৎসরের প্রান্তর ছাড়ায়ে এস; এস চির দুর্জয় বৈশাখ।

রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'-এর সঙ্গে ফররুখের 'বৈশাখ'-এর আঙ্গিক ও ছন্দগত পার্থক্য ধীমান পাঠককে আর আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈশাখ'-এর প্রথম স্তবকে প্রথম ও পঞ্চম পংক্তিতে এবং শেষ স্তবকের ১ম ও ৫ম পংক্তিতে 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ! 'হে ভৈরব, 'হে রুদ্র বৈশাখ' এবং 'ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ' এবং 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!' বলে বৈশাখকে সম্বোধন করেছেন। চতুর্থ স্তবকের ১ম ও ৫ম পংক্তিতে বৈশাখকে 'দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী' এবং ৬ষ্ঠ স্তবকে প্রথম পংক্তির আরম্ভে 'হে বৈরাগী' সম্বোধন করেছেন। কিন্তু ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই ৮টি স্তবকে 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' বাক্যটি আর পুনরুচ্চারিত হয়নি। অন্যদিকে ফররুখের "বৈশাখ"-এর ২০টি স্তবকের প্রতিটিতেই 'হে দুর্বার, দুর্ধর্ষ বৈশাখ', 'এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ', 'এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ', 'এ জীবন সংগ্রামে বৈশাখ', 'এস চির দুর্জয় বৈশাখ', 'হানা দেয় প্রমত্ত বৈশাখ','আসে আজ প্রমত্ত বৈশাখ', 'এস ফিরে উন্মত্ত বৈশাখ', 'চল জঙ্গী নির্ভীক বৈশাখ', 'হে নির্মম নির্ভীক বৈশাখ' এবং শেষ স্তবকে 'মন তাই উধাও বৈশাখ' বলে বৈশাখকে উন্মত্ত, প্রমত্ত, দুর্জয়, নির্ভীক, নির্মম, দুর্বার ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। বৈশাখকে তিনি আরও স্পষ্টভাবে সম্বোধন করেছেন 'ধ্বংসের নকীব' হিসাবে। তিনি তাকে 'আল্লার দুধারী তলোয়ার', 'দিগ্বিজয়ী জুলকার্নায়েন', 'নিঃশঙ্ক আল্লার শের', 'কালের

www.pathagar.com

কুঠার' ইত্যাদি বলেছেন এবং বলেছেন 'বিপ্লবের প্রতীক অম্লান'। এই যে 'বৈশাখকে' ধ্বংসের প্রতীক বা বিপ্লবের প্রতীক বলে সম্ভাষণ– এতেই বোঝা যায় ফররুখ একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শকে বা চিন্তা-দর্শনকে তাঁর কবিতার মর্মার্থ হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাঁর কথা আরও স্পষ্ট হয়েছে যখন তিনি বলেছেন, 'তোমার সংঘাতে এই পৌত্তলিক জড়তার মৃত্যুম্লান শর্বরী পোহাক।' আসলে বৈপ্লবিক ইসলামী চিন্তাদর্শকেই ফররুখ 'বৈশাখ'-এর প্রতীকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, 'বৈশাখ' নামে ফররুখ পূর্বে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তাঁর "হে বন্য স্বপ্নেরা" কাব্যগ্রন্থে "বৈশাখ" নামে একটি কবিতা আছে। তিন স্তবকের ছোট্ট এই কবিতার শেষ স্তবকটি এমনি–

নিস্তরঙ্গ জীবনে সে তো মৃত্যু মোর,
তুফান তুরঙ্গমে আনো প্রাণ সেথায়,
আকাশ জুড়ে ছড়াও ঝড়ের বর্ণঘোর
মৃত্যু নিবিড় বর্ণে পাংশুল রঙ কে চায়?

তাঁর সনেট সংকলন মুহূর্তের কবিতা গ্রন্থে 'বৈশাখ' নামের একটি সনেট আছে সেটি এই–

বৈশাখের মরা মাঠ পড়ে থাকে নিস্পন্দ যখন
নিষ্প্রাণ, যখন ঘাস বিবর্ণ নিষ্প্রভ ময়দান,
যোজন যোজন পথ ধূলিরুক্ষ, প্রান্তর বিরাণ ;
শুকনো খড় কুটো নিয়ে ঘূর্ণি ওঠে মৃত্যুর মতন ;
সে আসে তখনি। তখনি তো ঘিরে ফেলে উপবন,
বন ; চোখের পলকে, মুছে ফেলে, ঘুমন্ত নিখিল
সে আসে বিপুল বেগে ! কণ্ঠে তার সুরে ইস্রাফিল
বজ্রস্বরে কথা কয়, জানে না সে গণ্ডীর বন্ধন।
মানে না সে আহাজারি বিশুষ্ক মাঠের, মানে না সে
পথের হাজার বাধা, অরণ্যের ক্লান্ত আর্তস্বর।
বিদ্যুত চমকে তার সাড়া জাগে, সমস্ত আকাশে,
জেগে ওঠে বজ্র রবে এক সাথে, নির্জীব প্রান্তর,
দিক দিগন্তের পথে চলে যায়, নিমেষে খবর ;
ধ্বংসের আহ্বান নিয়ে অনিবার্য সে আসে সে আসে

'বৈশাখ'কে নিয়ে সম্ভবতঃ এটা ফররুখের দ্বিতীয় কবিতা। সে-জন্যেই এখানে 'বৈশাখ'কে আর একটু পরিণত চিন্তায় আঁকা। তবে এই আট সাট বাঁধনের

www.pathagar.com

চমৎকার সনেট লেখার পরেও ফররুখ তৃপ্ত হতে পারেননি। শেষে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এসে 'প্রমত্ত-উন্মত্ত-দুর্জয়-দুর্বার-নির্মম-নির্ভীক ধ্বংসের নকীব' বৈশাখের তিনি যে রূপ আঁকলেন তাঁর পূর্বের লেখা 'বৈশাখ' ও 'বৈশাখী' তাঁর কাছে ম্লান হ'য়ে গেছে। এ থেকে ফররুখের বিশুদ্ধ শিল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার সংশোধিত ও সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টার মানসিকতাটি লক্ষ্য করা যায়। অসামান্য না হওয়া পর্যন্ত যে তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি– তাঁর সৃষ্টিক্ষুধা তার স্বাক্ষর। তৃতীয় বারের মত লেখা 'বৈশাখ'ই ছিল তাঁর 'বৈশাখ' সম্বন্ধে লেখা সর্বোত্তম কীর্তি। এবং এটা শুধু তাঁর কাব্যাবলীর মধ্যে অনন্যকীর্তি নয়, বাংলা কাব্য সাহিত্যে এটা একটা অনন্য সৃষ্টিকীর্তি– যার সমতুল্য আর একটা কবিতা তাঁর জীবন কালে তিনি লিখে যেতে পারেননি। ছন্দ-ভাব-ভাষা সবকিছু মিলিয়ে এটা সত্যিই তাঁর নির্মিত একটি অপূর্ব তাজমহল। তাঁর অতি ক্ষমতাদৃপ্ত প্রতিভার এটি একটি অতুলনীয় স্বাক্ষর।

পরবর্তীকালে ফররুখ 'বৈশাখ' কবিতাটি লেখার কোন নিকটতম সময়ে "ঝড়" নামে ৭ পর্বে বিভক্ত ৩৫ স্তবকের একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। এটিও বৈশাখ সম্পৃক্ত। উদ্বোধনী স্তবকটি এমনি–

> হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! হে দুর্দম ! জীবন-মৃত্যুর
> হিংস্র পটভূমিকায় ভ্রাম্যমান, তুমি যাযাবর,
> পাড়ি দিয়ে যেতে চাও মহা বিশ্ব, দুরান্ত সুদূর !

এবং এই পর্বেও ২ পংক্তির শেষ স্তবকটি এই–

> তোমার চলার তালে ওঠে ঘূর্ণি প্রমত্ত তুফান ;
> হে বন্য বৈশাখী ঝড় চল নিয়ে ধ্বংসের আহ্বান।

ফররুখের এই কবিতাটির উপর শেলীর ODE TO THE WEST WIND-এর সরাসরি কিছু প্রভাব আছে। বিশেষ করে আঙ্গিকের দিক থেকে; এবং ভাবের দিক থেকেও বটে। শেলীর কবিতাটি পাঁচ পর্বে বিভক্ত। প্রতি পর্বে পাঁচটি স্তবক। পর্বের প্রথম চারটি স্তবক তিন পংক্তির এবং শেষ স্তবকটি ২ পংক্তির। ফররুখের 'ঝড়' কবিতাটিও একই আঙ্গিকে লেখা। তবে শেলী যেখানে ৫ পর্বে কবিতাটি শেষ করেছেন ফররুখ শেষ করেছেন সেটি ৭ পর্বে।

পরিশেষে বলি শেলী, নজরুল ও ফররুখের কবিতায় একটি আশাবাদী জীবন দর্শন রূপায়িত হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই পরিবর্তন চান। এ থেকে রবীন্দ্রনাথও বাদ যাননি। আর নতুনকে সৃষ্টি করতে হ'লে যে পুরাতনকে ভাঙার প্রয়োজন

www.pathagar.com

সে কথা কে অস্বীকার করবে? আলোর জন্যে যেমন অন্ধকারের প্রয়োজন, গ্রীষ্মের জন্য তেমনি প্রয়োজন শীতের, যেমন গড়ার জন্য প্রয়োজন ভাঙার। সে জন্যেই শেলী লেখেন–

The trumpet of prophecy : O wind !
If winter comes can spring be far behind ?

নজরুল লেখেন–

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !

আর ফররুখ লেখেন–

চরম ধ্বংসের শেষে আসে নব সৃষ্টির আহ্বান,
তাই ত পরম কাম্য এ বিপ্লব– এ ঝড়ের গান।

শুধু রবীন্দ্রনাথে এই ভাঙা-গড়ার সৃষ্টিদর্শন খুব স্পষ্টভাবে উন্মোচিত নয়। 'জীর্ণ পুষ্পদল' 'ধ্বংস ভ্রংশ করি' 'বাহিরায় ফল' তিনি লিখেছেন– কিন্তু শেলী, নজরুল, ফররুখের মত তিনি এই থিসিস এ্যান্টিথিসিসের দ্বান্দ্বিক দর্শনকে নিজস্ব নিয়মে কাব্য করে তুলতে পারেননি অথবা এটা তাকে অনুপ্রাণিত করেনি। সেই জন্যে ফররুখ রবীন্দ্রনাথ নয় বরং শেলী নজরুলের চিন্তাদর্শে অনুরণিত।

নতুন করে সুন্দর বা সুন্দরতর ক'রে গড়ার ভাঙার বা ধ্বংস করার যে প্রয়োজন এই দর্শন বাঙলা কাব্যে নজরুল এনেছিলেন। তাঁর "প্রলয়োল্লাস" কবিতার সেই দর্শনের অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি। ঐ কবিতাতেই তিনি বৈশাখের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন– 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখী ঝড়'। পরবর্তী কালে বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে 'ঝড়' কবিতা লেখেন। আমরা জানি 'ভাঙার গান' নামে তিনি একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। সেখানে প্রথম কবিতা 'ভাঙার গান'-এ লিখেছিলেন– 'নাচিছে কাল বোশেখী কাটাবি কাল বসে কি?' তার মানে বৈশাখকে ঝড়কে আর বিপ্লবকে তিনি সমার্থক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তবে তাঁর ভাঙা বা ধ্বংস যে সৃষ্টিরই জনক সেটা তিনি তাঁর 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার একটি পংক্তিতে বলেন–

ধ্বংসের মাঝে হাসুক মা তোর সৃষ্টির নব পূর্ণিমা !

ফররুখের "বৈশাখ" সেই একই চিন্তাদর্শের বিকাশ। পার্থক্য এই যে ফররুখ ইসলামকে জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লব বলে ভেবেছিলেন এবং জগতে আবার নতুন

www.pathagar.com

শান্তির অগ্রদূত বলে ইসলামকে মনে করেছিলেন ইকবালের মত। তিনি 'বৈশাখ'কে সেই ইসলামী মতাদর্শেরই প্রতিবিম্ব হিসাবে রূপায়িত করেছেন।

রচনা সময়
১২-৪-৯৯

www.pathagar.com

ফররুখের শিল্প-মানস ও সাত সাগরের মাঝি

ধর্ম বিশ্বাসে ফররুখের যেমন অটলতা ছিল তেমনি শিল্প বিশ্বাসে ফররুখ অটল ছিলেন। ফররুখ প্রধানত মানবতাবাদী কবি। এই শ্রেণীর কবিরা শিল্পের উপরে মানুষকে স্থান দেন এবং আর্টস ফর আর্টস সেক নীতিকে পরিহার করেন। তিনি যে একটি আদর্শে চরমভাবে বিশ্বাসী তাঁর কাব্যের মেধাবী পাঠকদের তা চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার দরকার হয় না; কিন্তু ফররুখ তাঁর বক্তব্যকে কখনই বক্তৃতার ভাষায় বলেননি- শিল্পের ভাষায় বলেছেন। সাধারণ পাঠককে বোঝাবার জন্যে লেখাকে সরল, সহজ ও সাধারণ করা উচিত এ-কথা বা বক্তব্যকে তিনি আমল দেননি। যে মতবাদই প্রচার করি না কেন তা শিল্প ও কাব্যের ভাষায় বলব- এটাই ছিল তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের চিন্তা। তিনি অগণিত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং প্রায় গ্রাম্য তাঁর প্রিয় মুসলিম সমাজকে- যাঁরা গণমানুষের অন্তর্ভুক্ত, লক্ষ্য করে তাঁর কবিতা লিখেছেন; কিন্তু তাঁর ভাষাকে তিনি সরলীকৃত গণভাষা করে তোলার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ তাঁর সমাজ মানস-সত্তা আর তাঁর কাব্য মানস-সত্তা দু'রকমের। যেখানে কবিতা লিখেছেন সেখানে তিনি নির্ভেজাল কবি- গদ্য ভাষার বক্তা নন এবং প্রচারধর্মিতার শত্রু। যে ইসলামকে তিনি জীবন দিয়ে ভালোবাসতেন তার জন্যে প্রয়োজনে তিনি তাঁর কাব্যাদর্শকে উপেক্ষা করতে পারতেন; কিন্তু তিনি ধর্মের জন্যে কাব্য-শিল্প-মহিমাকে ক্ষুণ্ন করতে নারাজ ছিলেন; এমনকি এক্ষেত্রে তিনি প্রায় নিরাপোষ ছিলেন; বিশেষ করে আমি যখন তাঁর "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাসমূহ দেখি এই চিন্তা না করে পারি না। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই ইসলামী আদর্শ প্রচারের বা মুসলিম জাগরণের কবিতা; কিন্তু প্রতীক রূপক ও অতিশয়োক্তির অলঙ্কারে তিনি একে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে বোঝারই উপায় নেই এই কাব্যের ব্যঙ্গার্থের আড়ালে আছে ইসলাম প্রচার বা ইসলামী আদর্শের মহিমার উদ্বোধন ও তাঁর প্রতিষ্ঠার অপার ব্যাকুলতা।

যে বিষয় এই কাব্যের মর্মবাণী তা খুব নতুন নয়। এর যে ইতিহাস তা কারো কারো অজানা হলেও অনেকের জানা; সে ইতিহাস বন্ধুর পথ পরিক্রমার- উত্থান-পতনের- বিজয় ও পরাজয়ের- পরাজয় ও বিজয়ের; সে ইতিহাস বীরত্ব ও সাহসিকতার, আনন্দের ও দুঃখের; সে ইতিহাস সাম্যের, শান্তির ও মানবতার; মহাত্যাগ ও মহাভোগের মহাসাফল্য ও মহা ব্যর্থতার ; সে ইতিহাস প্রতিবাদ বিপ্লব ও সংগ্রামের। গদ্য হয়ে যাওয়া পদ্যের ভাষায় বর্ণনা করলে সে

www.pathagar.com

ইতিহাস হয়ে যেত গতানুগতিক গদ্যে লেখা একটা ধারাবর্ণনা; মাহফিলে দাঁড়িয়ে বিশেষণযুক্ত গদ্যে বলা কোন প্রসিদ্ধ বাগ্মীর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা অথবা তা হতে পারত আলতাফ হোসেন হালীর "মুসাদ্দাস-ই হালী"। কিন্তু ফররুখের কবিতা সেই বর্ণনাধর্মী "মুসাদ্দাস-ই-হালী" হয়নি হয়েছে প্রতীকধর্মী ইকবালের কবিতার মত। হয়ত তা ইকবালের সমুজ্জ্বল মনীষার সমধর্মী নয়- কিন্তু ইকবালের কাব্য-মানসধর্মী। এবং বলা বাহুল্য ইকবালের একটি বহু ব্যবহৃত প্রতীক 'ঈগল'কে ফররুখ পরিণত শিল্পের মত তাঁর কাব্যে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করেছেন। 'ঈগল' ফররুখ ব্যবহৃত একমাত্র প্রতীক নয়- ফররুখ ব্যবহৃত বহু প্রতীকের অন্যতম- তবু 'সিন্দাবাদ' কবিতায় ফররুখ যখন বলেন-

পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে
নামে নির্ভীক সিন্ধু-ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

তখন যে বিষয়টি ঈগল নামে দেখানো হয় তা শৌর্যে বীর্যে বিশ্বের বিস্ময়। উজ্জ্বলতম উত্থানের দিনে ইসলাম জগৎকে চমকিত বিস্মিত করে দিয়েছিল- অপরাধ ও অন্যায়ের মধ্যে যে বিশ্ব বাস করছিল ঐ সূর্যের আলোর পুচ্ছাঘাতে তা কেঁপে উঠেছিল। ঈগল সেই অপরাধ ধ্বংসের প্রতীক- সেই অন্ধকার হিংসারূপ সর্পবিনাশকারীর প্রতীক। শুধু 'ঈগল' নয়- ফররুখ 'সিন্দাবাদ'কে সেই অপরিসীম সাহসিকতার বীর্য, বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন- কোন প্রতিবন্ধকতাই- কোন সীমাহীন মহাসমুদ্রের প্রতিবন্ধকতাই যার কাছে কোন পর্বত প্রাচীর নয়- ভীরুতার ক্ষীণতম গন্ধ যাকে স্পর্শ করে না- বৃহত্তম লোভের সামগ্রী যার কাছে তুচ্ছতম উপেক্ষার সামগ্রী।

এই কাব্যে বিগত চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে- প্রতি বাক্য প্রতি শব্দ সে কথা বলে দেয়- কিন্তু কখনও তা ইতিহাসের ভাষা ব'লে যাতে মনে না হয় সে দিকে ফররুখের দুর্দান্ত সতর্কতা।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী মুসলমানদের জীবন ও জগতের সবচেয়ে দুর্দিন ও দুর্ভাগ্যের দিন। ব্যথিত ফররুখের হৃদয় সে কথা স্মরণ করে যখন বলে-

কথা ছিল তুমি, হে পাখী ! কখনো মানবে না পরাজয়,
তোমার গানের মুক্ত নিশান উড়েছে আকাশময়,
দূর আকাশের তারারা দেখছে তোমার এ পরাজয় ;
তোমার পতন দেখে আজ পাখী সবে মানে বিস্ময় !

তখন সত্যিই মনে হয় শিল্পের প্রতি বিশ্বাসে ফররুখ কতটা অটল।

www.pathagar.com

এই পরাজয়ের গ্লানিমা ও ম্লানিমা মুছে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে– সেই উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্যে গণচিত্তের দিকে তাকিয়ে ফররুখ স্পষ্টতর ভাষার পদ্য রচনা করতে পারতেন; কিন্তু ফররুখ যখন বলেন–

দিতে হবে ফের আঁধারের বুকে চাষ,
ভরাতে আনারকলিতে বন্ধ্যা মরুভূর অবকাশ,
আনতে নতুন বীজ যেতে হবে ফারানের অভিযানে,
ভরাতে মাটির রুক্ষতা সেই প্রবল জোয়ার টানে।

তখন তাঁর কাব্যের শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ততায় নেমকহারামীর গন্ধ উন্মোচিত হয় না।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়– বিপ্লবী চেতনার একটি রোমান্টিক উপলব্ধির আরও সূক্ষ্ম রূপায়ণ দেখি ফররুখের কাব্যের এইসব পংক্তিতে। আকাঙ্ক্ষার ও আশার এই কাব্যবাণী রূপ বাংলাকাব্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার মহিমার সঙ্গে তুলিত হতে পারে–

পাকা খরমুজা ফেটে পড়ে কত
মিঠে শরবত বুকে,
তার চেয়ে মিঠে মিছরিও মানে হার,
তোমার তুতীর কণ্ঠ শিরীণ ! নার্গিস আঁখি তার
আনারকলির পাপড়ি নিয়ে সে খুঁজে ফেরে বন্দুকে।
দিন রাত্রির মৌসুম তার ফুলের জোয়ার ভরা
তোমার পাখায় শিরীণ তোমার হয়েছে– স্বয়ম্বরা।
স্বপ্ন-মেদুর কেটেছে অহর্নিশ !
আকুল আবেগে আঁখি মেলে নার্গিস !
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে।

মেহেদির শাখে থোকা থোকা ফোটে ফুল,
পাতার আড়ালে জাগে দ্বাদশীর চাঁদ,
কোন নির্জন গোলাব শাখায় অশান্ত বুলবুল,
সুরের বন্যা জোয়ার ভাষায় জোয়ারে রাতের বাঁধ;
মধুঘন রাত, স্বপ্ন চোয়ানো শান্ত মুগ্ধ রাত,
গভীর আবেগে তোমার দুচোখে শিশির অশ্রুপাত,

www.pathagar.com

ঘুমায় শ্রান্ত তুতী,
ঘুমায় শ্রান্ত নার্গিস-আঁখি জাগছে কেবল যুথী।
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে।

দেখলে মনে হয় যেন প্রেমের কবিতা পড়ছি– যেন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতের কুসুম কাননে কবি আমাদের সাথে নিয়ে বেড়াচ্ছেন; যেখানে ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য, ফলের মিষ্টি স্বাদ– এই পার্থিব পৃথিবীর সকল কুৎসিত ও কদর্যতার পাশে যে সুচি-সুন্দর পবিত্র বেহেশতী দুনিয়া আছে সেখানে আমাদের স্বপ্ন ভ্রমণ ঘটছে। সুচয়িত সুন্দর শব্দের, গন্ধ ও সৌরভ ভরা শব্দের, সুর ও মাধুর্য ভরা শব্দের গাঁথুনী দিয়ে কবি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন এমন এক ইতিহাসের কথা– যা রূপকথার মত অলৌকিক ও বিস্ময়কর। এও প্রেমের কবিতা কিন্তু তা নারী প্রেমের নয়– ইসলাম প্রেমের, মানবিক আদর্শের প্রেমের– ইসলামের বা মুসলিম ইতিহাস প্রেমের।

এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের কাব্য-দুনিয়া তিনি শুধু 'আকাশ-নাবিক', 'সিন্দাবাদ' বা 'বার দরিয়ায়' কবিতাতেই দেখাননি তাঁর প্রধান মূল কবিতা 'সাত সাগরের মাঝিতে'ও দেখিয়েছেন– যে কবিতার নামে হয়েছে কাব্যগ্রন্থের নাম। এ-কবিতার শরীরের প্রতিটি স্তবক অঙ্গে, প্রতিটি বাক্যে ও শব্দে যেন জ্যোছনার লাবণ্য মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেশানো হয়েছে ফুলের সৌন্দর্যের মাধুর্য, শিশিরের স্নিগ্ধতা, শহদ ও শিরণীর মিষ্টতা। আমরা যখন পড়ি–

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানিনা তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।

অথবা-

নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ

কিংবা

তুমি দেখছো না, এরা চলে কোন আলেয়ার পিছে পিছে ?
চলে ক্রমাগর্ত পথ ছেড়ে আরো নীচে।
হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভেনি এ-কথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখছে এ মরুভূমি;
দেখ জমা হ'ল লালা রায়হান তোমার দিগন্তরে;

www.pathagar.com

তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে।

এবং

তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গফুল এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধুলিকে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গুলে-বকাওলী।

সাধারণভাবে এইসব কাব্যকে গদ্য করলে– মনে হবে যেন এলোমেলো অর্থহীন বক্তব্য, মনে হবে যেন একগুচ্ছ শব্দ-পুষ্পের স্তবক মাত্র যা দৃষ্টিকে মোহগ্রস্ত করার প্রয়াস; কিন্তু আসলে কবি ভাব ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে ভ্রমণ করাচ্ছেন সেটাই সত্য। গদ্য বাক্যের অর্থের মত মুহূর্তে বুঝে নেওয়ার ফাঁকে কবি যেন এক জ্যাছনা কুয়াশার সাঁকো সৃষ্টি করেছেন– যাকে প্রকৃত অর্থে বলা যায় কাব্য মরীচিকার সৌন্দর্য।

বলা বাহুল্য, "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের প্রায় সকল কবিতাতে ফররুখ যে ভাবজাগরুক ভাষা সৃষ্টি করেছেন তা যেন হৃদয়-গহনে কান পেতে শোনা এক সৃষ্টি-দক্ষ মস্তিষ্কের উচ্চারণ। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে আধুনিক কাব্য আন্দোলন হয়, এক্সপ্রেশনিস্ট, ইমেজিস্ট ও পিওর পোয়েট্রির আন্দোলন হয় তারই শিল্পাদর্শকে যেন নিখুঁতভাবে ফররুখ তাঁর "সাত সাগরের মাঝি"র অধিকাংশ কবিতায় অনুসরণ করেছেন। ঐ সব আন্দোলনের মনীষীদের বিষয়-চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাদর্শের কোন মিল নেই– বিষয়-চিন্তায় তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ বিপরীত; কিন্তু তাঁদের কাব্য-শিল্প চিন্তাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সে জন্যেই ব্যতিক্রম দু'চারটি কবিতা বাদে "সাত সাগরের মাঝি" হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ কবিতার এক বিস্ময়কর উপমা।

রচনা সময়
১৮-১০-৯৩

www.pathagar.com

রঙীন চিত্রকল্প ও ফররুখ

সাদা পোষাকের মত বা নিরাভরণা সুন্দরী নারীর মত অলঙ্কারহীন বা রঙহীন কথা ও ভাষায় কবিতা লেখা যায়। বাংলা ভাষার অজস্র কবিতায় তার নিদর্শন আছে। আমরা বাউলদের অনেক কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় বা রবীন্দ্রচক্রের অনেক কবির কবিতায় তার উদাহারণ দেখি। নজরুলের কবিতা নিয়ে শিষ্যদের সঙ্গে এক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাদামাটা ভাষায় লিখলেও যে কাব্য হয় তার প্রমাণ নজরুলের কবিতা। কারণ তার ঐ সরল ঋজু ভাষায় লেখা কবিতা বাক্যরস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। তার মানে শুধু রঙ ও অলঙ্কার নয়, কবিতার আসল রূপ তার প্রাণের ঐশ্বর্য-রসে। হয়ত এই জন্যে নজরুল তাঁর একটি হালকা ধাঁচের গানে বলেছিলেন, 'যেমন আছ তেমনি এসো/ একটুখানি মুচকি হেসো/ গোলাপ ফুলে রঙ মাখিতে হয় যদি হোক ভুল।' তার মানে গোলাপী গোলাপ বা রক্ত গোলাপ তার নিজস্ব প্রাকৃতিক রঙেই সুন্দর তাকে আবার রঙ মাখিয়ে সুন্দর করার প্রয়োজন হয় না। সুন্দরী নারী তার স্বভাবজাত বা সহজাত ত্বক-লালিত্যে বা লাবণ্যে সুন্দর; তার অঙ্গের কাঠামোগত সৌন্দর্যেই সে সুন্দরী, তার প্রসাধনহীন মুখ তার আল্লাহদত্ত গঠন-মাধুর্যেই সুন্দর। বহু কবিতা আছে তার গভীর ভাবের মহিমায় তেমনি সুন্দর– আভরণ বা অলঙ্কার সেখানে অতিরিক্ত প্রসাধনের মতো। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'তোমার মাঝে রাখিনি আর সাজের অহঙ্কার।' অলঙ্কার যেহেতু প্রিয় মিলনের বাধা সে-জন্যেই এই নিরাভরণ আঙ্গিকে শুধু দেহগত সৌন্দর্যের আভরণ দিয়ে ঋদ্ধ পাঠককে আকর্ষণ করা যায়। অন্য দিকে কবির বাণী ও বক্তব্য গভীরতার সোনা মেখে অলঙ্কারে পরিণত হয়। যা আমরা সাদীর, রবীন্দ্রনাথের ও নজরুলের কবিতায় দেখি। নজরুল তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন– 'আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা/ ব্যথার পরশে সকল অঙ্গ হ'য়েছে তোমার সোনা !' সঠিক শব্দ ও ভাষায় কবি যদি তাঁর দুঃখ ও বেদনা বোধকে উপলব্ধির স্বর্গীয় সততায় উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে তা চিত্তাকর্ষক না হয়ে পারে না। চিন্তার গাঙে যদি ঐ সাদা ভাষার গভীর কথা ঢেউ বা তরঙ্গ কল্লোল তুলতে পারে তা হ'লে তা কেন সুন্দর কাব্য হবে না? তবু মেহমানের সামনে আমরা সাদা রঙের শরবৎ না দিয়ে যেমন রঙ মাখানো

www.pathagar.com

শরবৎ দিয়ে থাকি তেমনি কবিরাও তাদের ভাষার বক্তব্যকে শব্দ ও বাক্য রঙে রাঙিয়ে পরিবেশন করতে পছন্দ করেন। জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর পথে যাইতে চাহিনা আর' যেমন কবিতা তেমনি 'ঝরা পালকে'র 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল'-এর এই পংক্তি সমূহ –

গোলাপ ফুলের মত ঠোঁট যার–
রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ আর আঁখি
গোধূলির মত গোলাপী রঙীন
আমি দেখিয়াছি তারে–
ঘুমপথে স্বপ্নে– কত দিন ॥

কবিতা।

প্রথম কবিতাটিতে ভাবনা আছে রঙ নেই। অর্থাৎ সে প্রসাধনরিক্তা। দ্বিতীয় কবিতাটিতে ভাবনা আছে কিন্তু সে ভাবনা রঙ-রঞ্জিত, সালঙ্করা। অধিকতর কবিত্বময়। নিরাভরণা বাক্য ভাবে ঐশ্বর্যে সরল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি হলেও মনে হয় প্রসাধন-রঞ্জিত বাক্য বেশী প্রাণময়, বেশী মোহ-উদ্বোধক। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে নজরুলের 'বুলবুল'-এর পার্থক্য এইখানে। 'বুলবুল' এর 'করুণ কেন অরুণ আঁখি' এবং 'গুলবাগিচা'র 'গুলবাগিচার বুলবুলি আমি রঙিন প্রেমের গাই গজল' ইত্যাদি গীতিকবিতায় এই রঙের ব্যঞ্জনা যে সুষমার সৌন্দর্য আমাদের চোখে দুলিয়ে তোলে তাকে স্বর্গীয় না বলে উপায় নেই। ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' আমাদের এই রঙিন সাজের সৌন্দর্য বা beauty কে উপহার দেয়। এটা রঙীন শরবত দিয়ে মেহমানদারী।

ফররুখ তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি'তে এই রঙিন চিত্রকল্পের সব চেয়ে বেশী ব্যবহার করেছেন। তার পূর্ববর্তী কবিতা– যে-সব কবিতা 'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামের কাব্য সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে বা তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা", "হাতেম তাই", "মুহূর্তের কবিতা" ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে– ঐ রঙিন প্রাণময় চিত্রকল্প দুর্লভ না হলেও সংখ্যায় অজস্র নয়। ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি'র শুরুর কবিতা 'সিন্দাবাদে'র প্রথম স্তবক থেকেই এই বর্ণশোভাময় চিত্রকল্পের শুরু–

www.pathagar.com

১. কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক।

(সিন্দাবাদ)

২. আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কত দিন পরে ফিরে
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,

(ঐ)

৩. আনি আলমাস, গওহর লুটে, আনি জামরুদ লাল,
নিথর পাতাল বালাখানা থেকে, ওঠাই রাঙা প্রবাল,

(ঐ)

৪. সিন্ধু ঈগল পাড়ি দেয় পাশে ফেন উত্তাল রাত,
ঝল্‌সায় কালো মেহরাবে তাজা মুক্ত নীল প্রভাত,
বাজে দ্রুত তালে দৃঢ় মাস্তুলে কারফু হাওয়ার ছড়ে,
ঘোরে উদ্দাম সিন্ধু ঈগল সমুদ্র নীল ঝড়ে,
তুফানের ছাঁচে ঘূর্ণাবর্তে সুগঠিত তার তনু,
পুষ্ট পালকে পিছলিয়া পড়ে প্রবাল বর্ণধনু,
দুই রাঙা স্রোতে কোথা দূরে দূরে ঘরে ফেরে দিনমান
ফিরে আসে মৃত বুস্তানে ফের নও বাহারের গান;

(বার দরিয়ায়)

৫. আল্ বুরজের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ
বজ্রের বেগে পাটাতনে ভাঙে পাহাড়ের মত টেউ;

(বার দরিয়ায়)

৬. হে পাখী শুভ্রতনু,
সফেদ পালকে চমকে বিজুরী, চমকে বর্ণধনু,
সোনালী রূপালী, রক্তিম রঙ্গীন।

(আকাশ নাবিক)

৭. আবার আতশী গান
আবার জাগুক দিগন্ত সন্ধান,
আরও আভা তোমার দূতীর কণ্ঠ রবে না ঢাকা,

www.pathagar.com

আবার মেলবে রক্তিম আঙুরাখা
নীল আকাশের তারার বনের স্বপ্নমুখর মনে
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে॥

(ঐ)

৮. এই সব আঁধারের পানপাত্র মর্মর নেকাব
ছড়ায়ে হীরার কুচী, জ্বলিতেছে জুলেখার খাব,
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানার ঝরোকার ধারে,
ঝরিছে রক্তিম চাঁদ আঁধারের বালিয়াড়ি পারে।

(এই সব রাত্রি)

৯. সকল খোশবু ঝরে গেছে বুস্তানে,
নারঙ্গী বনে যদিও সবুজ পাতা
তবু তার দিন শেষ হয়ে আসে ক্রমে
অজানা স্বপ্ন ধূসরতা বয়ে আনে।

(সাত সাগরের মাঝি)

ফররুখের চিত্রকল্পে সাদা, কাল, লাল, নীল, সবুজের সঙ্গে জাফরান রঙ হলুদ ও জোৎসনা রঙ হলুদের বেশী ব্যবহার দেখা যায়। তিনি ধূসর রঙেরও ব্যবহার করেছেন আর এরই মাধ্যমে আশা, নিরাশা ও স্বপ্নের ও মোহময় জগতের সৃষ্টি করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী ভিন্নমাত্রা যে সংযোজন করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত বলে মনে হয় না। আমরা জানি ফররুখ অনেকগুলো পাথরের নাম ব্যবহার করেও একটা নতুন রঙিন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। যেমন– নিকষ আকিক, লাল পোখরাজ, কালো আকীক, গওহর, লাল জামরুদ, রাঙা প্রবাল প্রভৃতি। তাঁর চিত্রকল্পে 'নীল'-এর ব্যবহারটা একটু বেশী দেখা যায়। যার মধ্যে তারুণ্য ও যৌবনকে তথা স্বপ্ন ও আশাকে আমরা রূপায়িত হতে দেখি। নীলের কয়েকটি ব্যবহার–

১. আজ নিতে হবে জংগী সাঁজোয়া মাল্লার নীল বেশ।

(সিন্দাবাদ)

২. ঝলসায় কালো মেহরাবে
তাজা মুক্ত নীল প্রভাত;

www.pathagar.com

(বার দরিয়ায়)

৩. ঘোরে উদ্দাম সিন্ধু-ঈগল
সমুদ্র-নীল ঝড়ে,
(ঐ)

৪. প্রশান্ত খাবে মাপে দরিয়ার
মুক্ত নীল কিনার,
(ঐ)

৫. শংকায় নীল থেমে যায়
মৃদু আবর্ত-কল্লোল,
(ঐ)

মোটকথা 'সাত সাগরের মাঝি' আমাদের বর্ণময় যে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায় তাকে মনে হয় এক বিশুদ্ধ কাব্যের জগত আমাদের চোখে নীল অপরাজিতের মত ফুটে উঠেছে। রোমান্টিকতার নীল স্বপ্ন কবিতার লাবণ্যময় নীলে আমাদের অবিরাম রোমাঞ্চিত করে তুলছে।

চল্লিশের দশকের উপমহাদেশের মুসলিমদের স্বপ্নকে এই শতাব্দীতে আর কোন কবি এমন কাব্যময় করে তুলতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বাস্তবিকই এ যেন প্রিয় হারোনো কোন বাদশাজাদার কাব্য লালিমায় গড়া অশ্রুজলের তাজমহল।

রচনা সময়
১৯-১০-৯৯

www.pathagar.com

গতির কবি ফররুখ

ফররুখের কবিতার একটি দিক গতিময়তার। সেটা বোঝা যায় ফররুখের উপমান অথবা প্রতীক শব্দ নির্বাচন দেখে। আমি ইতোপূর্বে ফররুখের উপমার উপর যে প্রবন্ধ লিখেছি সেখানে নিবিড় অনুসন্ধানে দেখা গেছে ফররুখ উপমা হিসেবে যে-সব শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে আছে পাহাড়, সাগর ও দরিয়া, সূর্য ও আফতাব, ঝড় ও সাইমুম, মেঘ, বিদ্যুৎ, সাপ (বিভিন্ন নামে। যেমন : অজগর; আজদাহ।) বাঘ, সিংহ, ঘোড়া বা তাজী; পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে শিকারী বাজ (বিভিন্ন নামে যেমন : ঈগল, স্বর্ণ-ঈগল, সিন্ধু-ঈগল, শাহীন, শাহবাজ, স্বর্ণ শ্যেন)।

ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি" এই গতির কাব্য। "সাত সাগরের মাঝি"র সিন্দাবাদ কবিতায় ফররুখ এক স্থানে লিখেছেন–

> এরা জিঞ্জিরে আটক চিড়িয়া হীন কামনায় বুড়া
> শিরাজী-মত্ত! পাথর হানিয়া করি সব মাথা গুঁড়া!

অনেক রকম অর্থ জ্ঞাপক হলেও এখানে বন্দী জীবনকে অচলতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জন্যেই এ জীবন ঘৃণ্য, পাথরের আঘাতে চূর্ণ হওয়ার যোগ্য। সচলতাকে যাঁরা জীবন চারিত্র্য বলে মনে করেছেন তারা স্থিরতা, প্রশান্ততা, অলসতাকে মৃত্যুর দোসর মনে করেন। যেখানে জীবন সেখানে যুদ্ধ, সেখানে সংগ্রাম, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও বিপ্লব। কবি লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীতে সবকিছু গতির ছন্দে বাঁধা। নদী ও সমুদ্রে গতি; গ্রহ নক্ষত্রে গতি, উড়ন্ত পাখীর ডানায় গতি, ঝড় ও বাতাসে গতি, ছুটন্ত অশ্বে গতি। এই গতির স্বরূপ দেখার জন্যে ফররুখের কবিতা থেকে এখানে কিছু পংক্তির উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে–

> বাজে দ্রুততালে দৃঢ় মাস্তুলে কারফা হাওয়ার ছড়ে,
> ঘোরে উদ্দাম সিন্ধু-ঈগল সমুদ্র-নীল ঝড়ে।
>
> (বার দরিয়ায় : সাত সাগরের মাঝি)

> আমাদের মনে দরিয়ার মত্ততা !
> কোথায় উল্কা ছুটেছে মাতাল তাজী ?
>
> (ঐ)

> পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;

www.pathagar.com

নামে নির্ভীক সিন্ধু-ঈগল দরিয়ার হাম্মামে !

(সিন্দাবাদ : সাত সাগরের মাঝি)

দীর্ঘছন্দা নারিকেল শাখে মুক্তি উঠিছে বাজি
সরন্দিপের তীরে তীরে কোথা পাখীরা ধরেছে গান;
সিন্ধু-ঈগল বালুচরে বুঝি নীড় করে সন্ধান
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ছোটে দরিয়ার সাদা তাজী !

*　　*　　*

থামবে কোথায় দরিয়ার সাদা তাজী ?

*　　*　　*

কত স্রোত আর ঘূর্ণি তুফান পাড়ি দিয়ে অবহেলে
কত লাল নীল জরদ প্রভাত; সন্ধ্যা এসেছি ফেলে,
আমাদের তাজী যেন উচ্ছল মুখ
থামবে না বুঝি সব স্রোত থেমে গেলে !

*　　*　　*

তীব্র নেশায় দুরন্ত গতিবেগে
বুঝি পথভোলে দরিয়ার শাদা তাজী !

*　　*　　*

দরিয়া মরুর মরীচিকা পানে মাতাল দুঃসাহসী
ছুটছে অন্ধ তাজী !

(বার দরিয়ায়)

কাল মাস্তুলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে,
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরভূর কূলে কূলে,
বাদামের খোসা এসেছিল এক ভেসে তুফানের বেগে;
আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে,

(দরিয়ায় শেষ রাত্রি : সা. সা. মা)

বার দরিয়ায় পেয়েছি আমরা জীবনের তাজা ঘ্রাণ-
পেয়েছি আমরা কিশ্‌তী ভরানো জায়ফল, সন্দল;
দরিয়ার ঝড়ে আহত ক্ষণিক নিতে চাই বিশ্রাম;

(ঐ)

উপরের উদ্ধৃতিসমূহে গতির প্রতীক সিন্ধু-ঈগল, ঝড়, তুফান, ঢেউ, তাজী ইত্যাদি শব্দের দেখা পেয়েছি। এই গতি তাঁর "ডাহুকের" মত কবিতা থেকেও অন্তর্হিত হয়নি। আমরা যখন পড়ি–

www.pathagar.com

প্রান্তরে তারার ঝড়ে
সেই সুরে ঝরে পড়ে
বিবর্ণ পালক,
নিমেষে রাঙায়ে যায় তোমার নিষ্প্রভ তনু বিদ্যুৎ ঝলক,
তীর তীব্র গতি নিয়ে ছুটে যায় পাশ দিয়ে উল্কার ইশারা,
মৃত অরণ্যের শিরে সমুদ্রের নীল ঝড় তুলে যায় সাড়া
উদ্দাম চঞ্চল;
তবু অচপল
গভীর সিন্ধুর
সুদুর্গম মূল হতে তোলো তুমি রাত্রিভরা সুর।

ইক্‌বালের গতির দর্শন ফররুখ আহ্‌মদকে অনুপ্রাণিত করেছিল। "সাত সাগরের মাঝি"র 'তুফান' শীর্ষক সনেটটির উপরে ইক্‌বাল-এর একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ফররুখ-অনূদিত সেই 'কণিকা' কবিতাংশটি এই–

দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীর-তীব্র বেগে ;
বলে গেল : আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান ;
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই ;

এই জীবন-দর্শনে অনুরণিত হয়েছিলেন বলেই ফররুখ গতিধর্মী কাব্য লিখেছেন এমন নয়। ফররুখের চরিত্রের মধ্যেই ছিল গতির প্রতি আকর্ষণ। কারণ কবির প্রকৃতির ছাঁচেই তাঁর কাব্য-ভাবের স্বভাব নির্মিত হয়। তবে বারুদের স্পর্শেই বারুদ জ্বলে ওঠে। ইসলামকে ইক্‌বাল গতির তথা জীবনের ও সংগ্রামের ধর্ম ও শৌর্যের ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে ইক্‌বাল তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' (ফররুখ অনূদিত) কবিতায় বলেছিলেন–

বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে,
বিদ্যুত বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড় ;
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্ব স্তরে ;
যেন যোগ্য হতে পারো জেহাদের এই জিন্দেগীর ;

এই ঊর্ধ্বচারী ঈগলকে ফররুখ ইসলামের প্রতীক হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি"তে 'স্বর্ণ ঈগল' শীর্ষক যে চতুর্দশপদীটি আছে তার বাণী এই–

আল-বোরজের চূড়া পার হল যে স্বর্ণ ঈগল

www.pathagar.com

গতির বিদ্যুত নিয়ে, উদ্দাম ঝড়ের পাখা মেলে,
ডানা-ভাঙা বাজ সে ধুলায়। যায় তারে পায়ে ঠেলে
কঠিন হেলায় কোটি গর্বোদ্ধত পিশাচের দল।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের উত্থান পতনের ইতিহাসের উত্থানের পাল্লা ছিল ভারী। এর মধ্যে মুসলিমদের দ্বারা রোমীয়দের, ইরানীদের, স্পেনীয়দের, ভারতীয়দের এবং পূর্ব ইউরোপীয়দের বিজয়কে ঝড় তথা বিদ্যুত গতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বীরত্ব, সাহসিকতা, মানবিকতা, উদারতা এবং পরাক্রম সবকিছু মিলিয়ে মুসলিমরা যে বিস্ময়কর জাতি হিসেবে পরিচিত হয়– শিল্প, সাহিত্য, দর্শনে, বিজ্ঞানে উন্নতির যে পর্যায়ে সে আরোহণ করে তার তুলনা 'ঈগল'-এর সঙ্গে, 'স্বর্ণ-ঈগল'-এর সঙ্গেই মেলে। ফররুখের উদ্ধৃত কবিতায় সেই ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের সেই বিক্রম ও বীর্যবত্তার ইতিহাস হাজার বছর পরে ভারতে শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগ্য যে মুসলিম সম্রাট, নবাব ও সুলতানদের আত্মঘাতী কর্মের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়। একবার মোগলদের হাতে, এরবার স্পেনীয়দের হাতে, একবার বৃটিশদের হাতে মার খেয়ে ইসলামের ইতিহাস মরীচিকার কালিমায় ঢেকে যায়। হীন স্বাস্থ্য মুসলিম শক্তির পতনের পর তার যে অবস্থা হয় তার বর্ণনা করেছেন ফররুখ এই কাব্যে– "যায় তারে পায়ে ঠেলে/কঠিন হেলায় কোটি গর্বোদ্ধত পিশাচের দল।"

ফররুখ একই সঙ্গে ইসলামকে শক্তি ও গতির প্রতীক হিসাবে দেখেছিলেন বলে তিনি তাকে ঝড়, সাইমুম কিংবা বৈশাখী ঝড়ের রূপে দেখেছেন। তাঁর "বৈশাখী" পরাক্রমশালী ইসলামেরই প্রতীক, গতি ও শক্তির প্রতীক। "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যে কবিত্বের ভাগ যত বেশী থাকুক গতির এই দর্শনটি সেখানে অস্পষ্ট ছিল। কবির বয়োবৃদ্ধি, ইতিহাস ও বিশ্ব সাহিত্য পাঠ ক্রমেই এই দর্শনটিকে তাঁর কাছে স্পষ্টতর করে তোলে। ফররুখ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে "বৈশাখ", "ঝড়", "বর্ষায়", "পদ্মা", "আরিচা পারঘাটে" ইত্যাদি নামে যে-সব কবিতা লেখেন তারা প্রত্যেকেই গতি ও শক্তির প্রতীক। তিনি 'সূর্য'কে ইসলামের প্রতীক করে কবিতা লিখেছেন– "হে আত্মবিস্মৃত সূর্য", "জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে" তাঁর এই ধরনের দুটি কবিতা। এখানে সূর্যকে তেজ শক্তি প্রাণবন্ততা ও বীর্যবত্তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবুও "জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে" কবিতায় ফররুখ যখন বলেন–

মুমূর্ষু নিশীথে আনো প্রাণবন্ত আলোর জোয়ার

www.pathagar.com

আর একবার সূর্য জেগে ওঠো প্রদীপ্ত গৌরবে ।

তখন "আলোর জোয়ার" এর মধ্যে আমরা শুধু প্রাণের শক্তি দেখি না গতির রূপও দেখি।

বলা বাহুল্য, যে "কাফেলা" গ্রন্থে উপরে উদ্ধৃত কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে সেই নাম শীর্ষক কবিতাটিও গতির প্রতীক। শ্রান্তিহীনভাবে যে সত্য সন্ধানী "কাফেলা" এগিয়ে চলেছে তার মানসে রয়েছে গতির আবেগ। 'কাফেলা'র নিম্নোদ্ধৃত স্তবকে গতির প্রতীক ঈগলকে আমরা পুনরায় লক্ষ্য করি। আমরা দেখি–

প্রবল গতির ঝড় বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উড়িছে ঈগল,
দিগন্তে সোনালী বানে খুলে গেছে শর্বরীর তিমির শিকল,
উটের সারির পাশে জমা হল একে একে দৃঢ় অচপল
দূর যাত্রীদল।

ফররুখের "হাতেম তা'য়ী"তে একটি সম্পূর্ণ মানুষ হতে গেলে কি হতে হয় তারই একটি চিত্র বিবরণ আছে। সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ, ধৈর্য, বুদ্ধি, জ্ঞান– প্রভৃতির সংমিশ্রণে যে মানুষ গড়ে ওঠে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ। সে মানুষ পশু প্রবৃত্তির দাস নয়– সে মানুষ লোভের দাস নয়– সে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা বা জিগীষা-জিঘাংসার দাস নয়– সে মানুষ ভীরুতা-কাপুরুষতার দাস নয়; সে মানুষ পৌরুষের, প্রেমের, আত্মত্যাগের, পরোপকারী মানসিকতার, মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার দাস। "হাতেম তা'য়ী"র এই মর্মার্থ। সেখানে গতির দর্শনকে উন্মোচিত করা হয়নি। তবু মাঝে মাঝে সেখানেও গতির উপমায় এসেছে বিদ্যুত, তা'জী, ঈগল, শাহবাজ, উল্কা, পক্ষীরাজ, ঘোড়া, শাহীন। কয়েকটি উদাহরণ–

১ তবুও
থামে না আমার মন ছুটে চলে আরবী তা'জীর
চেয়ে ঢের দ্রুতগতি দিগন্তের পানে ।...

২. তার প্রতীক্ষায় যাকে নিয়ে তার অশেষ জিজ্ঞাসা
আমার বিশ্রান্ত মন যেন মুক্ত ঈগলের বাসা,

৩. মৃত্যুর ফেরেশতা নেমে এক রাত্রে শয্যার শিহরে
আমার আত্মাকে নিয়ে উড়ে গেল শূন্যে বায়ু ভরে,
মুক্তপক্ষ শাহবাজ হানা দিয়ে নিঃশংক যেমন

www.pathagar.com

নেয় সে শিকার তুলে; নিল তুলে আত্মাকে তেমন
বজ্রবেগে হানা দিয়ে মুহূর্তের মাঝে শূন্য স্তরে;

৪. পরীজাত মেহেরওয়ার তারপর আনিল যখন
পরেন্দা সফেদ তা'জী সুঠাম, সতেজ; নাসারন্ধ্রে
আতসী হঙ্কার যত শ্বাস বয় ; তীব্র প্রাণবেগে
উদ্দাম অধীর। সুদৃঢ় প্রত্যঙ্গে যেন অরুদ্ধ
ঝড়।.....

৫. শূন্য স্তরে
উড়ে যায় পাশাপাশি উল্কাবেগে দুই পঙ্খীরাজ।

৬. পাশাপাশি
দুই পঙ্খীরাজ উড়ে ঝড়গতি ফেনোচ্ছল মুখে।

৭. নেমে এল
তীরবেগে দুই ঘোড়া নেমে আসে যেমন শাহীন
শিকার সন্ধানে।

৮. স্বর্ণ ঈগলের চেয়ে
শত গুণ বেগে শূন্যে ওড়ে তাজী।

শক্তি, তেজ, বেগ ও গতির প্রতি ফররুখের যে সহজাত আকর্ষণ ছিল উপরের উপমাসমূহ তার প্রমাণ। সে জন্যেই ফররুখকে আমি জীবনের প্রাণবন্ততার, শক্তি ও গতির কবি বলে মনে করি ।

রচনা সময়
২৯-১০-১৯৯৩

www.pathagar.com

ফররুখের আধুনিকতা

ফররুখকে কি আধুনিক কবি বলা যাবে? ফররুখ আধুনিক কিন্তু তথাকথিত আধুনিক নন! বলা যেতে পারে তিনিও আধুনিক কবি, কিন্তু প্রচলিত অর্থের আধুনিক কবি নন।

আমি ফররুখকে প্রচলিত অর্থের আধুনিক কবি বলছি না এই জন্যে যে আধুনিক কবিতার আন্দোলনকারীরা আধুনিক কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন বা যে সংজ্ঞার ধারণা দিয়েছেন ফররুখ সেই সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন না। যে মতবাদের মিলিত ধারায় আধুনিক কবিতার জন্ম তা ঈশ্বর ভাবনা বা আল্লাহ ভাবনার বিরুদ্ধ মতবাদ। ধর্মকে এড়িয়ে যেসব বৈজ্ঞানিক বাদ-এর জন্ম হয়েছে : যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক অবচেতনবাদ বা মার্কসীয় সাম্যবাদ এ-গুলো মানুষের চিরকালের ধর্মীয় উপলব্ধির বিরুদ্ধ মতবাদ। এই সব মতবাদ দিয়ে মানুষের জ্ঞানকে এমন একটি স্থানে আবদ্ধ করা হলো– যেখানে মানুষ অসহায়, বিপন্ন এবং নৈরাশ্যাশ্রয়ী। শূন্যতাবোধের মধ্যে টেনে আনাতে মানুষ তার শক্তির অপরিমেয়তা সম্বন্ধেই শুধু বিশ্বাস হারালো না– তার স্রষ্টার উপরও বিশ্বাস হারালো। সুতরাং এই চিন্তাভিত্তিক যে কাব্য– সে ঈশ্বররিক্ত বা আল্লাহ-রিক্ত এক কাব্য– নাস্তিকতাযুক্ত এবং আস্তিকতাবিযুক্ত; যেখানে আল্লাহর বন্দনা নেই– আছে শয়তানের বন্দনা, বিষাদ শূন্যতা ও নরকের বন্দনা– যেখানে আনন্দরসের প্রশস্তি নেই, প্রশস্তি আছে বীভৎস রসের। শয়তানের ও বীভৎস রসের এই বন্দনা ও প্রশস্তি গেয়েছিলেন বলে বোদলেয়ার আধুনিক কবিদের গুরু। মূলতঃ ও প্রধানতঃ বোদলেয়ারকে কেন্দ্র করেই আধুনিক কাব্য-সূর্যের সৌরপথ নির্মিত হয়। অথচ বোদলেয়ার ছিলেন বিশ্বাসী খ্রীস্টান। তাঁর 'অন্তরঙ্গ ডায়েরী'তে আছে তার প্রমাণ।

ফররুখ তাঁর কাব্যে নাস্তিকতার আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা যখন তার বিকশিত হওয়ার তুঙ্গ স্থানে পৌঁছেছিল তখনই ফররুখের আবির্ভাব। কিন্তু স্বভাবগত কারণে ফররুখ সে আধুনিকতার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

ফররুখ কি বুঝেছিলেন আধুনিক শব্দটি কদর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কথাটা একটু স্পষ্ট করা যাক।

আধুনিকতার অর্থ কি এই যে তা ইতিহাস সংঘটিত বিষয়কে এড়িয়ে শুধু ব্যক্তির মনোজাগতিক রহস্যকে উন্মোচিত করবে? যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিষয় মানব সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতিকে আর উত্থান পতনকে রূপায়িত করছে তা

www.pathagar.com

এক পরোক্ষ নাটকের বিষয় হবে? যে কবি তাঁর মাতৃভাষায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার স্বজাতির হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষাকে দুঃখ বেদনাকে রূপায়িত করলেন তিনি কি আধুনিকতাকে উপেক্ষা করলেন? আধুনিক কাব্যের ইতিহাস শুধু নতুন আঙ্গিক বা কর্ম সৃষ্টির ইতিহাস নয়, তার নতুন ভাবনা ও চিন্তাদর্শেরও ইতিহাস। সেই চিন্তাদর্শে সামগ্রিক মানব সমাজের দুঃখবোধ প্রশ্রয় পেলেও ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখানুভূতি বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে। বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোর জীবনী ও কাব্য পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, তাদের কাব্য-চারিত্র্যে আছে আত্ম-কেন্দ্রিক চিন্তা ও অস্মিতার শিল্পায়ন। বাহ্যিকভাবে 'আমি'র উদ্ভাসন না থাকলেও 'আমি' সেখানে ব্যক্তিত্ববাহক শক্তি। বোদলেয়ার যখন বলেন–

মূঢ়তা প্রমাদ, কার্পণ্যের পাপে
পূর্ণ হৃদয় দেহ তিলে তিলে ধ্বংস,
ভিখিরি যেমন পোষে উকুনের বংশ
আদরে জোটাই খাদ্য মনস্তাপে।

তখন দেখা যাবে সেখানে আত্মসমালোচনায় উন্মুখর এক কবি তাঁর জীবন-সত্যকে উন্মোচন করছেন। 'পাঠকের প্রতি' এই কবিতায় যে জীবনের তিনি পর্যালোচনা করেছেন সে তাঁরই আত্মজীবনী– যা নিয়তিনিয়ন্ত্রিত বলে এক অনিরাময় দুঃখের জীবনের ইতিহাস। সে জীবন বিশ্বকে দেখেছে কিন্তু বিশ্বের আনন্দকে দেখেনি, বিশ্বের আলোকিত সত্যের বিপরীতে যে অন্ধকার সেই সত্যকে দেখেছে। বোদলেয়ারের কাব্য-দর্শন তাই খানিকটা নিয়তিবাদী জীবন-দর্শন। এ কোন নতুন দর্শন নয়। প্রাচীন মহাকাব্যসমূহে রামায়ণে, মহাভারতে বা ইলিয়ডে এমনকি শেকসপীয়ারের ট্রাজিক নাটকসমূহে এই নিয়তির অপার শক্তিকে লক্ষ্য করেছি। গোটা মানব সমাজের দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে মহাকবিবরেরা এই নিয়তিকে পরাক্রান্ত উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রচেষ্টা, ইচ্ছাশক্তি, সংগ্রাম ও স্বপ্নাকাঙ্খা মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়কে লভ্য করে; কিন্তু তা সর্বলভ্য নয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন–

থাকিত না হৃদয়ের জ্বরা
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা।

যে মানুষ স্বপ্নের জগতে বাস করে সে আনন্দের জগতে বাস করে, সে সুখের জগতে বাস করে। কিন্তু জাগতিক বাস্তবতা স্বপ্নের নয়। মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে– স্বপ্ন দেখে সুখ পেতে পারে– কিন্তু যে স্বপ্নের কোনদিন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই সে স্বপ্ন সত্য নয়। কিন্তু অসত্য স্বপ্ন

www.pathagar.com

কবিতাররোমান্টিকতা– এ স্বপ্ন যে কবি দেখেন এবং তাঁর কবিতায় রূপায়িত করেন তিনি রোমান্টিক। আধুনিক কবিতার বিদ্রোহ ছিল স্বপ্নে সুখ অনুভব করার রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে। কিন্তু জীবনের এই দৃষ্টিই সত্য– নিয়তিবাদের বা অন্ধকারের সত্যই তো জীবনের একমাত্র সত্য নয়। জীবনের আলোর সত্য– আশার সত্য– স্বপ্নের সত্য, প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সত্য কি একেবারে মিথ্যা? জীবনের নঞর্থক দিকের এই সত্য যে একমাত্র সত্য নয়– আলোর, আশার ও সংগ্রামের সত্যও যে সত্য ফররুখ এটা দ্রুত বুঝেছিলেন এবং বুঝতে পেরেই তিনি তথাকথিত আধুনিক কাব্যান্দোলনের গড্ডলিকা স্রোতে মিশে যাননি। তিনি ব্যক্তি জীবনের দুঃখের চেয়ে জাতীয় জীবনের দুঃখকে বড় করে দেখেছিলেন। সংগ্রাম, ইচ্ছাশক্তি, আশা ও স্বপ্ন যে কোটি প্রবন্ধকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে উজ্জ্বলতর সভ্যতার বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে ফররুখ এই জীবন দর্শনকে মিথ্যা ভাবতে পারেননি। আসলে নিয়তিকে সর্বাংশে বিশ্বাস করা মানেই মানুষের শক্তিকে অবিশ্বাস করা এবং মানুষের শক্তিকে অবিশ্বাস করার অর্থ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসহীনতা। আল্লাহর প্রতি এই অবিশ্বাস মানব ইতিহাসের প্রতি অবিশ্বাস বলে ধারণা করেছিলেন বলে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে ফররুখ দ্বিধা করেননি। এবং তিনি এও মনে করেননি এই চিন্তাদর্শ অনাধুনিক।

মানুষের জাতির দেশের বা সর্বমানুষের সর্বজাতির বা সর্ববিশ্বের যে মানুষ বা মনীষা কল্যাণ বা মঙ্গল করতে চান কোন্ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করলে তা সত্য হয়ে উঠবে তা কি তিনি জানেন? যে আদর্শকে বাস্তবায়িত করে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুখী বা সমৃদ্ধ করা যায় সে নব্যাদর্শ কি কোন মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন? কোন কাব্য কি তা পারে? কোন আধুনিক কবিতা? কবিতার কাজ কি মানুষের চলিষ্ণু জীবনের বা প্রকৃতির বা ব্যক্তিগত দুঃখের ও ব্যর্থতার চিত্র আঁকা?

এখানে বলে রাখা ভালো, আধুনিক কবিতায় মৃত্যুর সত্যকে যত বড় করে দেখা হয়েছে জীবনের সত্যকে তত বড় করে দেখা হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর মত জীবনের ধারাবাহিকতাও সত্য; এবং বলা বাহুল্য, মৃত্যু আপাত, সত্য, জীবন চির সত্য। বাহ্যিকভাবে যে মৃত্যুকে আমরা দেখি তা জীবনের রূপান্তর মাত্র। সুতরাং মৃত্যুর চেয়ে জীবন আরও বেশী সত্য। নজরুল ইসলাম লিখেছেন– "মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে/ অনন্ত কাল ধরি অনন্ত জীবন প্রবাহ বহে ॥" এটা গীতা-উক্ত দর্শনে শুধু নয়– এটা কোরআনেরও দর্শন। মুসলমানদের তাই পরকালে বিশ্বাসী হতে হয়। ইসলামী দর্শনে মৃত্যু অস্বীকৃত– সেই জন্য নৈরাশ্য বা হতাশা অস্বীকৃত। এই দর্শনে তাই দুঃখের স্থায়ী অস্তিত্ব নেই। সে জন্যেই

www.pathagar.com

ইসলামী দর্শন অনাধুনিক হবে এমন হতে পারে না। যদিও তথাকথিত আধুনির্কতাবাদীরা সকল ধর্মীয় দর্শনের চিন্তাধারাকে অনাধুনিক বলে প্রতিপন্ন করতে চান, কিন্তু তারা নিজেরাই জানেন না তাঁদের চিন্তাদর্শের মধ্যেও পশ্চাৎপদতার ছিদ্র সীমাহীন।

আধুনিক কবিতার একটা বিষয়-দিক মনন জটিলতা; মানুষের মন জগৎ, সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাগতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে যেমন আবর্তিত হচ্ছে, তেমনি আবর্তিত হচ্ছে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায়। উর্ণনাভের মত এইসব সমস্যা মানুষের চিন্তাকে জড়িয়ে আছে। এই অনিঃশেষিত সমস্যার জালে জড়িত মানুষ মুক্তির উপায় খোঁজে, কিন্তু মুক্তি পায় না। মুক্তির যে একমাত্র উপায় আল্লায় বিশ্বাস তাতেও সে আস্থাহীন– সুতরাং তার সামনে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে হতাশা, ব্যর্থতা, শূন্যতা এবং বিষাদ ও মৃত্যু চেতনা। বোদলেয়ার সে জন্যেই তাঁর কবিতায় বলেছেন–

শুধু এক আশা আছে
বহু দূরে অদ্ভুত গম্ভীর মন্দিরের মৃত্যু।

এ শতাব্দীর আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি টি.এস. এলিঅট তাঁর সাহিত্য- জীবনের শুরুতে এই বোদলেয়রীয় হতাশার ছবি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাসী ক্রীশ্চান ছিলেন কিন্তু যে কবিতার জন্যে তিনি বিখ্যাত তা নঞর্থকধর্মী, সদর্থকধর্মী নয়– সে কাব্যাদর্শে তিনি ছিলেন বোদলেয়ারের অনুসারী। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে উপর্যুক্ত দুজন কবি বোদলেয়ার ও এলিঅট ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যজীবনে ছিলেন তাঁর বিপরীত।

ফররুখের সঙ্গে এইখানে তাঁদের পার্থক্য। ফররুখ তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাহিত্য বিশ্বাসকে পৃথকভাবে দেখেননি। তিনি মৃত্যু চেতনার কবি ছিলেন না, অন্ধকারের কবি নন– নিরাশ্বাস বা হতাশার কবি নন– তিনি বিশ্বাসের কবি আশার কবি এবং আলোর কবি।

আমি ইদানীংকার বহু সাহিত্যালোচনায়– বিশেষ করে যারা আধুনিক সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁরা তাঁদের লেখায় আধুনিক সাহিত্যের– বা বিশেষ করে কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভেরলেন, মালার্মে, ভালেরি, এলুয়ার, রিলকে, হ্যেল্ডার্লিন, স্টিভেন্স, এলিয়ট, হপকিনস, ইয়েটস, পাউন্ড, হুইটম্যান, অডেন, স্পেন্সার, লরেন্স এঁদের কথা বেশী করে আলোচনা করেন, কিন্তু এশিয়ার কবিদের কাব্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন না– বিশেষ করে ইক্‌বালের কবিতা। এর কারণ ইক্‌বালও একজন বিশ্বাসী কবি এবং তাঁর

www.pathagar.com

কবিতা তাঁর ধর্মবিশ্বাস, জীবন বিশ্বাস এবং সাহিত্য-বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি এও লক্ষ্য করেছি, এইসব আধুনিকবাদীরা নজরুল ইসলামকে পর্যন্ত উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে চলার পক্ষপাতী। তাঁদের আলোচনায় নজরুল স্থান পান না তার কারণ তথাকথিত আধুনিকতার সংজ্ঞায় তাঁরা নজরুলকে ধরতে পারেন না। কারণ তাঁর কাব্যেও জীবন-জটিলতা কম, অবিশ্বাসজনিত হতাশা কম, অন্ধকারের উপস্থিতি কম এবং রোমান্টিকতা বেশী– অর্থাৎ তা জীবনের কবিতা, প্রাণের কবিতা এবং যুদ্ধের কবিতা– ইতিবাচক আদর্শের বা সদর্থক দর্শনের কবিতা। কিন্তু নজরুল সমকালীন ইতিহাসের কবি, সমকালীন জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার, দুঃখ ও বেদনার কবি। তিনি অন্ধকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু জীবনের জন্যে আলোর অস্তিত্বকে বরণীয় বলে মনে করেছেন। এই আদর্শের কবি রবীন্দ্রনাথ, এই আদর্শের কবি ইক্‌বাল এবং এই আদর্শের কবি ফররুখ আহ্‌মদ। কারণ এঁরা মানুষের কল্যাণের জন্যে, মঙ্গলের জন্যে, সভ্যতার অগ্রগামিতার জন্যে এবং শান্তি ও মানবিকতার জন্য কাব্য রচনা করেছেন। এ চিন্তাদর্শ কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়– এ আদর্শ চিরকালের স্রোতে প্রবাহিত হওয়ার জন্যে। তাই ফররুখ আহ্‌মদ তথাকথিত আধুনিক কবি নন– তিনি চির-আধুনিক কবি।

ফররুখ তথাকথিত আধুনিক কবি নন কিন্তু তিনি আধুনিক কবি। কারণ কাব্যের আঙ্গিকতায় যে বিশুদ্ধ কাব্য রচনার চর্চা পাশ্চাত্য জগতে হয়েছে ফররুখের কাব্য আঙ্গিকে তা সহজ দৃষ্ট। তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক কবিদের মত বিশুদ্ধ কাব্য রচনা করেছেন চিত্রধর্মী ও প্রতীকধর্মী কবিতা লিখে। আধুনিক কবিতায় যে ইমেজিস্ট আন্দোলন হয়েছে বা সিম্বোলিজমের আন্দোলন, সেই চিত্রকল্পবাদ বা প্রতীকবাদের অলঙ্কারে ফররুখের কাব্য সজ্জিত। ফররুখ খুব কম কবিতা লিখেছেন– যেখানে কবিতা কাব্য-মাহাত্ম্য হারিয়ে তা পদ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ফররুখ কখনও ভাবতে পারেননি– বীভৎস রসই কাব্যের একমাত্র রস এবং আধুনিক কবিতা রচনায় তাকেই প্রাধান্য দিয়ে কবিতা লিখতে হবে– এবং তা না করলে কাব্যের জাত যাবে। এই রুগ্ন অসুস্থ চিন্তাধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফররুখ হয়ে উঠেছেন চিরায়ত আদর্শের কবি– এক মৌলিক কবি।

রচনা সময়
১৫-১০-৯৩

www.pathagar.com

সিরাজাম মুনীরার ফররুখ

ফররুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোন্ গুলি– এই প্রশ্নের উত্তরে এক নিঃশ্বাসে যে নামগুলো উঠে আসে তার মধ্যে 'সিরাজাম মুনীরা' অন্যতম। এর কাব্য উৎকর্ষ নিয়ে অবশ্য সমালোচক মনে প্রশ্ন জেগেছে। এতে কি আছে 'সাত সাগরের মাঝি'র কাব্যগুণ? কাব্য বিজ্ঞান বা অঙ্ক নয়। তবু মানব মনে সব সময় তুলনার মাধ্যমে গুণের পরিমাণ নির্ধারণের একটি কৌতূহল বিনিদ্র থাকায় 'সাত সাগরের মাঝি'র কাব্যগুণের মানের সঙ্গে 'সিরাজাম মুনীরা'র কাব্যমূল্য বিচারের প্রবণতা কাব্য-সচেতন মনকে জিজ্ঞাসার নিক্তি হাতে নিতে প্রণোদিত করে। কাব্য দুটির প্রকাশকাল দেখলেই বোঝা যায়, অতি কাব্য-সচেতন ফররুখ আহ্‌মদ 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশ করতে একটু বিলম্বিত সময় নিয়েছেন। 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ আর 'সিরাজাম মুনীরা' ১৯৫২-এ। কবির মনে হয়ত এ সন্দেহ থাকতে পারে যে 'সাত সাগরের মাঝি'তে যে সাফল্য তাঁর ঘটেছে 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতা কাব্যগুণের দিক থেকে তাঁকে সেই সাফল্য দানে সামান্য অন্তরায় হতে পারে। তিনি জানতেন কাব্যবিচারে বিষয়ের মূল্য যতটা অসামান্য তার চেয়ে কাব্যগুণ অনেক বেশী অসামান্য। সে জন্যে তিনি সম্ভবতঃ 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশের সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে দুটি বিষয় আমার এই আলোচনায় নিয়ে আসব। আমি আমার লেখা 'উপমাশোভিত ফররুখ'-এ ফররুখের বিচিত্র উপমা কোন কাব্যে কতটা ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা আমার প্রস্তুতকৃত তালিকা সংযোজন করেছিলাম। তুলনার জন্যে সেই তালিকা দুটো এখানে তুলে দিচ্ছি।

সাত সাগরের মাঝি

ব্যবহৃত উপমা	সংখ্যা
তুলনাবাচক শব্দ 'মত' যুক্ত উপমা	১৬
উৎপ্রেক্ষা ('যেন' যুক্ত)	৯
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা	০
লুপ্তোপমা	২৩
রূপক	১২
অতিশয়োক্তি	১৯
অপহ্নুতি	২

www.pathagar.com

ব্যবহৃত উপমা	সংখ্যা
ব্যতিরেক	০
ভ্রান্তিমান	০
সন্দেহ	৩
তুলনাবাচক শব্দ (যেমন যুক্ত)	০
তুলনাবাচক অন্যান্য শব্দ 'সম', 'প্রায়', 'বৎ', 'সমান' যুক্ত	০

সিরাজাম মুনীরা

ব্যবহৃত উপমা	সংখ্যা
তুলনাবাচক শব্দ 'মত' যুক্ত উপমা	২৬
উৎপ্রেক্ষা ('যেন' যুক্ত)	২
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা	৫
লুপ্তোপমা	৯
রূপক	২
অতিশয়োক্তি	১১
অপহ্নুতি	০
ব্যতিরেক	০
ভ্রান্তিমান	০
সন্দেহ	১
তুলনাবাচক শব্দ (যেমন যুক্ত)	২
তুলনাবাচক অন্যান্য শব্দ 'সম', 'প্রায়', 'বৎ', 'সমান' যুক্ত	৩

স্পষ্টতঃ এখানে প্রধান যে পার্থক্যটা দেখা যায় সেটি রূপক ও অতিশয়োক্তিধর্মী উপমার পার্থক্য। 'সাত সাগরের মাঝি'তে যেখানে 'রূপক' ব্যবহৃত হয়েছে ১২ বার সেখানে 'সিরাজাম মুনীরা'তে ২ বার। 'অতিশয়োক্তি' যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাত সাগরের মাঝি'তে ১৯ বার। 'সিরাজাম মুনীরা'তে সেখানে ১১ বার। লুপ্তোপমা 'সাত সাগরের মাঝি'তে যেখানে ২৩ বার 'সিরাজাম মুনীরা'তে সেখানে ৯ বার। তার মানে 'লুপ্তোপমা', 'রূপক' এবং 'অতিশয়োক্তি মিলে (২৩+১২+১৯=৫৪) যেখানে 'সাত সাগরের মাঝি'তে ৫৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'সিরাজাম মুনীরা'য় তা (৯+২+১১=২২) ২২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব অলঙ্কার শাস্ত্র মতে 'সাত সাগরের মাঝি'র কাব্যগুণ 'সিরাজাম মুনীরা'র চেয়ে বেশী বলে মনে হবে। তার মানে 'সিরাজাম মুনীরা'র চেয়ে 'সাত সাগরের মাঝি' বেশী সালঙ্করা। অবশ্য অলঙ্কৃতা রমণীর সৌন্দর্যের এবং নিরলঙ্করা

www.pathagar.com

নারীর সৌন্দর্যের মান শুধু অলঙ্কার দিয়ে মূল্যায়িত হবে তা নয়। তাই সৌন্দর্য গুণে উভয় কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়।

উল্লেখ্য, এই দুই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল সমকালীন। এদের প্রকাশ কালের তালিকা পাশাপাশি রাখলেই সেটা বোঝা যাবে।

'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতা ও তার প্রকাশকাল

কবিতা	প্রকাশকাল
১. সিন্দাবাদ	১৩৫০ (১৯৪৪)
২. বার দরিয়ায়	১৩৫০ (১৯৪৪)
৩. দরিয়ায় শেষ রাত্রি	১৩৫০ (১৯৪৪)
৪. শাহরিয়ার	১৩৫০ (১৯৪৪)
৫. আকাশ নাবিক	১৩৫১ (১৯৪৪)
৬. বন্দরে সন্ধ্যা	(?)
৭. ডাহুক	১৩৫১ (১৯৪৪)
৮. এই সব রাত্রি	(?)
৯. পুরনো মাজারে	১৩৫১ (১৯৪৪)
১০. পাঞ্জেরী	(?)
১১. স্বর্ণ-ঈগল	১৩৫১ (১৯৪৪)
১২. লাশ	১৩৫০ (১৯৪৪)
১৩. তুফান	১৩৫১ (১৯৪৪)
১৪. নিশানবাহী	১৩৫১ (১৯৪৪)
১৫. নিশান বরদার	(১৯৪৪)
১৬. আউলাদ	১৩৫০ (১৯৪৩)
১৭. সাত সাগরের মাঝি	১৩৫০ (১৯৪৩)

সিরাজাম মুনীরার কবিতা ও তার প্রকাশকাল

কবিতা	প্রকাশকাল
১. সিরাজাম মুনীরা	(?)
২. আবুবকর সিদ্দিক	১৩৫০ (১৯৪৩)
৩. উমর দারাজ দিল	১৩৫০ (১৯৪৪)
৪. ওসমান গণি	১৩৫১ (১৯৪৫)
৫. শহীদে কারবালা	১৩৫৩ (১৯৪৭)

www.pathagar.com

৬. মন	১৩৫২ (১৯৪৫)
৭. আজ সংগ্রাম	(?)
৮. এই সংগ্রাম	১৩৫১ (১৯৪৪)
৯. প্রেমপন্থী	(?)
১০. অশ্রুবিন্দু	১৩৫২ (১৯৪৬)
১১. গাওসল আজম	(?)
১২. খাজা নক্‌শবন্দ	(?)
১৩. সুলতানুল হিন্দ	(?)
১৪. মুজাদ্দেদ আলফেসানী	(?)
১৫. মৃত্যু সংকট	১৩৫২ (১৯৪৫)
১৬. অভিযাত্রিকের প্রার্থনা	১৩৫২ (১৯৪৫)
১৭. মুক্তধারা	(?)
১৮. ইশারা	(?)

('ফররুখ-রচনাবলী'র সম্পাদক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, এই গ্রন্থের কবিতাসমূহের প্রকাশকাল ১৯৪৩-৪৬। এর প্রতিটি কবিতা প্রকাশের তারিখ তাঁদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নি। ফররুখ-গবেষকরা ভবিষ্যতে সে-গুলি নিশ্চয় খুঁজে বের করবেন।)

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, উভয় গ্রন্থে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে লেখা কবিতা আছে। কিন্তু 'আবুবকর সিদ্দিক' ও 'ওমর দারাজ দিল' কবিতা দুটি ১৯৪৩-৪৪-এ লেখা হলেও কবিতা দুটিকে 'সাত সাগরের মাঝি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতা বিশেষভাবে নির্বাচিত। 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতাটির প্রকাশ তারিখ 'ফররুখ রচনাবলী'তে উল্লেখিত হয়নি। কবিতাটি মাসিক মোহাম্মাদীতে ছাপা হয়েছিল। ধরে নেয়া যাক এ কবিতাটিও ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে লিখিত হয়েছিল।

'সিন্দাবাদ' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতা প্রায় সম সময়ে লেখা। এ-সময়ে বিশ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। উপমহাদেশে চলছিল বৃটিশ প্রশাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন এবং ইসলামী ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ও উপমহাদেশের মুসলিমদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন। সুতরাং বলা যেতে পারে মানবতার জন্যে, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্যে এবং কোণঠাসা উপমহাদেশের মুসলিমদের পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামই ছিল

www.pathagar.com

'সিন্দাবাদ' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র বিষয়বস্তু। সিন্দাবাদ বীর, সাহসী, সংগ্রামী, অকুতোভয় যোদ্ধা নেতৃত্বের প্রতীক। উপমহাদেশের মুসলিমদের নৈরাশ্য-ধূসর জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য যে সাহসী নেতার প্রয়োজন ছিল 'সিন্দাবাদ'-এ তারই স্বরূপ রূপায়িত করা হয়েছে। আরব্য রজনী থেকে ফররুখ এই বীর নায়কের নির্বাচন করেন। মুসলিম সমাজের পাঞ্জেরী এই সিন্দাবাদ অর্থাৎ মহান নেতার সামনে সাত সমুদ্র তের নদী কোন অলঙ্ক্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সমস্ত বাধা, বিঘ্ন, বিপদ, বেদনা পাড়ি দিয়ে স্বপ্নের রসদ নিয়ে, বাণিজ্য সাফল্য নিয়ে সে একদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। তার হৃদয়ে থাকবে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও দর্শনের পরাক্রান্ত শক্তি। এই শক্তি-উৎস হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন এই পৃথিবীর অন্ধকার দূর করতে আলোর চিরাগের মত। তাই তিনি আলোর চিরাগ বা সিরাজাম মুনীরা।

আল্ কুরআনুল করীমের সুরা আল আহযাবের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে 'সিরাজাম মুনীরা' রূপকার্থের বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে: "হে নবী, আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদবাহক রূপে এবং সতর্ককারী রূপে এবং খোদার অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে (লোকদের) আহ্বানকারী রূপে এবং (শিক্ষার) উজ্জ্বলবর্তিকা (সিরাজাম মুনীরা) স্বরূপ"

'সিরাজাম মুনীরা'র আক্ষরিক অর্থ আবদুর রহমান সাহেব করেছেন 'আলোকবর্তিকা'। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকৃত অনুবাদে করা হয়েছে 'উজ্জ্বল প্রদীপ' ; আল্লামা ইফসুফ আলী অনূদিত The Holy Quran-এ করা হয়েছে A lamp spreading light, কোন একটি অনুবাদে illustrious lamp বলা হয়েছে। সবগুলিই যে ধারণাটি দেয় তা হল 'সিরাজাম মুনীরা' সেই আলোর উৎস যা অন্ধকার দূর করে এবং মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে।

রাসুল (সা)-এর জন্মকালে গোটা বিশ্বের অবস্থা মানুষের জন্য দুঃসহ ছিল। এই সময়কালকে সবাই অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী'র 'সমসাময়িক পৃথিবী' পরিচ্ছেদে লিখছেন–

> হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে জগতের ধার্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কিরূপ ছিল?
>
> এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় : সে সময় জগতে সত্যই আঁধার যুগ নামিয়া আসিয়াছিল। আরব, পারশ্য, মিসর, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্রই সত্যের আলো

www.pathagar.com

> নিভিয়া গিয়াছিল। জবুর, তওরাত, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে স্রষ্টাকে ভুলিয়া মানুষ সৃষ্টির পায়েই বারে বারে মাথা নত করিতেছিল। তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; প্রকৃতি-পূজা, প্রতিমা-পূজা, প্রতীক-পূজা, পুরোহিত-পূজা অথবা ভূত-প্রেত ও জড়-পূজাই ছিল তখনকার দিনে মানুষের প্রধান ধর্ম। রাষ্ট্রীক, সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলা কোথাও ছিল না। অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারে ধরণী পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইসলামের পূর্বে জগতের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা চরিত'-এ লিখছেন–

> হযরতের পূর্বে দুনিয়ায় বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, জগতের বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ্‌র কালাম বা 'ভগবৎবাণী'ও সমাগত হইয়াছিল। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের সমস্ত ইতিবৃত্তের সমবেত সাক্ষ্য এই যে, আলোচ্য সময় মহাপুরুষগণের প্রচারিত সমস্ত জ্ঞান ও শিক্ষা এবং স্বর্গীয় বাণীগুলির যাবতীয় আদর্শ ও প্রেরণা মানুষের মন ও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অজ্ঞানতার বিভীষিকাময় অন্ধকার আসিয়া, অধর্মের ও অনাচারের নানা পাপ ও গ্লানি আসিয়া মানব জাতির জ্ঞান ও বিবেকের এবং সুনীতি ও সদাচারের উপর তখন নিজেদের অধিকার ও আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছিল। বস্তুতঃ তখন অজ্ঞতার নামই হইয়াছিল জ্ঞান, অধর্মের নামই হইয়াছিল ধর্ম, মহাপাতকের নামই হইয়াছিল পুণ্য এবং সকল প্রকার ঘৃণিত ব্যভিচারই তখন গৃহীত হইয়াছিল আদর্শ সদাচার বলিয়া।... মহাপুরুষগণের সত্যকার শিক্ষা এবং তাঁহাদের মহান জীবনের প্রকৃত আদর্শ তখন বিকৃতির ও বিস্মৃতির অতল তলে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অথচ এই সঙ্গে সঙ্গে উৎকট রূপে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল মহাপুরুষগণের নামকরণে সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসের যত বীভৎস উপকরণ, নরপূজার যত সর্বনাশী অবদান।

বিশ্বের এই অন্ধকার দূর করতেই রসুলে করীম (সা)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তিনি অন্ধকার দূরকারী আলো, আলোকবর্তিকা– সিরাজাম মুনীরা। ফররুখ আহ্‌মদ তাঁর কাব্য ভাষায় এরই রূপ এঁকেছেন এইভাবে–

www.pathagar.com

সে কী অনাচার ! সে কী ব্যভিচার ! বীভৎস ক্রুর আঁখি-বিলীন,
ভয়াল ঘৃণায় ন্যককার তোলে শতাব্দী পথে রাত্রি দিন।
পুতুলে সাজায়ে কাবাঘর কারা মাথাঠুকে মরে পাপ-মাতাল,
অজ্ঞতার ঐ কুয়াশার ভিতে বসে মূর্খেরা ফেলিছে জাল,
যত কলুষিত পচা শাস্ত্রের বাসি রসে ভরি মাতাল মন
মৃত জড়তার অশেষ আঁধার পচা বিষ তারা করে বমন।
সেদিন তমসা শিখরে নূরানী জয়তুন চারা করি রোপন
প্রোজ্জ্বল দীপ এলে সিরাজাম মুনীরা জাগায়ে অযুত মন।

'সিরাজাম মুনীরা' নাম কবিতার সংকলন। নাম কবিতা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যও বটে। রবীন্দ্রনাথের লেখা শ্রেষ্ঠ নাম কবিতা 'শিবাজী উৎসব', 'নমস্কার' (শ্রী অরবিন্দুর মৃত্যু-উপলক্ষে লেখা) এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই নূরজাহান', 'কবি প্রশস্তি' (রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রচিত) 'গোখেল' ও 'গান্ধীজী' পাঠক-আকর্ষক নাম কবিতা। মোহিতলাল মজুমদারের লেখা বিখ্যাত 'কালা পাহাড়' ও 'নাদির শাহের জাগরণ' চিত্ত-উদ্বোধক নাম কবিতা। নজরুল ইসলামও অজস্র নাম কবিতা লিখেছেন। তিনি চিত্তরঞ্জন দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের উপর যেমন প্রশস্তিমূলক নাম কবিতা লিখেছেন তেমনি হযরত উমর (রা), হযরত খালেদ (রা), জগলুল পাশার উপর বিখ্যাত নাম কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'অগ্নি-বীণা'র 'আনোয়ার' 'কামাল পাশা' যেমন নাম কবিতা তেমনি 'বিষের বাঁশী'র 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম' (আবির্ভাব-তিরোভাব) শ্রেষ্ঠ নাম কবিতা। নজরুল ইসলাম রসুল (সা)-এর উদ্দেশ্যে যে প্রশংসাধর্মী এক শতের মত 'নাত' লিখেছেন সেও এক গীতি কবিতা মূলক নাম কবিতা। অন্য দিকে রসুল (সা)-এর উপর লেখা তাঁর 'মরু-ভাস্কর'ও ঐ নাম কবিতার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, জীবনানন্দ দাশের মত আধুনিক কবিও নাম কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'ঝরাপালকে'র 'দেশবন্ধু', 'বিবেকানন্দ' নাম কবিতা। 'মহাত্মা গান্ধী' নামেও তিনি একটি দীর্ঘ নাম কবিতা লেখেন। রবীন্দ্রনাথের উপরও তাঁর তিনটি নাম কবিতা আছে।

মধুসূদন থেকে এই নাম কবিতা লেখার ঐতিহ্য শুরু হয়। মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদীতে 'কাশীরাম দাশ', 'কৃত্তিবাস', 'জয়দেব', 'দান্তে', 'টেনিসন', 'হুগো'র উপর নাম কবিতা লিখেছেন। তবে চতুর্দশপদী বলে সেগুলি দীর্ঘ কবিতা নয়। আসলে পৃথিবীর অনেকগুলো মহাকাব্যই তো নাম কবিতা। বাল্মীকির 'রামায়ণ' যেমন সুদীর্ঘ নাম কবিতা তেমনি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ

www.pathagar.com

কাব্য' দীর্ঘ নাম কবিতা। নাম কবিতা লেখার ঐতিহ্য ইংরেজী সাহিত্য থেকে বাংলায় এসেছে বললে সেটা বোধ করি অন্যায় হবে না। মিলটনের 'লাইসিডিয়াস' একটি নাম কবিতা। এই শোকবিবৃত কবিতাটি তিনি তাঁর এক গুণী মানী বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে লেখেন। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ফররুখের 'সিরাজাম মুনীরা' রচিত।

উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবিত- কালে প্রকাশিত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তবে গ্রন্থান্তর্ভুক্ত কবিতা লেখার কালে তিনি যতটা পরিকল্পনা-চিন্তাধৃত ছিলেন গ্রন্থ প্রকাশকালে তার চেয়ে বেশী পরিকল্পনা সম্পৃক্ত হয়েছেন। ধর্মবিষয়ে গভীর প্রেমপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও একজন খাঁটি কবির শিল্পদৃষ্টিকে অবিন্যস্ত বা চঞ্চল হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ফররুখ আহ্‌মদ। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতায় এই কাব্যপ্রাণতাকে তিনি আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেননি। 'সিরাজাম মুনীরা'তে এই শিল্পদৃষ্টি অতটা বিশুদ্ধতাগন্ধী ছিল না বলে নন্দনতত্ত্বের চর্চাকারীরা মনে করেন। এখানে, মানতেই হবে, তাঁর ধর্মপ্রিয়তা কিছুটা কাব্যপ্রিয়তাকে পাশ কাটাতে চেয়েছে। কিন্তু আমরা যখন পড়ি–

তুমি না আসিলে মধু ভাণ্ডার ধরায় কখনো হত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল ;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল ॥

অথবা

তুলেছ কি তুলি রঙ্গীন তুলি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয় নীলে
চোখের পলকে সকল ক্ষুব্ধ ভয়াল ঝটিকা থামায়ে দিলে।
জাগলো আবার সাদা বাঁকা রেখা ইঙ্গিত দিয়ে পথ-চলার
অমনি মুক্ত সুপ্ত স্তরে কওসর ধারা সাত তলার,
শুকনো রুক্ষ বালু ভিজে ওঠে প্রেম-অশ্রুতে পূর্ণ বুক,
শিশির ভেজানো গোলাবী পাপড়ি চায় বুলবুলি চায় মাশুক।

কিংবা

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান শিখা বয়ে জিলানের বীর চিশ্‌তী বীর
রঙ্গীন করি মাটির সুরাহী নকশবন্দের নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ

www.pathagar.com

রায় বেরিলির জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিদ।
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নেই আর কোনদিন শেষ হবে না জানি।
লাখো শামাদান জ্বলে অফুরান রাত্রি তোমার রশ্মি স্মরি
সে আলো বিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ-পিপাসায় এ-শর্বরী।

তখন কাব্য-লালিত্য বর্ণনার গদ্যরসনায় যে শুষে যায়নি সেটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও সিরাজাম মুনীরাকে ফররুখ আহমদ একটি অভিপ্রায়যুক্ত পূর্ণাঙ্গ কাব্যে রূপ দিতে পারেননি– দু'একজন পণ্ডিতের এ ধরনের মন্তব্য আছে। আমার ধারণা গ্রন্থের নাম কবিতা নিশ্চয়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিল্প-সুন্দর কবিতা; কিন্তু একটি পূর্ণ গ্রন্থে পরিণত হওয়ার জন্য লিখিত কবিতা নয়। তাছাড়া এটাকে তিনি মহাকাব্য লেখার পরিকল্পনা নিয়ে লেখেননি। তাই বলে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতা পায়নি– এ কথা বলা যায় না। রসুল (সা)-এর জীবনীতে তাঁর সাহাবীদের জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসের অঙ্গ। নজরুল তাঁর 'খেয়াপারের তরণী'তে যখন লেখেন–

আবু বকর, উসমান, উমর, আলী হাইদর
দাঁড়ি যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কান্ডারী ! এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি মুখে সারি গান– লা–শরীক আল্লাহ্!

তখন আবু বকর, উমর, উসমান ও হযরত আলী (রা)-কে ইসলামের তথা রসুল (সা)-এর জীবনের অভিন্ন অখণ্ড সত্তা হিসাবে দেখা উচিত। ফররুখ হয়ত-বা এ চিন্তায় সম্পৃক্ত হয়েই এই শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের উপর লেখা কবিতা এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বয়ং ফররুখ আহ্মদ 'সিরাজাম মুনীরা'তে এঁদের ইসলাম-ইতিহাসের অনন্য সত্তা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সে বক্তব্য এই পংক্তিসমূহে বিবৃত হয়েছে–

গলেছে পাহাড়, জ্বলেছে আকাশ, জেগেছে মানুষ তোমার সাথে,
তোমার পথের যাত্রীরা কভু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে,
তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে অমন সত্য সিন্ধু দোল,
তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনের ও কলরোল,
তাই ওসমান খুলে দিল দ্বার অতুলন দিল মণিকোঠার,
তাই তো আলীর হাতে চমকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার,

www.pathagar.com

খালেদ, তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান,
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞানযাত্রীরা করে প্রয়াণ।

এখানে উল্লিখিত আবু বকর (রা), উসমান (রা), উমর (রা) ও আলী (রা)-এর উপর প্রশস্তিধর্মী লেখাগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিখিত হলেও এদের অন্তরীক্ষের মধ্যকার মিলটি অস্পষ্ট নয়। তবু জীবনীকাব্যের ক্রম অগ্রসরমানতাকে ও সংযোগকে লক্ষ্যে রেখে এর নির্মাণ ঘটেনি। ফররুখ হয়ত ইসলামী আদর্শের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তাঁর সমকালীন বিপ্লব চিন্তাকে একটি সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিপ্লবাত্মক ইসলামী জাগরণের চিন্তাকে এবং ইসলামী ইতিহাসের ক্রম-অগ্রসরমান ও অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে বলীয়ান গতিকে এই কবিতায় ধারণ করেছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর এইসব পংক্তি–

পাল তুলে দিয়ে কিশতি ছুটেছে জোয়ার ভাটার মাঝে অটল
নতুন তুফানে কোটি মরাগাঙ ধমনীতে পেল নতুন বল,
তারা খুঁজে ফেরে সিন্ধু ঠিকানা প্রবল তৃষার বারি অতল,
মৌসুমী ফুল জাগায়ে দুধারে বর্ষ শেষের তোলে ফসল।

এই গ্রন্থে সংকলিত 'গাওসুল আজম', 'সুলতানুল হিন্দ', 'খাজা নকশবন্দ', 'মুজাদ্দিদ আলফেসানী' প্রভৃতি কবিতার অন্তর্ভুক্তি তাই অর্থহীন বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। মূল কবিতা 'সিরাজাম মুনীরা'তে সেই দৃষ্টিকোণের প্রতিচ্ছবি দেখি এই পংক্তিসমূহে–

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানের বীর, চিশতিবীর
রঙ্গীন করি মাটির সুরাহি নকশবন্দের নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায় বেরেলীর জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিদ।
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোন দিন শেষ হবে না জানি !

বলা বাহুল্য, ফররুখ ইসলামী আদর্শের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সমকালীন তাঁর চিন্তাকে একটি সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন। ভিন্ন বর্ণের কিন্তু একই গোত্রের বলে তিনি তাকে একই মালায় গেঁথেছেন– যেমন গোলাপ ভিন্ন বর্ণের হলেও আকারে ও গন্ধে এক।

রচনা সময়
২০-৬-২০০২

www.pathagar.com

'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী'

'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?'– এটা নৌকা, কিশতি বা জাহাজের যাত্রীদের একটা চিরন্তন প্রশ্ন। তীর বা বন্দরের উদ্দেশ্যে গমনরত যাত্রীরা এক সময় ব্যাকুল হয়ে ওঠে তীরে পৌছবার জন্য। বিলম্বিত রাত্রিকে তারা বরদাশত করতে পারে না। অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত রোগীর কাছে যেমন রাত্রির প্রহর কাটতে চায় না, সে আলোর পিপাসায় অধীর হয়ে ওঠে তেমনি দীর্ঘ-যাত্রায় ক্লান্ত যাত্রীরাও পিপাসিত হয়ে ওঠে ভোরের আলোর জন্য। ঠিক এমনি একটি ভাব উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে জেগেছিল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ধীরে ধীরে উপমহাদেশের সকল মুসলিমদের বৃটিশের হাতে পরাধীনতা বরণ করে নিতে হয়। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের অবসান ঘটে। এটা একশ' নব্বুই বছরের অন্ধকার সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। এই সংগ্রাম-পরিক্রমার একটি শেষের সময় ছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩। ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতায় এই সমকালীন চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

কবিতাটি মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু গবেষকরা এখনও এর সঠিক তারিখ বের করতে পারেন নি। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (অক্টোবর ১৯৭৯) 'ফররুখ-রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড)-র গ্রন্থ পরিচিতি অংশেও 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের ১৯টি কবিতার মধ্যে যে তিনটি কবিতার– 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'এই সব রাত্রি', 'পাঞ্জেরী'– তারিখ আবিষ্কার সম্ভব হয়নি, এটা তার অন্যতম। তবে যেহেতু 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাসমূহের রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪ সময় কালের মধ্যে এবং যেহেতু 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রকাশকাল ১৩৫১ (১৯৪৪) অতএব ধরে নেওয়া যায় ১৯৪৩-৪৪-এর দু'বছরের সময়ের মধ্যে কোন এক মাসে এর সৃষ্টি ঘটেছিল। এর প্রকাশ সম্ভাবনা বেশী ১৯৪৪-এর মধ্যের কোন এক মাসে। হয়ত তা জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যেও হতে পারে। তবে এর পটভূমিতে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩-এর উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি যে উপাদান জুগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

'পাঞ্জেরী' নামটি বাংলা সাহিত্য ও কাব্যের পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান'-

www.pathagar.com

এ শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে। শব্দটির অর্থ : নৌকা বা জাহাজের অগ্রভাগে অবস্থিত আলোকদিশারী; বা যে নৌ-কর্মচারী নৌকার মাস্তুলে উঠে চারদিকের দৃশ্য, আবহাওয়া, চর ইত্যাদি বিষয়ে মাঝিকে সংকেত দান করে– সে। লক্ষ্য করার বিষয় তিনি কবিতাটির নাম 'কাণ্ডারী' না দিয়ে 'পাঞ্জেরী' দিয়েছেন। 'কাণ্ডারী' বলতে জাহাজের বা নৌকার মাঝি বা কর্ণধারকে বোঝায়। ইংরেজীতে যাকে helsman বা steersman বলে। এখানে ভাবার্থে নেতৃত্ব দানকারী বা নেতাকে বোঝায়। 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় নজরুল যখন লেখেন–

আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হাইদর
দাঁড়ি যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি মুখে সারি গান– 'লা-শরিক আল্লাহ্'!

তখন এখানে 'কাণ্ডারী' অর্থে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দানকারী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বোঝানো হয়েছে। কাণ্ডারী এখানে শীর্ষতম নেতা। 'পাঞ্জেরী' অর্থে এই নেতৃত্বদানকারীকে বোঝানো হয়েছে। জাহাজের বা নৌকার যে পাঞ্জেরী সে কিন্তু Captain বা helsman বা কাণ্ডারী নয়। বরং সে রাত্রির জাহাজের আলোক প্রদর্শনকারী। রাত্রির যাত্রীবাহী নৌকা বা জাহাজ যাতে কোন বিপথে না যায়, কোন চড়ায় বা চরে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, বা বিপরীতগামী কোন নৌকা বা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা না খায় সে-জন্যে টর্চ লাইটের মত আলোকবর্তিকা বহনকারী ব্যক্তিকেই 'পাঞ্জেরী' বলা হয়। তিনি কাণ্ডারী বা মাঝি নন; বরং তার পথ-প্রদর্শনকারী, বিশেষ করে রাত্রির নদী বা সমুদ্রের। এখানে ইংরেজী Guide শব্দটিও প্রযোজ্য হতে পারে। যার একটি অর্থ পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা। ভাবার্থে 'পাঞ্জেরী' মানে তাহলে দাঁড়ায় রাত্রির বা দুঃসময়ের 'কাণ্ডারী' বা নেতার উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা। কবিতাটি দারুণভাবে যে রাজনৈতিক চিন্তাসংক্রমিত সে-কথা বলা বাহুল্য। এবং এ-জন্যেই এই কবিতাটির সঙ্গে বাংলা কাব্যের আর একটি অতি উঁচু মানের সমকালীন রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিস্থিতির চিন্তা সংক্রমিত কবিতার সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। সেটি সবার জানা নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতা। প্রথম কবিতাটিতে বা নজরুল ইসলামের কবিতাটিতে সম্বোধন করা হয়েছে দেশের নেতা বা নেতৃবৃন্দকে। 'পাঞ্জেরী'তেও প্রতীকার্থে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। পটভূমি বা প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা আছে। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিমদের মিলনের চেষ্টা করে স্যার সৈয়দ

www.pathagar.com

আহমদ, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ অপার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে লাক্ষ্ণৌ-চুক্তি ভণ্ডুল হওয়ার পর জিন্নাহ প্রায় রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী জিন্নাহ্‌কে উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে এবং অনুরোধ করে আবার রাজনীতিতে টেনে আনেন এবং জিন্নাহ্ মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৬-এ যে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয় সেটা হিন্দুদের দ্বারা হিন্দু রাজত্ব সৃষ্টির আতঙ্ক থেকে। দাদাভাই নৌরোজীর শিষ্য গোখেল এবং গোখেলের রাজনৈতিক শিষ্য জিন্নাহ মুসলিমদের সেই উপলব্ধিতে নিমগ্ন হতে পারেননি। কিন্তু ১৯১৬-এর লাক্ষ্ণৌ-চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর জিন্নাহর স্বপ্নভঙ্গ হয়। জিন্নাহর আর এক রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাস হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক শিষ্য নজরুলও সেই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। ১৯২৬-এর কলকাতায় সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সেই স্বপ্ন যখন টলমল অবস্থায় উপনীত তারই পটভূমিতে রচিত হয় 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!'। 'পাঞ্জেরী'র পটভূমি ভিন্ন। 'পাঞ্জেরী'র পটভূমিতে ছিল লাহোর প্রস্তাব এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শনের বাস্তবতা। স্পষ্টতঃ কবিতাটির শুরুতে একটি নৈরাশ্যের সুর বেজে উঠেছে? শুধু যে 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী'তে উৎকণ্ঠার মূর্ছনা মিশ্রিত তাই নয়। ঠিক পরের এই কটি পংক্তি–

এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

কোনো আশার আলো বহনকারী বাণী নয়। পরবর্তী পংক্তিগুলোতেও সেই নৈরাশ্যের সুর সঞ্চারিত–

দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?
একী ঘন সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খাব,
অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী!
তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি!

প্রথম স্তবকে শূন্যতা ঘিরে যে 'অসীম কুয়াশা' ছিল দ্বিতীয় স্তবকেও সেই 'অসীম কুয়াশা'র অস্তিত্ব দৃশ্যমান। তৃতীয় স্তবকেও সেই নৈরাশ্যের প্রকট অবস্থা

www.pathagar.com

প্রকীর্ণ। আযাদীর পদধ্বনি শুনে অপেক্ষারত যাত্রীদের সময় কাটছে আশায় নয় নিরাশায়–

বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে;
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তকদিরে
নিরাশার ছবি এঁকে!

বৃটিশ উপমহাদেশ ছাড়বে ছাড়বে এমন অবস্থা। সুস্পষ্ট নয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তবায়ন, পাকিস্তান আন্দোলন সফল হবে কি হবে না– এমন একটি দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থাকে দুটি লাইনে যে অপূর্ব ভঙ্গিতে ও রূপকধর্মী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে অনন্য বলতে কার আপত্তি থাকবে– 'বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে;/ বুঝি কুয়াশায় জোছনা মায়ায় জাহাজের পাল দেখে' বলে আশা-উৎকণ্ঠার, অপেক্ষা-ব্যাকুলতার যে চিত্র এঁকেছেন ফররুখ তা ইতিহাসের একটি দোদুল্যমান মুহূর্তের যেন ফ্রেমে বাঁধা তৈলচিত্র।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সমাজ-চিন্তা এগিয়ে চলেছে; নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা, চিন্তাবিদেরা এগিয়ে যাচ্ছেন আর স্বপ্ন-সূর্যের উদয় আশায় প্রতীক্ষা করছে বন্দরে অপেক্ষমান সাধারণ মানুষেরা। কবি লিখছেন–

পথহারা এই দরিয়া সোঁতায় ঘুরে
চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?
মুসাফির দল বসে আছে কূল ঘেরি।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি।
রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

উল্লেখ্য, ফররুখ এই কবিতায় একটা ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তবকেই এই 'ভুল'টার উল্লেখ ছিল– 'তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে'; দ্বিতীয় স্তবকেও সেটা উচ্চারিত হয়েছে এবং চতুর্থ স্তবকেও। পঞ্চম স্তবকে অধিকতর স্পষ্ট করে আরও জোর দিয়ে সেই ভুলের কথাটা বলা হয়েছে। মুসলিম জনগণের কাম্য আযাদী নেতৃত্বের ভুলের কারণে যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেটা অধিকতর জোরালো ভঙ্গিতে কবি ব্যক্ত করলেন এই বলে–

www.pathagar.com

শুধু গাফলতি শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।

ভুলটা কি? গাফলতি, খেয়াল ও খেলাটা কি? ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩-এর মধ্যকার বাংলাদেশের মুসলিম জননেতাদের রাজনৈতিক কর্মাবলীর ইতিহাসে এর পরিচয় চিহ্নিত হয়ে আছে।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় হিন্দু মুসলমান ত বটেই এর সঙ্গে তৃতীয় দল হিসাবে কমিউনিস্টদের উদ্ভব ঘটেছে। এবং স্বাধীনতার পথকে জটিল করে তুলেছে। সবাই স্বাধীনতা চায়; কিন্তু এই চাওয়ার চরিত্র ছিল ভিন্ন। একদল হিন্দু রাজত্ব চাইত, একদল মিলিত হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীনতা চাইত এবং আর একদল ধর্মহীন সর্বহারাদের স্বাধীনতা চাইত। এতে সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি উপরে উদ্ধৃত ফররুখের কবিতার একটি পংক্তিতে 'খেলা' শব্দটির উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন–

মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।

এই 'খেলার' কথাটি নজরুল ইসলাম ১৯৪১-এ 'নবযুগে'র একটি সংখ্যায় লেখেন। সেখানে বিষয় ছিল ঐ স্বাধীনতার, তথা রাজনীতির। 'জোর জমিয়াছে খেলা' নামক কবিতায় নজরুল লিখেছিলেন–

এই দিকে "রাজী", ও দিকে "নারাজী" দল,
সেন্টারে পড়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা ফুটবল!

এখানে স্বাধীনতার পক্ষের বিপক্ষের উল্লেখ আছে। "রাজীর দল স্বাধীনতার পক্ষের আর নারাজীর দল স্বাধীনতা না চাওয়া পক্ষের বা আযাদী বিরোধী পক্ষের। স্বাধীনতার পক্ষের দলে 'মজুর, বিড়িওয়ালা' অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এবং তাদের সমর্থক হল 'মধ্যবিত্ত আধা বড়লোক'। নজরুল লিখছেন–

"রাজী জয়ী হবে বলে বাজী রাখে মজুর ও বিড়িওয়ালা,
কেল্লার ধারে জমায়েত হয়ে বাঁধা রেখে ঘটি থালা।
কাহার কেল্লা ফতে হবে সবে কয়,

www.pathagar.com

"রাজী"রা খেলিতে জানে, উহারাই জয়ী হবে নিশ্চয়।
"গ্যালারী" ভর্তি মধ্যবিত্ত আধা বড়লোক যত;
ছাতা উচাইয়া "রাজীদের জয়-ধ্বনি করে অবিরত।
"নারাজী" দলের সাপোর্টার যত কোট প্যান্ট চাপকান,
সংখ্যায় সাত কুড়ি, তবু তিন হাত তুড়ি লাফ খান!
এরা খায় বিড়ি ওরা খায় সিগারেট,
এরা খায় চানাচুর ও বাদাম, ওরা চপ্ কাটলেট!

এই উদ্ধৃতিতে বোঝা যায় একটি শ্রেণীতে ছিল গরীব, মধ্যবিত্ত ও আধা বড়লোক, বিড়ি ও চানাচুর-বাদাম খাওয়ার দল, অন্যদিকে সিগারেট ও চপ-কাটলেট খাওয়ার দল বড় লোকেরা বা ধনী সম্প্রদায়। যারা নারাজী বা স্বাধীনতার বিপক্ষের দল। যাদের কাছে স্বাধীনতা হল কি হল না– এটা কোন গ্রাহ্য বিষয় বা মাথা ঘামাবার বিষয় নয়। এই 'খেলা'র রূপ বিদ্রূপ-রসিকতার ভিয়েন দিয়ে এঁকেছেন নজরুল। এটা একটা কুয়াশা যা চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪০-এ শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির স্বাধীনতার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি তখন মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাঁর হঠাৎ ধারণা হয় মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বাংলাদেশের মুসলিমদের স্বার্থকে উপেক্ষা করবে। এ-জন্যে তিনি প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি নামে একটি নতুন পার্টি বা দল গঠন করেন। এই পার্টির লীডার হলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক বা শেরে বাংলা আর ডেপুটি লীডার হলেন সুভাষচন্দ্র বসুর ভাই শরৎচন্দ্র বসু। এই প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হল মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দু মহাসভার এক নম্বর নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে' লিখছেন–

> কয়দিন পরেই হক সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 'নবযুগে' প্রচারের নতুন ধারা সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ দিতে গিয়াই তিনি সর্বপ্রথম আমাকে জানান যে শুধু কৃষক প্রজা ও কংগ্রেসের সাথেই তিনি আপোষ করিতেছেন না। হিন্দু মহাসভা নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সাথেও তাঁর আপোষ হইতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকেও তিনি তাঁর নয়া মন্ত্রিসভায় নিতেছেন। আমি শুধু আকাশ হইতে পড়িলাম না। আস্তা আসমানটাই আমার মাথায় পড়িল। আমি জানিতাম হক সাহেব সময় সময় খুবই বেপরোয়া

www.pathagar.com

হইতে পারেন। কিন্তু এতটা হইতে পারেন, এতকাল তাঁর শাগরেদি করিয়াও আমি তা জানিতাম না। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে সে ভাব কাটিতে বোধ হয় আমার পুরো মিনিট খানিকই লাগিয়াছিল। তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন। গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদকে চিন না। আমি চিনি। সে স্যার আশুতোষের বেটা। করুক সে হিন্দুসভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তার মত উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজন পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি সব দিক ভাইবা চিন্তাই তারে নিতেছি। আমারে যদি বিশ্বাস কর তাকেও বিশ্বাস করতে হবে।

বলাই বাহুল্য এই প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিকে বাংলার মুসলিম লীগ ও তার সমর্থকরা হৃষ্ট-চিত্তে দেখেনি। আবুল মনসুর আহমদ লিখলেন–

পরদিন সকালে লীগ সমর্থক মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। বিকালে আইন পরিষদের বৈঠকে (২৯ শে নভেম্বর) লীগ মেম্বরদের মধ্য হইতে এ ব্যাপারে সোজাসুজি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। হক সাহেব খুব জোরের সাথে সোজাসুজি ও-কথা অস্বীকার করিলেন।

লীগ মন্ত্রী ও মেম্বররা স্বভাবতঃই হক সাহেবের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁরা হক সাহেবের সহিত দেন দরবার চালাইলেন। শোনা গেল, ইউরোপীয় দলের সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদার আড়ালে কি হইল, আমরা পথের মানুষেরা তার খবর রাখিলাম না। দেখা গেল ১লা ডিসেম্বর তারিখে মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা সকলে এক সাথে হক মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিলেন। মুসলিম লীগ পার্টিও আর হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করে না বলিয়া ঘোষণা করিল। অগত্যা হক সাহেবও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে জার্মান ও জাপান ঐক্যবদ্ধ হলে বৃটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা ভারতীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপারে ইংরেজ একটা শেষ রফায় সম্মত না হলে কংগ্রেস তাদের কোন সহযোগিতা করবে না বলে অভিমত প্রকাশ করে। একই বক্তব্য ছিল মুসলিম লীগেরও। ১৯৪০ সালের ১০ই জুন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগ ও তার মন্ত্রীদের ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায়

www.pathagar.com

সহযোগিতা না করার নির্দেশ দেন। পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াত খান এবং শেরে বাংলা ফজলুল হক এই নির্দেশ মানেননি। পরবর্তীকালে তিনি "ওয়ার কাউন্সিল" বা জাতীয় সমর পরিষদ থেকে পদ-ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি জিন্নাহর কাছে লেখা এক পত্রে জানান যে জিন্নাহর নির্দেশে বা মুসলিম লীগের ধমকে ওয়ার কাউন্সিল থেকে তিনি পদত্যাগ করেননি। তিনি– দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে জাতীয় সমর পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে উক্তি করেন। তাঁর মতে মুসলিম লীগে ব্যক্তি বিশেষের ডিক্টেটরি চলতে থাকলে মুসলিম ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম বাংলার যে প্রভাব ও মর্যাদা আছে তাও আর থাকবে না।

প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন করে নতুন করে হক সাহেব যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের কাছ থেকে তা কাঙ্ক্ষিত সমর্থন পায় নি। এই হক মন্ত্রীসভা যাকে অনেকে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা বলে ব্যঙ্গ করেছেন তার আয়ুষ্কাল ছিল ১৯৪১-এর ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর ২৯শে মার্চ। বাংলার অধিকাংশ মুসলিমের মত ফররুখ আহমদও সম্ভবতঃ ফজলুল হকের এই সিদ্ধান্তকে বা কার্যকলাপকে ফুল্লবদনে মেনে নিতে পারেননি। ফজলুল হক নিজেও নিশছিদ্র বিশ্বাসে এটা মানতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি পুনরায় লীগে যোগ দেন। পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হওয়া ও জিন্নাহর নেতৃত্বে বিশ্বস্ত ফররুখ আহমদ আবুল কাসেম ফজলুল হকের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে মনে হয় ভ্রান্তি বা ভুল বলে মনে করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, গোটা উপমহাদেশ তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ১৯৪১-এ একা কংগ্রেসই ইংরেজদের কুইট ইণ্ডিয়া বা ভারত ছাড় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। উপমহাদেশের মুসলিমরা এবং তাদের রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগও আজাদী লাভে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। এবং কমিউনিস্টরাও। এ-জন্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতায় আমরা তাঁকে লিখতে দেখি–

দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি নেই দেরি নেই আর
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে, দুর্দম হে রানার!

লক্ষ্য করার বিষয় 'পাঞ্জেরী' যেমন একটি প্রতীকী কবিতা তেমনি 'রানার'ও একটি প্রতীকী কবিতা। 'রানার' কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতীক, 'পাঞ্জেরী' মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের প্রতীক। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রানারের চেয়ে পাঞ্জেরীকে একটু বেশী রহস্যময় বলে মনে হয় এবং এর কৌশলগত সূক্ষ্মতা বেশী। উভয়

www.pathagar.com

কবিতার মধ্যে নৈরাশ্যের সুর প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত। তবে সুকান্তের 'রানার' কবিতায় ব্যক্তি-দুঃখের চিত্র যে-ভাবে প্রকটিত হয়েছে– 'পাঞ্জেরী'তে জাতিগত দুঃখের প্রতিফলন হয়েছে তার চেয়ে বেশী। বিশেষতঃ 'পাঞ্জেরী'তে একটি সমালোচনা দৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যখন ফররুখ বলেন–

সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি, আওয়াজ শুনছি তারি।

ওই সময়ে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে সওদাগরী মনোবৃত্তির সুবিধাবাদীদেরও উদ্ভব হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে যত না ছিল মানুষের সেবা-প্রবৃত্তি তার চেয়ে বেশী ছিল আত্মসেবা প্রবৃত্তি। যে চারিত্রিক রূপের এখনও অল্পই পরিবর্তন হয়েছে।

১৯৪৩ সালের ২১ শে মার্চ দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। তিন চার দিনের মধ্যে নাযিমুদ্দীনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আর নাযিম মন্ত্রীসভার আমলেই ১৯৪৩-এর আগস্ট সেপ্টেম্বরে (১৩৫০-এ ভাদ্র–আশ্বিনে) বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আবুল মনসুর আহমদের মতে এ দুর্ভিক্ষের জন্যে হক ও নাযিম মন্ত্রীসভা দায়ী হলেও বেশী করে দায়ী ছিল খোদ ভারত সরকার। তারা বাংলার চাল সংগ্রহ করে বিহারের জব্বলপুরে গুদামজাত করে। জাপানীদের হাত থেকে দেশী যানবাহন সরাবার অজুহাতে পূর্ববঙ্গের সব নৌকা ধ্বংস করে দৈনিক কাজ কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করে দেয়। চরম প্রয়োজনের দিনে বাংলা থেকে সংগ্রহ করা চাল বাংলাকে ফেরৎ দেয় না। আবুল মনসুর আহমদের মতে– 'বাংলা সরকার (নাযিম মন্ত্রীসভা) যখন বিহার হইতে উদ্বৃত্ত চাউল খরিদ করিতে চাহিলেন, তখন বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু নেতারা চাউল সরবরাহের প্রতিবাদ করিলেন। কেউ কেউ স্পষ্টই বলিলেন, 'খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ কেমন করিয়া পাকিস্তান দাবি করে, তা শিখাইতে হইবে।' অতএব হক নাযিম মন্ত্রীসভা এই দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিল না। তবে তাঁদের দোষ ছিল এই যে তাঁরা ছিলেন– দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অসচেতন। তাঁদের চরিত্র ছিল আমলাতান্ত্রিক সরকারের। আর আমলাতান্ত্রিক সরকার তারা যারা রাজনীতি করেন ব্যবসায়িক বুদ্ধি মাথায় নিয়ে। এ-জন্যেই ফররুখ গোটা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে 'সওদাগরের দল' বলেছেন এবং দারুণ হতাশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা কখনও রণেভঙ্গ দিয়ে পিছু হটেন না। সুকান্ত তাঁর 'রানার' কবিতার শেষে বলেছিলেন–

www.pathagar.com

রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার!
শপথের চিঠি বয়ে চল আজ ভীরুতা পেছনে ফেলে
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে'!
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি নেই দেরী নেই আর
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে দুর্দম হে রানার!

আর ফররুখ ক্ষুধার বেদনাকে তুচ্ছ করে বিপ্লবী জনগণকে আহ্বান করে বলছেন–

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী!

শুরুতে নৈরাশ্যের চিত্র এঁকে শেষ পর্যন্ত স্ব-স্বভাবের কিরণপাত করে তিনি কবিতার ইতি টানেন। রাত পোহাতে দেরী হতে পারে– কিন্তু সূর্য শেষ পর্যন্ত যে উঠবেই তাতে সন্দেহ নেই। অতএব 'জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি!' 'পাঞ্জেরী' বস্তুতঃই শুধু 'সাত সাগরের মাঝি'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়– বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এর আবেদন বোধ করি আজও অম্লান! আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বোধ হয় প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের বুকের পিঞ্জরে পাঞ্জেরীর চির জিজ্ঞাসা এই কান্নায় ভেসে বলতে চাইছে– 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?'

'পাঞ্জেরী' জাগরণধর্মী কবিতা কি না? 'অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি' বলে যে কবিতায় একটি নৈরাশ্যের ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে জাগরণের সুর কোথায়? প্রথম পংক্তিতেই আছে জিজ্ঞাসার মধ্যে উৎকণ্ঠা। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?' বলে সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় পংক্তিতেও 'সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?'-তে সন্দেহ-বন্দী জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে এবং পঞ্চম পংক্তিতে জিজ্ঞাসাহীন সমকালীন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– 'অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।'

'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে সংগ্রামী সমাজ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভোরের কূলে ভিড়েছে। 'কত যে আঁধার পর্দা পেরিয়ে ভোর হল জানি না তা'– এ বক্তব্যের মধ্যে সমাজের অবস্থান আধার

www.pathagar.com

সমুদ্রের মধ্যে নেই। "পাঞ্জেরী'র সমাজ মধ্য সমুদ্রে অবস্থান করছে। সে কূলাভিমুখি। 'পাঞ্জেরী'র উল্লেখে বোঝা যায় তার অবস্থান রাত্রির সমুদ্রে। 'সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?' বলে রাত্রির সময় কালকে শনাক্ত করা হয়েছে। 'দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে/ কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?' সেই রাত্রির অস্তিত্বকে দেখানো হয়েছে। এই রাত্রি আবার নির্মেঘ নয়। এই রাত্রির আকাশে নেই চাঁদ তারা। আকাশ মেঘে ভরা এবং সামনে 'অসীম কুয়াশা' বা দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মত কুয়াশা। এক কথায় যাত্রা বিপদ সংকুল। কিন্তু আকাশ যদি এত 'সিতারা, হেলাল' বা চাঁদ তারা শূন্য হয় তাহলে কবি কেন লিখছেন– 'বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।' আকাশে চাঁদ না থাকলে ত জোছনার কথা ওঠে না। কিন্তু বন্দরে যেখানে অপেক্ষারত যাত্রীরা ছিল সেখানে কুয়াশাবেষ্টিত আকাশে চাঁদের অস্তিত্বও ছিল। বাংলাদেশের শরতের আকাশ যারা দেখেছে কবি-বর্ণিত এই ধরনের জ্যোছনা মিশ্রিত ধোঁয়াটে পরিবেশের সঙ্গে তারা অপরিচিত নয়। গোটা পৃথিবীটা তখন একটা মায়াময় রূপ পরিগ্রহ করে। এই কালটা পুরোপুরি বর্ষার বা আষাঢ় শ্রাবণের কাল নয়, এটা শরতের বা শরৎ হেমন্তের মধ্যবর্তী কাল। বর্ষা তখনও শেষ হয়ে হয়নি, আসেনি মেঘমুক্ত উন্মুক্ত আকাশ। চল্লিশ দশকের উপমহাদেশীয় মুসলিম রাজনীতি কতকটা এই প্রাকৃতিক অবস্থার মত ছিল। আশা-নিরাশার সন্দেহ-বিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান। সে-জন্যেই ফররুখ লিখছেন–

পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?

রাজনীতিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তখনও আত্মবিশ্বাসের প্রবল বলে বলীয়ান বলে মনে হয় না। জনগণের বৃহৎ অংশ যখন জিন্নাহ-নেতৃত্বে আত্মসমর্পিত তখনও জনগণের প্রবল প্রিয় শেরে বাংলা ফজলুল হক দ্বিধাগ্রস্ততার শিকার হয়ে পড়েন। ফলে স্বল্প জনপ্রিয় নাযিমউদ্দীন এসে সেই শূন্য সিংহাসনে বসেন। তখন নবোদিত সুহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তা কাণ্ডারীর নিশান ধরার পর্যায়ে আসেনি। এই অবস্থায় ফররুখের পক্ষে বলা খুবই স্বাভাবিক– 'চলেছি কোথায়?'

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে ফররুখ নেতিবাচক প্রশ্নের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন। স্বভাবধর্মে জীবনমুখী ফররুখের পক্ষে 'না'-ধর্মী হওয়া অস্বাভাবিক। তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সুর আশাবাদের আশাবরী। কিন্তু এ কবিতায় ভোরের ভৈরবীর মাদকতাও জড়িয়ে আছে। সেই আশা ছিল বলেই ফররুখ কবিতাটি শেষ করেছেন জাগরণের আমন্ত্রণ জানিয়ে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাবানুবাদ নয় অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ। একটু সুদূর তুলনায় নজরুল ইসলামের 'বউ কথা কও, বউ কথা কও/ কও কথা অভিমানিনী' গানটির সঙ্গে আবার জীবনানন্দ দাশের 'চিল'-এর ভাবানুসরণের মিলও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এখানে বলা যেতে পারে Skylark-এর সঙ্গে ডাহুকের যেমন একটা দূরস্পর্শী মিল খুঁজে পাওয়া যায়– তেমনি মিল দেখা যায় জীবনানন্দ দাশের 'সিন্ধুসারস' কবিতাটির সঙ্গে Skylark-এর।

বলা বাহুল্য, Skylark লার্ক-গোষ্ঠীর একটি পাখী। সুমধুর কণ্ঠস্বরের জন্যে সে খ্যাত। ক্ষুদ্র আকৃতির এই পাখী এত উর্ধ্ব আকাশে উঠে ওড়ে ও গান গায় যে তাকে প্রায় চোখে দেখা যায় না। কীটসের Nightingle-এর সঙ্গে অবশ্য পারসী কবিদের এবং নজরুল ইসলামের প্রিয় 'বুলবুলে'র অনেকটা মিল আছে। ইংরেজী কাব্যে যেমন Nightingle-ব্যবহৃত ও পাঠকপরিচিত তেমনি পারসী কাব্যে ও বাংলা কাব্যে বুলবুল। অবশ্য 'বুলবুল' বা 'বুলবুলি' এককভাবে নজরুলের দ্বারা খ্যাত হয়েছে। 'বুলবুল' নজরুলে এত বেশী ব্যবহৃত যে নজরুল মনে হয় 'বুলবুল'-এর প্রতীক অথবা 'বুলবুল' নজরুলের প্রতীক।

'ডাহুক' কিন্তু প্রেমিকের প্রতীক হিসেবে 'বুলবুল'-এর মত ব্যবহৃত নয়। 'ডাহুক'-এর স্বরও 'বুলবুল' বা Nightingle বা Skylark (ভরত পক্ষী)-এর মত মধুর নয়। যেমন মধুর নয় 'চিল'-এর কণ্ঠস্বর। কিন্তু কোন এক বিশেষ মুহূর্তে 'চিল'-এর করুণ ডাক জীবনানন্দ দাশকে যেমন বিচলিত করেছিল তেমনি করেছিল ডাহুকের ডাক ফররুখ আহমদকে। শুধু মধুর হলেই যে সে স্বর কবিকে আকৃষ্ট করবে তা নয়। 'কাক'-এর স্বর কোকিলের মত মধুর নয়। যে জন্যে একজন প্রাচীন কবি লিখেছিলেন–

"কাকের কর্কশ স্বর বিষ লাগে কানে
কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে।

কোকিলের স্বর মধুর বলে বাংলার বহু কবি তাঁদের কবিতায় মধুকণ্ঠী কোকিলকে প্রেমিক বা বিরহী প্রেমিকের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায় যেমন লিখেছেন– 'ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল তোমার বিমল শোভাতে/ মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী শরৎকালের প্রভাতে।' তেমনি নজরুল লিখেছেন–

কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া
প্রাতে কোকিল কাঁদে নিশীথে পাপিয়া ॥

www.pathagar.com

নজরুল প্রেমিকের প্রতীক হিসাবে চাতক, পাপিয়া, ফটিক জল, বউ কথা কও– ইত্যাদি পাখির কথা উল্লেখ করেছেন; সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের পাখি হিসেবে এদের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অমিষ্ট বা অসুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের পাখি তেমন ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না– জীবনানন্দ দাশের চিল, সিন্ধুসারস ফররুখ আহমদের ডাহুক এবং আল মাহমুদের 'কাক' ছাড়া।

যেহেতু ডাক বা ডাহুকের স্বর মিস্ট স্বরের মধ্যে পড়ে না– সে জন্যে কবি কেন এই পাখির স্বরটাকে নির্বাচন করলেন সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। কৌতূহলী পাঠক এ সম্বন্ধে জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথের 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। পিক বা ময়ূরের ডাককে কেকাধ্বনি বলে। রবীন্দ্রনাথ একটি চমৎকার প্রবন্ধে এর ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, বর্ষার একটি বিশেষ সময়ে ব্যাঙের ডাক যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশকে একটি ভিন্ন চরিত্র দান করে তেমনি পিক বা ময়ূরের ডাকও ব্যতিক্রমধর্মী উপলব্ধির জগতে আমাদের আকর্ষণ করে। যে-জন্যে বিদ্যাপতির গানেও আমরা এ উদাহরণ পাই। বিদ্যাপতি লিখেছিলেন–

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

বিদ্যাপতি দাদুরী বা ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে ডাহুকীর ডাকের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ শ্রবণসুখকর সুরের বাইরে যে একটি অসাধারণ প্রাণের সুর আছে– কবির কল্পনায় সেটা ধরা পড়েছে। শেলীর স্কাইলার্ক বা কীটসের নাইটিঙ্গেলের বা নজরুলের বুলবুলের গানের সুর-মাধুর্যের সঙ্গে এর সুরের মিল না থেকেও তাই এটি উপলব্ধিগত একটি ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। আমার ধারণা ডাহুকের ডাকের মধ্যে এক রহস্যময় সৃষ্টি-বেদনার কান্না টের পেয়েছিলেন ফররুখ। নিজের সৃষ্টি-বেদনার সঙ্গে এর সৃষ্টি-বেদনার কোথাও যেন সাদৃশ্যধর্মিতাই তাঁকে 'ডাহুক' লিখতে উৎসাহিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টতাহীন কেকারবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন–

> কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে,-মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতা কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র– নব বর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত

www.pathagar.com

> হয়, কেকারব তাহারই গান, আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমাল তালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্যপিপাসু উর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অসংখ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেঙ্কার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকা রব সেই বর্ষার গান– কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্য মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি পায়– সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মত্ত প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

আর অমিষ্ট দাদুরী বা ব্যাঙের ডাকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন–

> এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষের মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণ-বৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই– শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণ ধূসরবর্ণ। নানা শস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহু দিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ জ্যোতিহীন কর্মহীন বৈচিত্র্যহীন কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, বর্ষার গণ্ডীকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ময়ূর ও ব্যাঙের ডাকের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু ডাহুকীর 'ফাটি যাওত ছাতিয়া' বলে যে আর্ত-ক্রন্দন বিদ্যাপতিকে ব্যথিত করেছিল তার ব্যাখ্যা দেননি। ফররুখ মনে হয় সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করেছেন 'ডাহুক' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ বিরহিনীর যে বেদনারবকে কেকারবের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন ফররুখ তাকে ডাহুক-ক্রন্দনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। কবিতায় ডাহুকের ডাকের এমন মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যা বাংলাকাব্যে নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়রহিত। আমরা যখন পড়ি–

www.pathagar.com

কোন ডুবুরীর
অশরীরী যেন কোন প্রচ্ছন্ন পাখীর
সামুদ্রিক অতলতা হতে মৃত্যু সুগভীর
ডাক উঠে আসে,
ঝিমায় তারার দীপ স্বপ্নাচ্ছন্ন আকাশে আকাশে।

অথবা–

তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।
অবিশ্রাম ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
শিশির পাখার ঘুম,
গুলে-বকৌলীর নীল আকাশমহল
হয়ে আসে নিসাড় নিঝুম,
নিভে যায় কামনা চেরাগ;
অবিশ্রান্ত ওঠে শুধু ডাহুকের ডাক।

তখন পরিবেশ চেতনায় জাগ্রত শিল্পী-চিত্তের কল্পনাঋদ্ধ মনের পরিচয় পাই আমরা। তখন জীবন-চিত্তের অন্তস্থলের একটি নিভৃত নির্জনবাসী অব্যক্ত বেদনার সাথীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

ফররুখের কাব্যচরিত্র এসকেপিস্ট বা পলাতকের নয়। ইকবালের উপর লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে ফররুখ লিখেছিলেন–

> কীটসীয় এস্কেপিজম তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, প্লেটোর দর্শন এবং ভারতীয় বৈরাগ্যের সুরকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন।

এতে বোঝা যায় ফররুখ নৈসঙ্গ ও বৈরাগ্যবিরোধী ছিলেন– যা ইসলামী দর্শনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। কিন্তু মানুষের জীবনে বিশেষ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে জগৎ বিচ্ছিন্ন নিরাসক্ত যে ভাবের উদয় হয় 'ডাহুক' তার অনবদ্য উদাহরণ। বেদনা-যন্ত্রণা-দুঃখ সম্পৃক্ত পৃথিবীর বাইরের কিছু সময়ের উপলব্ধি যে তাঁর জাগ্রত সমাজ চেতনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা বোঝা যায় তাঁর এই সব উচ্চারণে–

এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।

www.pathagar.com

ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক,
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।

কিম্বা

বেতস লতার তারে থেকে থেকে
বাজে আজ বাতাসের বীণা

ক্রমে তাও থেমে যায়;
প্রাচীন অরণ্যতীরে চাঁদ নেমে যায়
গাঢ়তর হল অন্ধকার।
মুখোমুখি বসে আছি সব বেদনার
ছায়াচ্ছন্ন গভীর প্রহরে
রাত্রি ঝরে পড়ে।

পাতায় শিশিরে...
জীবনের তীরে তীরে...
মরণের তীরে তীরে...
বেদনা নির্বাক।

এখানে যে কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে ব্যক্তি অনুভূতির রূপকার রোমান্টিক কীটসের সঙ্গে তার অনেকখানি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপমগ্ন যে কবিকে দেখি সমাজ ও জাতির দুঃখ বেদনায় সংক্রমিত কবির তার সঙ্গে যেন একেবারে মিল নেই বললে তা অযৌক্তিক হবে না। অথবা সমাজ-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে না পাওয়ার এ বেদনা। রাজনৈতিক যুদ্ধে ক্লান্ত নজরুল একবার লিখেছিলেন 'স্তব্ধ রাতে'র মত কবিতা। শুরুটা ছিল এমনি–

থেমে আসে রজনীর গীত কোলাহল
ওরে মোর সাথী আঁখিজল,
এই বার তুই নেমে আয়–
অতন্দ্র এ নয়ন পাতায়।

আমি শেলীর স্কাইলার্কের সঙ্গে 'ডাহুক'-এর একটি অংশের সাদৃশ্য দেখি। স্কাইলার্কে শেলী স্কাইলার্ককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

We look before and after,

www.pathagar.com

And pine for what is not
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

Yet if we could scorn
Hate and pride and fear,
If we were things born
Not to shed a tear,
I know not how thy joy we ever should come near.

কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'চাতকের প্রতি' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন। সেখান থেকে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হল–

আগে পিছে চাহি চারিভিতে,
কামনা কোথাও যাহা নাই;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই;
সবচেয়ে সুমধুর গান– সব চেয়ে দুখের কথাই।

তবু মোরা পারিতাম যদি
ঘৃণা ভয় গর্ব তেয়াগিতে;
জনমি যদি গো নিরবধি
নাহি হত অশ্রু বরষিতে,
জানি না শকতি হত কি না তোমার ও আনন্দে মিশিতে।

মূল কবিতার কাব্য সৌন্দর্য এতে হয়ত সম্পূর্ণ আসেনি, তবে ভাবার্থ এসেছে। এর সঙ্গে ফররুখের 'ডাহুক'-এর ভাব-কল্পনার একটা সুদূর সাদৃশ্য থেকে গেছে বলে আমার ধারণা।

কীটসের 'নাইটিঙ্গেল'-এর তৃতীয় স্তবকটির সঙ্গেও একই চিন্তার অনুরণন পাওয়া যায়। কীটস লিখছেন–

Fade far away, dissolve, and quite forget
What thou amongst the leaves hast never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,

www.pathagar.com

Where youth grows pale, and specter thin and dies
Where but to think is to be full of sorrow?
And leaden eyed despairs,
Where beauty can not keep lustrous eyes,
Or new love pine at them beyond to-morrow.

এর মধ্যে ফররুখের এই পংক্তিসমূহেরও–

ভারানত
আমরা শিকলে
শুনি না তোমার সুর, নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে
তনুমন করি যে আহত।

এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও
তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবন-মৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।

একটি সুদূর সূক্ষ্ম মিল আছে বললে তা অযৌক্তিক হবে না।

শেলী যখন স্কাইলার্ককে 'Unbodied joy' বলেন, like a star of heaven / In the broad day light/Thou art unseen তখন ফররুখের 'অশরীরী' 'প্রচ্ছন্ন পাখী' বা 'তুমি শুধু অশরীরী সুর'– ইত্যাদি চিত্রকল্পের সাদৃশ্য টের পাওয়া যায়। প্রচ্ছন্ন পাখীর কথা উল্লেখে আবার কীটসের নাইটিঙ্গেলের– Fade far away, dissolve, and quite forget / What thou amongst the leaves hast never known-এর সাদৃশ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বৈসাদৃশ্য যা তা হল স্কাইলার্ক উর্ধ্বচারী পাখী যার সুর ভেসে আসে স্বর্গ থেকে কিম্বা তার নিকটবর্তী স্থান থেকে (That from Heaven, or near it) সেটা 'ডাহুক'-এর উড্ডয়নের স্থান নয়। তবে ডাহুকের ডাক প্রান্তর বিদীর্ণ-কারী উর্ধ্বগামী সুর। ফররুখ অবশ্য যখন বলেন–

সুরের অজানা দেশে
তারার ইশারা নিয়ে চলিয়াছ এক মনে ভেসে
সুগভীর সুরের পাখাতে

তখন 'ডাহুক'কে আর নিম্নচারী পাখী বলে মনে হয় না। অবশ্য বাস্তবতার দৃষ্টিতে কবিতার ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয় না। এই সামান্য স্ববিরোধিতাকে তাই মেনে নিতে হয়। তিনি ডাহুককে এক বার 'অশরীরী সুর' বলেছেন। আবার বলেছেন–

www.pathagar.com

'তুমি সুর নও, তুমি শুধু সুরযন্ত্র'। তিনি ডাহুকের ডাককে 'অপূর্ব সুরা' বলেছেন, ডাহুককে বলেছেন 'সুরাবাহী পাত্রভরা সাকী' আবার 'সুরে ভরা শারাব সুরাহী' বলেছেন। শেলী স্কাইলার্ককে অমনি চিন্তার আলোয় লুকিয়ে থাকা কবি (Poet hidden in the light of thought), গান গাওয়া প্রাসাদ শীর্ষের সম্ভ্রান্ত কুমারী (high born maiden in a palace tower) শিশির- অধ্যুষিত উপত্যকার উজ্জ্বল সোনার পোকা বা সবুজ পাতায় ঘেরা গোলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এদিক থেকে স্কাইলার্কের সঙ্গে 'ডাহুক'-এর মিল সবচেয়ে বেশী।

আমরা 'ডাহুক'-এ এর ভাবার্থের সুর লক্ষ্য করি নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহে–

ভারানত
আমরা শিকলে,
শুনি না তোমার সুর, নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে
তনুমন করি যে আহত।

এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও,
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবনমৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।
তাই তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহুক,
পূর্ণ করি বুক
রিক্ত করি বুক
অমন ডাকিতে পারো। আমরা পারি না।

পূর্বে বলেছি যে, শেলীর স্কাইলার্কের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'সিন্ধুসারস'-এর অংশবিশেষেরও সাদৃশ্য আছে। যেখানে জীবনানন্দ দাশ লিখছেন–

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহোনা কো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই
শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব; নেই নিম্নভূমি– নেই আনন্দের
অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

www.pathagar.com

তখন জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে রাজনৈতিক সমাজচেতনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'ডাহুক' কবিতায় অতি প্রচ্ছন্নভাবে অভিমান আহত ফররুখকে গুপ্ত থাকতে দেখা যায় কি না সে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু সব বেদনার ওপরে থাকা যে আনন্দনগরীর বাসিন্দা শেলীর স্কাইলার্ক, কীটসের নাইটিঙ্গেল এবং জীবনানন্দ দাশ 'সিন্ধুসারস'কে তাদের সমগোত্রীয় মনে করলেও ফররুখ কি 'ডাহুক'কে একই গোত্রের বলে শনাক্ত করেছিলেন। কবিদের সঙ্গে এইসব পাখীর অন্তর্গত চরিত্রের একটি মিল আছে। সেখানে কবি বাস্তবতার সঙ্গে সম্বন্ধহীন, কবি রোমান্টিক রূপসাগরে সন্তরমান। ফররুখের 'ডাহুক' এই স্বাপ্নিক রোমান্টিকদের গোষ্ঠীভুক্ত। কদর্যের কাদায় সে বিব্রত হয় বলে হয়ত তার সঙ্গে বোদলেয়ারের আলবাট্রসেরও মিল আছে। কারণ নাবিকধৃত আলবাট্রস জাহাজের পাটাতনে পড়লে তার বিপর্যস্ত অবস্থা হয়। আকাশচারী কবির কল্পনায় উল্লসিত কবি যখন বাস্তবে পদার্পণ করে তখন তার অবস্থা হয় বাস্তব বেদনাবিদ্ধ 'সপ্রতিভ কুশ্রীতায় প্রহসন পুত্তলি' কবির মত। তখন–

মেঘলোকে যুবরাজ! এই মতো কবিও হেলায়
তুফানে ঝাপট দেয়, ব্যর্থ করে কিরাতের ফলা;
কিন্তু এই মৃত্তিকার নির্বাসনে উল্লোল মেলায়
মহান ডানার ভারে অবরুদ্ধ হয় তার চলা।

বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, নজরুলের কবিতায় একা 'বুলবুলি'ই প্রেমিকের তথা কবির প্রতীকে বর্ণিত বা ব্যবহৃত হয়নি 'চক্রবাক'ও ব্যবহৃত হয়েছিল। 'বুলবুল', 'নাইটিঙ্গেল' বা 'স্কাইলার্ক-এর মত 'চক্রবাক' গানের পাখী নয়। কিন্তু নজরুল একে বিরহিনীর প্রতীকে ব্যবহার করেছিলেন। কারণ দিনে এক সঙ্গে থাকা এবং রাতে নদীর ওপারে চলে যাওয়া চক্রবাকের বিরহে ক্রন্দনরতা চক্রবাকীর সঙ্গে বিরহিনীর মিল আছে। কিন্তু 'ডাহুকী' কাঁদে সৃষ্টি-বেদনায়। শ্রুত জ্ঞান থেকে জানা যায়, নিরবচ্ছিন্নভাবে ডাকতে ডাকতে কণ্ঠচিরে এক সময় যে রক্ত বেরিয়ে আসে নির্দিষ্ট সেই উষ্ণ রক্তের স্পর্শে ডিম ফুটে ডাহুকের বাচ্চা বেরিয়ে আসে। কবির সৃষ্টি-বেদনার উদ্গীরিত রক্তের সঙ্গে হয়ত বা এর মিল থাকতেও পারে। আমরা কি এমন ধারণা করতে পারি যে কবি-কল্পনায় জাতির স্বাধীনতার জন্যে আকুল আগ্রহ ডাহুকের শাবক সৃষ্টির তপস্যার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা কি এক ধরনের পরাবাস্তববাদী চিন্তার অভিব্যক্তি। অবগুণ্ঠিত সে বক্তব্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলে 'সাত সাগরের মাঝি'র অন্যান্য কবিতার সঙ্গে এর সম্বন্ধ সূত্র বা আত্মীয়তাকেও হয়ত আবিষ্কার করা যাবে। হয়ত আযাদীর আগত পদধ্বনির

www.pathagar.com

শব্দকে কবি ডাহুকের ডাক হিসাবে ধারণা করতে পারেন। সে-জন্যে তিনি জাতিকে ডাহুকের ডাকের জন্যে উৎকর্ণ হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে এর যথার্থ অর্থ সম্পর্কে সুনিশ্চিত ব্যাখ্যা কঠিন। শেলী তাঁর A Defense of poetry-তে লিখেছেন–

All high poetry is infinite; it is as the first acorn, which contained all oak potentially, veil after veil may be underway, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed.

'ডাহুক'-এর যথার্থ অর্থ এমনিভাবে আবৃত। তার খোসার পর খোসা ছাড়িয়ে, পাপড়ির পর পাপড়ি সরিয়ে সৌন্দর্যের মূল উৎস কখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না। সে থেকে যাবে অদেখা সৌন্দর্যের উৎস হিসাবে– The source of an unforeseen and unconceived delight. 'ডাহুক' সেই বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার মিশ্রণজাত একটি মৌলিক সৃষ্টি। হয়ত মানুষের, মানবতার মুক্তি কামনা করে সে বিশ্ব মানুষকে আহ্বান করে বলছে– 'কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক!'

রচনা সময়
২৮-৭-০২

www.pathagar.com

ব্যবহৃত পুস্তকাবলী

১। নজরুল-রচনাবলী (১ম-৫ম): আবদুল কাদির সম্পাদিত।
২। ফররুখ-রচনাবলী (১ম খন্ড): মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।
৩। বিজ্ঞানে মুসলমানের দান (৩য় খন্ড): এম. আকবর আলী।
৪। আরব নৌবহর: সৈয়দ সুলায়মান নদভী: অনু: হুমায়ুন খান।
৫। কুরআন শরীফ (৩য় খন্ড) প্রথম সংস্করণ: আলহাজ্জ আবদুর রহমান খাঁ, এম.এ বিটি।
৬। আল কুরআনুল করীম: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত।
৭। মোস্তফা চরিত (সংশোধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ): মোহাম্মদ আকরম খাঁ।
৮। বিশ্বনবী (অষ্টম সংস্করণ): গোলাম মোস্তফা।
৯। The Holy Quran : Translation and Commentary: A.Yusuf Ali.
১০। বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান: সম্পাদক: আহমদ শরীফ।
১১। সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ: ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত।
১২। প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র: জীবনানন্দ দাশ: আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত।
১৩। সুকান্ত সমগ্র: বদরউদ্দীন উমরের ভূমিকা ও রনেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা সম্বলিত।
১৪। ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস: ডাঃ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৫। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস: স্বপন বসু।
১৬। বাংলার রেনেসাঁস: সুশোভন সরকার।
১৭। ইতালীর রেনেসাঁস বাঙলার সংস্কৃতি: অমলেশ ত্রিপাঠী।
১৮। বাংলার নবজাগৃতি: বিনয় ঘোষ।
১৯। ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস: অমর দত্ত।
২০। বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন: মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।
২১। Shelly: Chosen and edited by G.M. Matthews (Lecturer in English Literature University of Leeds.
২২। Keats: Chosen and edited by Roger Sharrock (Professor of English, University of Durhume)
২৩। The Collected Poems of W.B. Yeats: London Machlikan & Co Ltd, 1961.
২৪। নজরুল-রচনা-সম্ভার: ২য় সংস্করণ: সম্পাদনা: আবদুল কাদির।
২৫। পরিভাষা কোষ (প্রথম সংস্করণ): সুপ্রকাশ রায়।
২৬। অতীত দিনের স্মৃতি: আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
২৭। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর: আবুল মনসুর আহমদ।
২৮। কায়েদে আজম: আকবরউদ্দীন।
২৯। এক শ' বছরের রাজনীতি: আবুল আসাদ।
৩০। বাংলার রেনেসাঁস: অন্নদাশঙ্কর রায়।
৩১। ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা: আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত।
৩২। সাত সাগরের মাঝি: ফররুখ আহমদ।

www.pathagar.com

৩৩। সিরাজাম মুনীরা: ফররুখ আহমদ।
৩৪। নৌফেল ও হাতেম: ফররুখ আহমদ।
৩৫। হাতেম তা'য়ী
৩৬। মুহূর্তের কবিতা
৩৭। ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা: ফররুখ আহমদ: আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।
৩৮। কাফেলা: ফররুখ আহ্মদ।
৩৯। হে বন্য স্বপ্নেরা: ফররুখ আহমদ: জিল্লুর রহমান সম্পাদিত।
৪০। Whitman: The Laurel Poetry Series: General Editor, Richard Wilbur (Selections from leaves of Grass with an introduction and notes by Leslie A. Fielder).
৪১। Literary Essays of Ezra Pound edited with an Introduction by T.S Eliot.
৪২। মধুসূদন গ্রন্থাবলী: সম্পাদক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।
৪৩। সাম্প্রতিক: অমিয় চক্রবর্তী।
৪৪। The Concept of Democracy in Islam: Abdul Bari.
৪৫। আনন্দমঠ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৬। সঞ্চয়িতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪৭। ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন: মনিরউদ্দীন ইউসুফ।
৪৮। ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা: মুহাম্মদ আবদুর রহীম।
৪৯। শহীদুল্লাহ্ সম্বর্ধনা গ্রন্থ: মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্ সম্পাদিত।
৫০। সিরাজদ্দৌলা: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
৫১। লাফ্র দ্য মাল: বোদলেয়ার: অনু: বুদ্ধদেব বসু।
৫২। Ezra Pound Selected Poems: Introduction by T.S Eliot.
৫৩। Selected Prose: T.S Eliot.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com